সমাজ বিবর্তনে ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা

(IBN KHALDUN’S THOUGHTS ON THE EVOLUTION OF SOCIETIES)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

আবদুল করিম

রেজি: নং-০৫

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-২০১৫ খ্রি.

আরবি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ইউছুফ

চেয়ারম্যান ও প্রফেসর

আরবি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ও

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি.

সমাজ বিবর্তনে ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা

(IBN KHALDUN'S THOUGHTS ON THE EVOLUTION OF SOCIETIES)

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]

গবেষক

আবদুল করিম

রেজি: নং-০৫

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-২০১৫ খ্রি.

আরবি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ইউছুফ

চেয়ারম্যান ও প্রফেসর

আরবি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ও

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

[আল্লামা ইবনে খালদুন (৭৩২-৮০৮ হি./ ১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.)]

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ-এর অধীনে এম.ফিল গবেষক আবদুল করিম (রেজিঃ নং-০৫, শিক্ষাবর্ষ ২০১৪-১৫) কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত "সমাজ বিবর্তনে ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা (IBN KHALDUN'S THOUGHTS ON THE EVOLUTION OF SOCIETIES)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় এ শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয় নি। আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত কপিটি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে অনুমোদন করছি।

(ড. মোহাম্মদ ইউছুফ)
প্রফেসর
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

তারিখঃ

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "সমাজ বিবর্তনে ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা (IBN KHALDUN'S THOUGHTS ON THE EVOLUTION OF SOCIETIES)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমি এ গবেষণা কর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

গবেষক

(আবদুল করিম)
রেজি: নং ০৫
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-২০১৫
আরবি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সংকেত বিবরণী

সংকেত	বিবরণ
অনু	অনুবাদ
খ্রি.	খ্রিস্টীয় সন
হি.	হিজরি সন
আ.	আলাইহিস্ সালাম
র.	রাহ্মাতুল্লাহি 'আলায়হি
রা.	রাদিয়াল্লাহু আন্হু
স.	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
মৃ.	মৃত/মৃত্যু
জ.	জন্ম
ইং	ইংরেজি
পৃ.	পৃষ্ঠা
খ.	খণ্ড
সং	সংস্করণ
খ্রি. পূ.	খ্রিস্টপূর্ব
তা. বি.	তারিখ বিহীন
ড.	ডক্টর
দ্র.	দ্রষ্টব্য
মাওঃ	মাওলানা
ই.ফা.বা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
সম্পা.	সম্পাদনা/সম্পাদক
বাং	বাংলা
Adi	Adition
Ed.	Edited by
OP. Cit.	Oper Citao
P.	Page
Trs.	Translation
Vol.	Volume
Pub.	Publisher

প্রতিবর্ণায়ন
(আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের প্রতিবর্ণায়ন নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে বহুল প্রচলিত আরবী বা উর্দূ শব্দসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত বাংলা বানান রীতিতে লেখা হয়েছে।

ا -	অ	ط -	ত	ـِــ	ি	يَا -	ইয়া
ب -	ব	ظ -	য	ـُــ	ু	يِ -	য়ি
ت -	ত	ع -	'	ـَــا	া	يِي -	য়ী
ث -	ছ	غ -	গ	ـُــو	ূ	يُ -	ইয়ু
ج -	জ	ف -	ফ	ـِــي	ী	يُو -	ইউ
ح -	হ	ق -	ক	اَ -	আ	عَ -	'আ
خ -	খ	ك -	ক	ا -	আ	عَا -	'আ
د -	দ	ل -	ল	اِي -	ঈ	عِ -	'ই
ذ -	য	م -	ম	اُ -	উ	عِي -	'ঈ
ر -	র	ن -	ন	اُو -	ঊ	عُ -	'উ
ز -	য	و -	ও	وَ -	ওয়া	عُو -	'ঊ
س -	স	ه -	হ	وِي -	বী,ভী		
ش -	শ	ء -	'	وُ -	উ		
ص -	স	ي -	য়	وُو -	ঊ		
ض -	দ	ـّــ	--া	يَ -	ইয়া		

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা সারা বিশ্বের একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আমীনের জন্য, যাঁর অশেষ মেহেরবানিতে অত্র অভিসন্দর্ভের কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি।

এই গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু 'আবু সাঈদ আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালদুন। তিনি ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বিশ্বজোড়া খ্যাতির মূলে ছিল তাঁর সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ "কিতাব আল-ইবার ওয়া দিওয়ান আল-মুবতাদা ওয়াল খাবার, ফি আইয়াম আল-আরব ওয়াল আজম ওয়া বার বার।" এটি সংক্ষেপে 'আল মুকাদ্দিমা' নামে পরিচিত।

ইবনে খালদুন নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকেই তিনি মানব সমাজ এবং তার বৈশিষ্ট্যকে একটি বিষয়ে রূপান্তরিত করেন। সমাজকে তিনি মানুষের যাযাবর জীবনযাত্রা থেকে রাষ্ট্র ও দেশের পতনের মাধ্যমে স্থায়ী বসবাসের অবস্থা পর্যন্ত সকল পর্যায় পুঙ্খানুভাবে গবেষণার মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা চালান। এই গবেষণায় তিনি মানব সমাজের দৃঢ়তা ও দুর্বলতা, আধুনিক ও পুরাতন যুগ, উত্থান ও পতনের সকল অবস্থার দিকে সমান নজর দিয়েছেন।

ইবন খালদুন বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ বিবর্তনের সারমর্ম বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, জীবনযাত্রা, বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা পর্যালোচনা করেছেন। এর ফলে ইতিহাস ও সমাজের সত্য ঘটনাবলী উদ্‌ঘাটিত ও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হওয়ার যথাযথ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। আমি ইবনে খালদুন-এর আলোচিত সমাজতত্ত্ব বা সমাজ বিজ্ঞানের গোটা বিষয়টি বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছি।

থিসিস রচনা করতে গিয়ে আমি ইবনে খালদুন এর চিন্তাধারা সম্পর্কিত যাবতীয় প্রাপ্ত সূত্রের ব্যবহার করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও আরবি বিভাগের লাইব্রেরী ছিল আমার এ গবেষণার প্রধান অবলম্বন। এখানে ইবনে খালদুনের রচিতগ্রন্থ, প্রবন্ধাবলি, বক্তৃতাবলির অনেক বই রয়েছে। তাছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি'সহ দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহায়তা নিয়েছি। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি থেকেও বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি।

এই অভিসন্দর্ভে আমি ইবনে খালদুনের সম্পাদিত 'আল-মুকাদ্দিমা' নামক গ্রন্থটি থেকে অনেক তথ্য গ্রহণ করেছি। ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর ভাষার বাংলা ভাবধারা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। যাতে করে 'ইবনে খালদুন' এর চিন্তা ধারার সাথে পাঠক পাঠিকার যথাযর্থ পরিচিতি ঘটে। প্রয়োজনীয় স্থানে কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি।

এই অভিসন্দর্ভটি আমার দীর্ঘ ২ বছরের অক্লান্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফসল। এ সময়ে আমি অনেকের সাহায্য গ্রহণ করেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ ইউছুফ আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর বাসায় রয়েছে ইসলামি বইয়ের বিরাট কালেকশন এবং অসংখ্য এম.ফিল ও পিএইচডি গবেষণাপত্র, সেগুলো দ্বারা আমি উপকৃত হয়েছি। আমার জন্য তিনি যেভাবে ত্যাগ তিতীক্ষা ও শ্রম স্বীকার করেছেন। সবসময় উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং গবেষণাটি আদ্যোপ্রান্ত দেখে দিয়েছেন। সত্যিই তার তুলনা হয় না। এজন্য আমি তার কাছে চির কৃতজ্ঞ। আমি তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগণ আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝে গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাওয়ার সময় যে সকল বন্ধু বান্ধব, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ও প্রিয়জনেরা বিশেষ করে আমার পিতা-মাতা ও শ্বশুর-শাশুড়ী এবং ভাইয়েরা আমাকে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছেন, তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমার সহধর্মিনী তৈয়বা হাসান এর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। কারণ গবেষণার সময় আমার সমস্ত চিন্তা ও কর্মকাণ্ড একনিষ্ঠভাবে পালনের স্বার্থে সংসারের সিংহভাগ দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হয়েছে। আমার যে কোন অর্জন তার নিকট ও পরম আনন্দের বিষয়। তাঁর সহযোগিতা না থাকলে আমার পক্ষে গবেষণা কর্মে অধিকতর মনোযোগী হওয়া সম্ভবপর হতো না।

মোঃ নাসির উদ্দীন গবেষণা থিসিসের পাণ্ডুলিপি সযত্নে টাইপ কম্পোজ করে দিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময় কম্পিউটারের কাজে আরো অনেকে বিশেষভাবে সাহায্যে করেছেন। এজন্য তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পাঠশেষে মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দোয়া করি তিনি যেন আমাদের সকলের সহযোগিতাকে কবুল করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোত্তম কল্যাণ দান করেন। (আমিন)

সূচিপত্র

অধ্যায়		বিষয়	পৃষ্ঠা
		◗ প্রত্যয়ন পত্র	I
		◗ ঘোষণা পত্র	II
		◗ সংকেত বিবরণী	III
		◗ প্রতিবর্ণায়ন	IV
		◗ কৃতজ্ঞতা স্বীকার	V-VI
		◗ ভূমিকা	১-৪
প্রথম অধ্যায়	:	**ইবনে খালদুনের সমকালীন রাজনৈতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতি, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা**	**৫-২৬**
১ম পরিচ্ছেদ	:	ইবনে খালদুনের সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা	
২য় পরিচ্ছেদ	:	ইবনে খালদুনের সমকালীন মুসলিম বিশ্ব	
৩য় পরিচ্ছেদ	:	ইবনে খালদুনের সমকালীন শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা	
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	**ইবনে খালদুনের জীবন পরিক্রমা**	**২৭-৫৩**
১ম পরিচ্ছেদ	:	ইবনে খালদুনের বংশধারা ও শিক্ষাজীবন	
২য় পরিচ্ছেদ	:	ইবনে খালদুনের কর্ম জীবন	
৩য় পরিচ্ছেদ	:	মিশরে ইবন খালদুন ও তাঁর শেষ জীবন	
তৃতীয় অধ্যায়	:	**ইবনে খালদুনে রচনাবলী ও মূল্যায়ন**	**৫৪-৬৮**
১ম পরিচ্ছেদ	:	ইবনে খালদুনের রচনাবলী	
২য় পরিচ্ছেদ	:	ইবনে খালদুন রচিত মুকাদ্দিমা	
৩য় পরিচ্ছেদ	:	ইবনে খালদুন রচিত মুকাদ্দিমার মূল্যায়ন	
চতুর্থ অধ্যায়	:	সমাজের পরিচিতি, প্রয়োজনীয়তা ও ক্রমবিকাশ	**৬৯-৯০**
১ম পরিচ্ছেদ	:	সমাজের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা	
২য় পরিচ্ছেদ	:	সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের পরিচিতি ও উদ্ভব	
৩য় পরিচ্ছেদ	:	সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ	
৪র্থ পরিচ্ছেদ	:	সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে দার্শনিকদের ধারণাসমূহ	

পঞ্চম অধ্যায়	:	**সমাজ বিবর্তনে ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা**	**৯১-১৫১**
১ম পরিচ্ছেদ	:	সমাজবিজ্ঞানের অনানুষ্ঠানিক জনক	
২য় পরিচ্ছেদ	:	ইবনে খালদুনের স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব	
৩য় পরিচ্ছেদ	:	সমাজ বিবর্তন মতবাদ ও ইবনে খালদুন	
৪র্থ পরিচ্ছেদ	:	সমাজ বিবর্তন সম্পর্কে ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা	
৫ম পরিচ্ছেদ	:	‘আসাবিয়াতত্ত্ব’ বা সামাজিক সংহতি	
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	ইবনে খালদুনের দৃষ্টিতে সমাজ কাঠামো	
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	**রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, অর্থনৈতিক, দর্শন ও ভূগোশাস্ত্রে ইবনে খালদুনের অবদান**	**১৫২-২০৮**
১ম পরিচ্ছেদ	:	ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রদর্শন	
২য় পরিচ্ছেদ	:	ইবনে খালদুনের ইতিহাস দর্শন	
৩য় পরিচ্ছেদ	:	ইবনে খালদুনের অর্থনৈতিক দর্শন	
৪র্থ পরিচ্ছেদ	:	ইবনে খালদুনের দার্শনিক মতবাদ	
৫ম পরিচ্ছেদ	:	ভূগোলশাস্ত্রে ইবন খালদুনের অবদান	
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ		আধুনিক সমাজচিন্তাবিদদের তত্ত্বে ইবনে খালদুনের প্রভাব	
৭ম পরিচ্ছেদ	:	ইবনে খালদুন সম্পর্কে আধুনিক দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের অভিমত	

- **উপসংহার** **২০৯-২১১**
- **গ্রন্থপঞ্জি** **২১৬-২২৬**

এ্যাবস্ট্রাক্ট

অভিসন্দর্ভের শিরোনাম: **“সমাজ বিবর্তনে ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা”**

২২৬ (দুইশত ছাব্বিশ) পৃষ্ঠায় লিখিত অভিসন্দর্ভটিতে ৬ (ছয়)টি অধ্যায়, ২৬ (ছাব্বিশ)টি অনুচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। এতে যা কিছু উপস্থাপিত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- সমাজবিজ্ঞানের জনক আবদুর রহমান ইবনে খালদুন-এর সমকালীন রাজনৈতিক, তৎকালীন তিউনেশিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, শিক্ষা-সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা এবং তাঁর সমকালীন মুসলিম বিশ্বের অবস্থার বিবরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
- ইবনে খালদুন-এর জন্ম ও বংশ পরিচয়, পূর্বপুরুষ ও বংশীয় ঐহিত্য, বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন, তাঁর কর্মজীবন ও জ্ঞান-সাধনা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।
- ইবনে খালদুন-এর রচনাবলী এবং তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মুকাদ্দিমা’ ও এ গ্রন্থের মূল্যায়ন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
- সমাজের পরিচয়, প্রয়োজনীয়তা এবং সমাজবিজ্ঞানের পরিচিতি, উদ্ভব ও পরিধি সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।
- সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে দার্শনিকদের ধারণাসমূহ আলোকপাত করা হয়েছে।
- সমাজবিজ্ঞানের অনানুষ্ঠানিক জনক ইবন খালদুনের স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।
- সমাজ বিবর্তনে ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা, ‘আসাবিয়াতত্ত্ব’ বা সমাজ সংহতি সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।
- ইবনে খালদুনের দৃষ্টিতে সমাজ কাঠামোর সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।
- রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, অর্থনৈতিক, দর্শন ও ভূগোলশাস্ত্রে ইবনে খালদুনের অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
- আধুনিক সমাজচিন্তাবিদদের তত্ত্বে ইবনে খালদুনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
- ইবনে খালদুন সম্পর্কে আধুনিক দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের অভিমতসমূহ আলোচিত হয়েছে।

গবেষক

(আবদুল করিম)
রেজি: নং ০৫
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-২০১৫
আরবি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ একাকী বসবাস করতে পারে না। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করা তার স্বভাব। এককভাবে কোন মানুষই তার সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে পারে না। বিভিন্নমুখী চাহিদার জন্য সে অপরের উপর নির্ভর করে। পারস্পরিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তাই পারস্পরিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। নিরাপত্তার তাগিদেও মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে।

সমাজ সম্পর্কিত বহুবিধ জ্ঞানের সমন্বিত রূপই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। ব্যাপক অর্থে সমাজ বিজ্ঞান কে সংজ্ঞায়িত করলে বলা যায় যে সমাজ বিজ্ঞান হল মানবসমাজের একটি বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিসিদ্ধ বিচার ও নিয়ম ভিত্তিক চর্চা। অর্থাৎ যে বিজ্ঞান মানবসমাজের উদ্ভব, বিকাশ, বিবর্তনসহ সামাজিক সর্ববিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা বা গবেষণা করে, তাকে সমাজবিজ্ঞান বলা হয়।

সামাজিক বিজ্ঞান ঐতিহ্যগতভাবে এটি একটি প্রাচীনতম বিজ্ঞান বলে স্বীকৃত। সমাজ জীবনের সূচনা লগ্ন থেকেই সমাজ সংক্রান্ত আলোচনা ও গবেষণা শুরু হয়েছে। সমাজ সম্পর্কিত বহুবিধ জ্ঞানের সমন্বিত রূপই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। মানুষের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভাবনা আদিকাল থেকে চলে আসছে। আদিতে সকল রকম চিন্তা-চেতনা দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্ত মানবচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারায় দর্শনশাস্ত্রের সীমানা পেরিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে। এভাবে মানুষের বিচিত্র জ্ঞানের শাখা হিসেবে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, মনোবিদ্যা, ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সন্তুষ্টি, জীবনের নিরাপত্তা, উন্নত জীবন যাপন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে সমাজের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ বিহীন মানুষের অস্তিত্ব চিন্তাই করা যায় না। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার এবং পেজ যথার্থই বলেছেন, “সমাজে মানুষের জন্ম গ্রহণই মানবজীবনে সমাজের প্রয়োজনীয়তার পরিপূর্ণ পরিচয় বহন করে। স্বাভাবিক মানবিক জীবন-যাপনের জন্য সামাজিক সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য।” মানুষ তার অস্তিত্বের প্রয়োজনেই সমাজ গঠন করে, সমাজবদ্ধ জীবন প্রণালী তার জীবনযাপনকে সহজ করে তোলে। এ সমাজ গঠনের উপাদান সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রদার্শনিকগণ বিভিন্ন মতবাদ প্রদান করেন। তাঁরা সমাজ সভ্যতার উদ্ভব, বিকাশ এবং পতনের যৌক্তিক কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করেন।

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি এবং বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ, ব্যক্তি বা সমাজজীবনের এমন কোন দিক নেই, যা সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আওতায় আনা যায় না। সমাজ সম্পর্কিত বহুবিধ জ্ঞানের সমন্বিত রূপই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞানের পরিধি এবং বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ, ব্যক্তি বা সমাজজীবনের এমন কোন দিক নেই, যা সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আওতায় আনা যায় না। সমাজবিজ্ঞানে সমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াবলীর বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়।

এজন্য সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু অনেক বিস্তৃত। বর্তমান পরিবর্তনশীল সমাজ কাঠামো সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হলে মানব জীবনের প্রতিটি স্তরেই সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন অপরিহার্য।

সমাজবিজ্ঞান আমাদেরকে সমাজের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, সমাজ কাঠামো, সমাজের পরিবর্তন ও বিকাশের ধারা সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দেয়। বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে মানব সমাজকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেছেন।

সর্বকালের স্মারণীয় প্রতিভা ও ঐতিহাসিক দর্শনের জনক ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.) মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও মৌলিকতা উভয় কারণেই তিনি মুসলিম বুদ্ধিজীবীর চিন্তায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। বিশেষত সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ক্ষেত্রে মৌলিকতার জন্য তিনি সব মহলের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থ "মুকাদ্দামা"র জন্য বিখ্যাত। সমাজ বিবর্তনে তাঁর ধারণা এ গ্রন্থে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন।

ইবনে রুশ্‌দ-এর মৃত্যুর পর থেকে মুসলিশ দর্শনের গতি ক্রমশ স্তব্ধ হয়ে যেতে থাকে এবং চৌদ্দ শতকের দিকে এসে তা নব্য-হাম্বলিবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। তবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আলোচ্য সময়ে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মতৎপরতা মন্থর হয়ে গেলেও কোথাও কোথাও আবার এমন কিছু ব্যতিক্রমী চিন্তাবিদের আবির্ভাব দেখা যায়, যাঁদের চিন্তার সজীবতা ও গতিশীলতাকে কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না। এ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাবিদদের মধ্যে মুসলিম পাশ্চাত্যে তিউনিসিয়ার ইবনে খালদুন এবং মুসলিম প্রাচ্যে সদরউদ্দিন সিরাজি ওরফে মোল্লা সাদরা ছিলেন বিখ্যাত। জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও মৌলিকতা উভয় কারণেই ইবনে খালদুন মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে একজন দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিক ও শিক্ষাবিজ্ঞানী। বিশেষত সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ক্ষেত্রে মৌলিকতার জন্য তিনি সর্বমহলের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধার পাত্র।

ইবনে খালদুন সমাজবিজ্ঞানের সূত্রপাত করেন এবং তা করতে গিয়ে তিনি অতীত ও বর্তমান জীবনযাত্রার সংগৃহীত তথ্যের সাথে তুলনা করে সমাজ ও রাষ্ট্রের ঘটনা প্রবাহের যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তা থেকে সাধারণ সূত্র বের করেন। এভাবে জীবনের একনিষ্ঠ সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে তাঁর অনন্য সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ও অপূর্ণ চিন্তাশক্তির সমন্বয়ে সারা বিশ্ব-জাহানের জ্ঞান ভাণ্ডারকে তিনি সমৃদ্ধ করে গেছেন। 'তারীখ' রচনায় ইবনে খালদুন যে আলোচনা-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেন, তার উপর ভিত্তি করে সুদীর্ঘ পাঁচশো বছর পরে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী বাক্‌ল তাঁর History of Civilization প্রণয়ন করেছিলেন।

ইবনে খালদুনের আসল কর্তৃত্ব হচ্ছে ইতিহাসের বিবর্তনশীল রূপকে আবিষ্কার করা। তাঁর মতে তারিখ বা ইতিহাস শুধু যে ধর্মের সন্ধান দান করে তা নয়, এ হচ্ছে মানবের কর্মসূচির যথাযথ বিবরণী, মানবসভ্যতা বিকাশের অমর কাহিনী। তাই মু'আররিখ বা ইতিহাসবেত্তার প্রধান কাজ-

মানব সমাজের প্রকৃতিতে যে নিত্য-নতুন আবর্তন অলক্ষ্যে সাধিত হচ্ছে তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা এবং অকুণ্ঠচিত্তে, অপকটে ও একান্ত নিরপেক্ষভাবে তার নিরংকুশ বিবরণ দান করা। ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞানীগণ বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন ইবনে খালদুনেরই লেখনী থেকে উৎসারিত প্রেরণা নিয়ে।

ইবনে খালদুনই সর্বপ্রথম মানব সমাজের বিবর্তনকে পার্থিব কারণাদির সাহায্যে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান। উদ্দেশ্যবাদী (teleological) দার্শনিকেরা মনে করতেন যে, শুভের ধারণা বাস্তবায়নে স্বর্গীয় প্রচেষ্টাই সমাজ বিবর্তনে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। কিন্তু ইবনে খালদুন এ মতের বিরোধীতা করেন এবং বলেন যে, সমাজের বিকাশে কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতিফলন ঘটে না। বস্তুত, সমাজে মানুষের বৈষয়িক ও বৌদ্ধিক প্রগতি সাধিত হয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে।

প্রতিটি সভ্যতাই এসব প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশের ফল। এজন্যই সমাজ বিবর্তনের কারণানুসন্ধান করতে গিয়ে এসব প্রাকৃতিক অবস্থা খুঁজে বের করতে হবে। তবে ইবনে খালদুন এ কথাও বলেন, এই যে কারণিক অনুক্রম, তা অসীম নয়, এজন্য যে, সবশেষে এর একটি পরিণতি কারণ, অর্থাৎ আল্লাহ রয়েছেন। একথা থেকে বুঝা যায় যে, আমরা সবকিছুকে শুধু অভিজ্ঞতা দ্বারা জানতে পারি না। একথা আবার এ নির্দেশও করে যে, মানুষের জ্ঞান সীমিত এবং পৃথিবীর বহু জিনিস সম্পর্কে মানুষ অজ্ঞ। তবে খালদুন এ-ও বলেন যে, সচেতন অজ্ঞতাও এক ধরনের জ্ঞান এবং যতটুকু সম্ভব জ্ঞানানুশীলন আমাদের কাম্য।

ইবনে খালদুন যথার্থই একাধারে একজন ঐতিহাসিক, ইতিহাস দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক জগতে অত্যুৎকৃষ্ট স্থান দখল করে আছেন। অসাধারণ জ্ঞানের দিকপাল ইবনে খালদুন মুসলিম মনীষী যিনি খ্রিস্টান জগতের দার্শনিকদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। জ্ঞানের বহুমাত্রিক অঙ্গকে অভূতপূর্ব অবদান রেখে গেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে, ইবনে খালদুনের পূর্বে ইতিহাসের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকগণ সম্যকরূপে অবহিত ছিলেন না। তিনিই সর্বপ্রথম ইতিহাস প্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রণালি উদ্ভাবন করেন। তাঁর 'কিতাবুল ইবার'-এ মুসলিম জগতের একটি নিখুঁত ও ধারাবাহিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করে গেছেন। তিনি তাঁর রচিত 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব প্রদান করে গেছেন। তাঁর গ্রন্থ পাঠে এটি প্রমাণিত হয় যে, তার ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদ অদ্যাবধি জন্মগ্রহণ করেনি।

ইবনে খালদুন সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাজ পরিবর্তনের নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন। কার্যতঃ তিনি দার্শনিক প্লেটো, এরিস্টেটল, সেন্ট অগাস্টিনের চেয়ে অধিক বুৎপত্তি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আধুনিককালের সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ইবনে খালদুন সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করে তা সত্যিই বিস্ময়কর। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলী (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রি.), ভিকো (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) গীবন, এ্যাডাম স্মিথ, অগাস্ট কোঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭

খ্রি.) এবং পরবর্তী সমাজতাত্ত্বিকরা চিন্তা ও চেতনায় তার সমাজ ব্যাখ্যার কাঠামো দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

ইবনে খালদুন সমাজ বিবর্তনের বাস্তব কারণ নির্দেশ করেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও কৃষ্টিজাত কারণসমূহ যে মানবসমাজ বিকাশের মূলে অন্তর্নিহিত রয়েছে, এই ধারণা ইবনে খালদুনের পূর্বে কেউ করেননি। তিনি সভ্যতার কারণ অন্বেষায় প্রাকৃতিক বাস্তব কারণের উপর নির্ভরশীল হতে পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, কারণ অগ্রগতি ও সীমাহীন- তবে সর্বশেষ এক পরিণত কারণ রয়েছে এবং তা হলো আল্লাহ। অভিজ্ঞতার দ্বারা সবকিছু জানা যায় না। তিনি উল্লেখ করেন, মানুষের জ্ঞান সীমিত এবং জগতের বহু বিষয় সম্বন্ধে মানুষ অজ্ঞ। ইবনে খালদুন আরও বলেন, সচেতন অজ্ঞতাও একধরনের জ্ঞান এবং যতটুকু সম্ভব জ্ঞানানুশীলন করা আমাদের কর্তব্য।

"সমাজ বিবর্তনে ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা" শীর্ষক উক্ত অভিসন্দর্ভটি ৬ (ছয়)টি অধ্যায় ও ২৬ (ছাব্বিশ)টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: আবু সাঈদ আবদুর রহমান ইবনে খালদুন-এর সমকালীন রাজনৈতিক, তৎকালীন তিউনেশিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, শিক্ষা-সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থ, সমকালীন মুসলিম বিশ্বের অবস্থার বিবরণ এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: এ অধ্যায়ে ইবনে খালদুন-এর জীবন পরিক্রমা সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে তাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয়, পূর্বপুরুষ ও বংশীয় ঐহিত্য, বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন, তাঁর কর্মজীবন, জ্ঞান-সাধনা ও সন্তানাদি এবং শেষ জীবন ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: এ অধ্যায়ে ইবনে খালদুনের রচনাবলী, তাঁর রচিত মুকাদ্দিমা এবং মুকাদ্দিমার মূল্যায়ন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: এ অধ্যায়ে সমাজের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা, সমাজবিজ্ঞানের পরিচিতি, উদ্ভব ও পরিধি সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ও এ সম্পর্কে দার্শনিকদের ধারণাসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: সমাজ বিববর্তনে ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা, সমাজবিজ্ঞানের অনানুষ্ঠানিক জনক, তাঁর স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব, সমাজ বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারা, আসাবিয়াতত্ত্ব, তাঁর দৃষ্টিতে সমাজ কাঠামো ইত্যাদি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: এ অধ্যায়ে রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, অর্থনৈতিক, দর্শন ও ভূগোলশাস্ত্রে ইবনে খালদুনের অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়
ইবনে খালদুনের সমকালীন রাজনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা

১ম পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা

২য় পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের সমকালীন মুসলিম বিশ্ব

৩য় পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের সমকালীন শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা

১ম পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানের জনক আবু সাঈদ আবদুর রহমান ইবনে খালদুনের (৭৩২-৮০৮ হি./১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.) সমকালীন যুগ ছিল ঘটনাবহুল। রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও চারিত্রিক এবং তত্ত্বগত ও ধর্মীয় অবস্থার দিক দিয়ে এই যুগ ছিল বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। ইবনে খালদুনের সমকালীন মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল বিরাজ করছিল। ফলে মুসলমানরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ ও দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং মুসলিম সভ্যতা ক্রমশ অগ্রসর হয় পতনের দ্বারপ্রান্তে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলিমজগতে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দেয়। এহেন অবস্থায় ইবনে খালদুন ৭৩২ হি./ ১৩৩২ খ্রি. উত্তর আফ্রিকার তিউনিসে জন্মগ্রহণ এবং ৮০৮ হি./১৪০৬ খ্রি. তৎকালীন আলেকজান্দ্রিয়া অর্থাৎ মিসরের কায়রোতে ইন্তিকাল করেন। নিম্নে ইবনে খালদুনের সমকালীন রাজনৈতিক ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা তুলে ধরা হল:

তিউনেশিয়ায় আরবদের আগমন

তিউনিসিয়া আফ্রিকার মধ্যবর্তী স্থানে সর্বোত্তরে উত্তরে অবস্থিত। দেশটির উত্তরে ভূমধ্যসাগর। পূর্বদিকে প্রাচ্য আর পশ্চিম দিকে পাশ্চাত্য বা প্রতীচ্য। রাজধানী তিউনিস সুপ্রাচীন কার্থেজ নগরীর ধ্বংসাবশেষের নিকট অবস্থিত।[১] সামরিক কৌশলগত অবস্থানের কারণে উত্তর আফ্রিকা নিয়ন্ত্রণে অভিলাষী বহু সভ্যতার সাথে তিউনিসিয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এদের মধ্যে আছে ফিনিসীয় জাতি, কার্থেজীয় জাতি, রোমান জাতি, আরব জাতি এবং উসমানীয় তুর্কি জাতি। বর্তমান তিউনিসিয়াতে প্রাচীন ফিনিশীয় এবং পরে কার্থেজীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীতে সমগ্র এলাকাটি উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রোমক শক্তিকে পরাজিত করেই আরবরা এটি দখল করে মুসলিম দেশে পরিণত করে।

আরবদের মধ্যে 'ইফ্রিকিয়া' শব্দে মিসরের অপরদিকস্থ উত্তর আফ্রিকাকেই বুঝানো হত। মুসলিমদের উত্তর আফ্রিকা বিজয়কে মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বাইজেন্টাইন (পূর্ব রোমান) সাম্রাজ্যের ধারাবাহিক যুদ্ধ হিসেবে দেখা যায়, যার সূচনা হয়েছিল রাসূল (সা)-এর

---

১ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৪খ্রি.), খ. ১২শ, পৃ. ৪৮০।

সময়কালেই। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা)[২]-এর শাসনকালে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) এ অঞ্চলে আরবরা প্রবেশ করে। সে সময়েই মুসলিমরা উত্তর আফ্রিকার মিসর থেকে লিবিয়ার পূর্বাংশ পর্যন্ত জয় করে নেয়। ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে আমর ইবনেুল আস (রা)[৩]-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর মিসর অভিযানের মধ্যে দিয়ে আফ্রিকায় ইসলাম ধর্মের আর্বিভাব ঘটে। স্থানীয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনের কারণে তিন বছরের মধ্যেই উত্তর আফ্রিকা থেকে বাইজেন্টাইন বাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হয়। রোমান গোঁড়া খ্রিস্টান শাসকরা স্থানীয় জেকোবাইট সম্প্রদায়ের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাত এবং তাদের ধর্মগুরুদের নানাভাবে অপমান করত। এমনকি জেকোবাইটদের পাশবিকভাবে শারীরিক নির্যাতন করে মুমূর্ষু অবস্থায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হত। মুসলিম বিজয় জেকোবাইটদের কল্পনাতীত ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়। কর প্রদানের পরিবর্তে আমার ইবনেুল আস (রা) তাদের চার্চের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রদান করেন। ফলে মুসলিম শাসনে আসা মিসরসহ উত্তর আফ্রিকার সাধারণ মানুষ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিতে থাকে।

২৭ হিজরি সনে ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর খিলাফতের সোনালী শাসন আমলে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটি ইসলামী শাসন বলয়ের অধীনে আসে। খলীফা উসমান (রা)-এর খালাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন সাআদ বিন আবী সোরার নেতৃত্বে ইসলামী বাহিনী লিবিয়ার তারাবুলাস নগরীর পথে গিয়ে তিউনিস জয় করেছিলেন। দেশটির নাম ছিল তখন 'আফরিকিয়া'। খলীফা উসমান (রা)-এর শাসনামলে মুসলমানরা এদেশ জয় করার পর 'আল-কায়রাওয়ান' নাম শহরটির পত্তন ঘটে।[৪] মুসলিম

---

২ খলিফা উমর ইবনেুল খাত্তাব (রা) ছিলেন রাসূল (সা)-এর বিশিষ্ট সাহাবী ও ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর খিলাফতকাল ছিল ১০ বছর। তাঁর শাসনামলে অর্ধপৃথিবী মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি ধর্মভীরু ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন, যিনি সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। ইসলামের প্রসার ও বিজয়ে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান ইসলামের ইতিহাসে গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে। তাঁর খেলাফতকালে মিসর, সিরিয়া, পারস্য, উত্তর আফ্রিকা ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য মুসলমানদের অধিকারে আসে। তিনি ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে ঘাতকের ছুরিকাঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। (দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১৯৪)

৩ 'আমর ইবনেুল 'আস বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন। ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ৫ম হিজরিতে খন্দকের যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা ও বিচক্ষণ কুটনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ফিলিস্তিন, পারস্য ও রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে বিজয়ী হন। তিনি হিজরি ৪০ সনে/৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে ৯০বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। (দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ই.ফা.বা.), খ. ২, পৃ. ২০৬)

৪ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০৭ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৩৫।

বাহিনীর মহান সেনাপতি উকবা বিন নাফে আল-ফিহরী (রা)[৫] গভীর চিন্তা-ভাবনার পর এ শহরটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অতঃপর তিউনিসিয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত 'আল-কায়রাওয়ান' নামক শহরটিতে বহিরাগত মুসলমানদের বসবাসের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এখানেই তিউনিসিয়ার সেই প্রথম ঐতিহাসিক মসজিদ যা ৫০ হিজরি মোতাবেক ৬৭০ সনে সেনাপতি উকবা ইবনে নাফে (রা)-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে তিউনিসিয়ার স্থানীয় জনগণ মুসলিম জীবনবোধ, চালচলন আচার ব্যবহার ও বিশেষ মার্জিত জীবনাচারে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে। উকবা ৬২ হি./৬৮২ খ্রিস্টাব্দে বারবার সরদার কুসায়লাকে পরাজিত করেন এবং কুসায়লা ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে।[৬]

৬৯৩ খ্রিস্টাব্দ সনে গবর্নর হাস্‌সান বিন নোমান তিউনিসিয়া জয় করেন এবং তাঁর নির্দেশে ইসলামী ইতিহাসের প্রথম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই ইউনিভার্সিটির আরবি নাম হলো- "আল জামিয়াতুল যাইতুনিয়া'। তিউনিসিয়ায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ঐ যুদ্ধ 'জিহাদুল আবাদিলা' নামে খ্যাত ছিল। কারণ, ঐ যুদ্ধে 'আবদ' শব্দ বিশিষ্ট আব্দুল্লাহ নামের সাতজন সাহাবী শরীক ছিলেন। তাঁরা হলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আববাস, আব্দুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের, আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাদ ইবনে আবী সোরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমা'ঈন)। হযরত উসমান (রা)-এর শাসনকালে এতদ অঞ্চলে রোমকগণ পরাজিত হয়ে আরবগণকে বার্ষিক করদানে প্রতিশ্রুত হলে আরবগণ ছোট ছোট সৈন্যদল রেখে দেন।

---

৫ উকবা ইবনে নাফে (রা) ছিলেন খ্যাতনামা সিপাহসালার যিনি উত্তর আফ্রিকায় প্রাথমিক আরব অগ্রযাত্রা সংরক্ষিত এবং শক্তিশালী করে বারবার প্রতিরোধ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের শেষদিকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খ্যাতনামা সাহাবী ও মিসর বিজয়ী হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর ভাগিনা ছিলেন। আমর ইবনুল আস (রা) ৪৩ হি. /৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মনোনীত করেছিলেন। ৫০হি./৬৭০ খ্রিস্টাব্দে উকবা 'আল-কায়রাওয়ান সূদৃঢ় ফৌজী ছাউনী দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। অবশেষে ৬৩ হি./৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিদ্রোহী আফ্রিকী বার্বারদের হাতে তিনশত সৈন্যসহ শাহাদাত বরণ করেন। (দ্র. আবূল আরাব মুহাম্মাদ ইবনে তামীম, তাবাকাতু 'উলামা ইফরীকিয়্যা, অনু. মুহাম্মাদ বেব্‌ন চেনেব (আল-জিরিয়া, ১৯২০ খ্রি.), পৃ. ৮-৯; ইবনে নাজী, মায়ালিমুল ঈমান ফী মারিফাতি আহলিল-কায়রাওয়ান (তিওনিস: ১৩২০-২৫হি.), খ. ৫; ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬।)

৬ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

উমাইয়া যুগ

মুয়াবিয়া (রা) খিলাফতের আসনে সুদৃঢ়রূপে অধিষ্ঠিত হয়ে আফ্রিকা জয়ে মনোনিবেশ করলেন। সে সময় রোমান শাসনকর্তাগণ পরিত্যক্ত অঞ্চলগুলি পুনরায় দখল করল; কিন্তু তাদের তাদের অত্যাচার ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে এসব অঞ্চলের অধিবাসীগণ অনতিবিলম্বে বাইজান্টাইন শৃঙ্খল হতে নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্য আরবদেরকে আহ্বান করল। মুয়াবিয়া তাদের আহ্বানে সাড়া দেন। ওকবা ইবনে নাফের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ইফ্রিকায় পদার্পণ করে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এদেশ পুনরায় মুসলিম শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। ফলে তিউনেসিয়ার কারোয়ান পর্যন্ত মুসলিম আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

হিজরি পঞ্চাশ সনে উকবা তিউনিসের দক্ষিণে প্রসিদ্ধ সামরিক শহর কায়রোয়ান প্রতিষ্ঠিত করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল দুর্ধর্ষ বার্বার জাতিকে বশীভূত করা এবং সমুদ্রপথে রোমানদের লুটতরাজ বন্ধ করা।[৭] পঞ্চান্ন হিজরিতে উকবার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী পশ্চিমাঞ্চল বিজয় করে আটলান্টিকের তীরে উপনীত হলেন। সমুদ্রের বিশাল জলরাশি তাঁর অগ্রগতি রোধ করলে তিনি হাত উত্তোলন করে বললেন: 'হে সর্বশক্তিমান প্রভু, যদি মহাসমুদ্র আজ আমাকে বাধা প্রদান না করত তবে আরও দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে গমন করে তোমার নামের মহিমা প্রচার করতাম এবং তোমার শত্রুগণকে আঘাত হানতাম।"[৮] উকবা বিন নাফে (রা) ৬৫ হিজরিতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইফ্রিকিয়া এবং তার অধীনস্থ পশ্চিমাঞ্চল শাসন করেন।

উমাইয়া খলিফা হযরত ওলীদের সময় ৮৯ হি./৭০৭ খ্রি. মুসা ইবনে নুসায়র ইফ্রিকিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। মুসা ও তাঁর পুত্রগণের দুঃসাহসিক অভিযানের ফলে বার্বারদের সম্মিলিত শক্তি পরাজিত, গ্রিক যন্ত্রযন্ত্রকারীরা বিতাড়িত এবং এসব অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হয়। তিনি এসব অঞ্চলের বার্বার ও অন্যান্যদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র বার্বার জাতি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ফলে ভূমধ্য সাগরের দ্বীপসমূহ– মেজকা, মিনর্কা, ইভিকা বিজিত ও মুসলমানদের সাম্রাজ্যভুক্ত হল। এ সাম্রাজ্য মিসরের পশ্চিম সীমা হতে আটলান্টিক মহাসাগরের কুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ফলে ৯২ হি./৭১১ খ্রি. সনে মুসা তার

---

৭ সৈয়দ আমির আলী বলেন, হযরত উকবা (রা) পাহাড় ও সরীসৃপ দ্বারা সমাকীর্ণ এবং বিস্তৃর্ণ জঙ্গলকে সমতল করে সুদৃশ্য এক নগরী স্থাপন করলেন। এ নগরীর ধ্বংসাশেস অদ্যাবধি পরিদৃষ্ট হয়। (দ্র. সৈয়দ আমীর আলী, আরব জাতির ইতিহাস, অনুবাদ শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯১খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৫৮।)

৮ আরব জাতির ইতিহাস, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

সহকারী তারিক ইবনে যিয়াদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী স্পেনে প্রেরণ করে স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করেন।[৯]

আব্বাসীয় যুগ

পরবর্তীতে উত্তর আফ্রিকাতে উমাইয়া সরকারের নিয়ন্ত্রণ খুবই দুর্বল এবং ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। উপকূলবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো উমাইয়াদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পল্লী অঞ্চলগুলোতে স্থানীয় অধিবাসী 'আমাজিগ'দের আধিপত্য ছিল। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় বিপ্লবের পর নতুন এক পরিবারের হাতে খিলাফত হস্তান্তর হয় এবং মুসলিম বিশ্বের জন্য নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় বাগদাদে। এর ফলে উত্তর আফ্রিকার স্বায়ত্তশাসন অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পায়। রাজধানী বাগদাদ থেকে বহুদূরবর্তী অঞ্চল উত্তর আফ্রিকায় শাসনকার্য পরিচালনার জটিলতার কথা চিন্তা করে আব্বাসীয় সরকার ভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। তারা ৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে কায়রাওয়ান নগরীতে (বর্তমান তিউনিশিয়ার একটি শহর) 'ইব্রাহিম ইবনে আল-আগলাব' নামক একজন স্থানীয় গভর্নরকে একটি অর্ধ-স্বায়ত্তশাসিত রাজবংশ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয় এবং তাকে শাসনকার্য পরিচালনার ভার দেয়। যদিও আগলাবিরা নামেমাত্র আব্বাসীয়দের আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। আব্বাসী খলিফা হারুনুর রশীদের সময় ইবনে আগলাবকে ১৮৪ হি./৭৯৯ খ্রি. সনে হিজরিতে চল্লিশ হাজার দীনার বার্ষিক খিরাজ ধার্য করে ঠিকাদারী স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। ইব্রাহীম সুচারুভাবে তা পরিচালনা করেছিল। খলিফা মামুনুর রশীদের সময় ইবরাহীমের পুত্র যিয়াদতুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীতে তারা আব্বাসীয় খিলাফতের কবল থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা। করে ইবরাহীম ইবনে আগলাবের বংশধররা শতাধিক বছর যাবত যেখানে শান-শওকতের সাথে রাজত্ব করেছিল।[১০] ২৯৬ হিজরিতে এ রাজত্বের অবসান ঘটে।

তিউনিস ও উত্তর আফ্রিকাতে আগলাবিয়া হুকুমতের অবসানে উবায়দিয়া রাজত্বের সূচনা হয়। ২৯৮ হিজরি মোতাবেক ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ওবায়দুল্লাহ আলমাহ্‌দী আগালিবাকে পরাজিত করে এখানে ওবায়দী ফাতেমী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। ওবায়দী শাসকদের প্রথম রাজধানী মাহদিয়া (তিউনিসিয়া)তে ছিল। উবায়দীয়রা ৩৫৬হিজরিতে মিসরে জনৈক অল্পবয়স্ক আখশিদীয় শিশু শাসকের নিকট থেকে মিসর ছিনিয়ে নেয় এবং কায়রোতে রাজধানী স্থাপন

---

৯ আরব জাতির ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০।

১০ মাওলানা আকবর শাহ খান নজিরাবাদী, ইসলামের ইতিহাস, অনুবাদক মণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২০০৩খ্রি.), ১ম সংস্করণ, খ. ২, পৃ. ৫৬২।

করে তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করে। ৫৬৭ হিজরি পর্যন্ত এদের রাজত্ব কায়েম ছিল। এরপর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবী উবায়দী রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে আইয়ুবী রাজত্বের সূচনা করেন।[১১]

ফাতেমী খিলাফত

নবম শতাব্দীতে ফাতেমীয়রা উত্তর আফ্রিকায় একটি শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করেন। ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার সুন্নি আগলাবি রাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান জিয়াদাত উল্লাহ (৯০৩খ্রি.-৯০৯ খ্রি.)-এর সাথে ইসমাঈলী মতবাদ প্রচারক আব্দুল্লাহ আল-হুসাইনের সাথে সংঘর্ষ হলে জিয়াদাত উল্লাহ পরাজিত হন। ফলে আব্দুল্লাহর সামরিক সাফল্যের কারণে উত্তর আফ্রিকায় ৯০৯ খ্রিস্টাব্দ সনে ফাতেমীরা তিউনিসিয়ায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী (৯০৯-৯৩৪ খ্রি.) নিজেকে ফাতেমা (রা)-এর বংশীয় দাবি করতেন। সেই জন্য উবায়দুল্লাহ-প্রতিষ্ঠিত এই খিলাফত ফাতেমী খিলাফতরূপে পরিচিত। তবে কোন অনেক পণ্ডিত উবায়দুল্লাহর এই দাবী মেনে নিতে পারেননি। তাই তারা এ খিলাফতের নাম দিয়েছিলেন উবায়দীয়া। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফাতেমী খিলাফতের সীমানা আলেকজান্দ্রিয়া ও মরক্কো থেকে মিসর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। ফাতেমী খলিফারা ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ের ইসমাঈলী মতবাদে বিশ্বাসী এবং তাঁদের রাজত্বকাল স্থায়ী হয়েছিল ১১৭১ খিস্টাব্দ সন পর্যন্ত। ফাতেমীয়দের সময়ে ৯৭১ খ্রি. সনে মিশরে বিখ্যাত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১২]

যায়রিয়া রাজত্ব

উবায়দী অর্থাৎ ফাতেমীয়রা কায়রোয়ান থেকে তাঁদের রাজধানী কায়রোতে স্থানান্তরিত করার সময় মিসর থেকে মরক্কো পর্যন্ত গোটা আফ্রিকা তাদের রাজত্বভুক্ত ছিল। সেই সময় ভূমধ্যসাগরে উবায়দীদের নৌ-শক্তি সর্বাধিক শক্তিশালী বলে বিবেচিত হত। কিন্তু কায়রোতে রাজধানী স্থানান্তিত হওয়ার পর পশ্চিমে তাদের সে দাপট ক্ষীণ হয়ে আসে। তাই তিউনিসে

---

১১ ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৬।

১২ দীর্ঘ ২৬ বছর রাজত্ব করে ওবায়দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর জেষ্ঠপুত্র আবুল কাশেম আল-কাইম (৯৩৪-৪৫খ্রি.) শাসন করেন। তারপর আল-মানসুর (৯৪৬-৯৫২খ্রি.), আল-মুইজ (৯৫২-৯৭৫খ্রি.), আল-আজিজ (৯৭৫-৯৯৬খ্রি.), আল-হাকিম (৯৯৬-১০২১খ্রি.), ফাতেমী খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আল-হাকিমের মৃত্যুর পর ফাতেমী খিলাফতের প্রকৃত ক্ষমতা উজির হাতে চলে যায় এবং নাবালক উত্তরাধিকারীগণ তাঁদের ক্রীড়নক হিসেবে সিংহাসনে উপবেশ করেন। খলিফাদের দুর্বলতা, সামরিক ক্ষমতাহ্রাস, তুর্কি, বার্বার ও নিগ্রোদের প্রকাশ্য শত্রুতার কারণে ফাতেমীয় খিলাফতের পতন হয়। এমতাবস্থায় ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে গাজী সালাউদ্দিন শিয়া ফাতেমীয় খলিফা আল-আদিদ (১১৬০-৭১খ্রি.)-কে সিংহাসনচ্যুত করে মিসর দখল করেন।

যায়রিয়া স্বাধীন রাজত্ব গড়ে ওঠে। এ রাজবংশের রাজত্ব ৩৬২ হিজরি থেকে ৫৪৩ হিজরি পর্যন্ত টিকে ছিল।[১৩] অতঃপর ইসলাম গ্রহণকারী বার্বার গোত্রের সর্দার আবু বকর ইবনে উমর মুরাবিতীনদের[১৪] রাজত্ব কায়েম করে। ৪৫৩ হিজরিতে ইউসুফ ইবনে তাশকীন তাদের এক বংশধর এ অঞ্চলের বাদশাহ হন। যিনি ৪৭২ হিজরিতে স্পেন থেকে শুরু করে মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও ত্রিপলিসহ বিশাল এলাকায় সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। ৫৫১ হিজরি পর্যন্ত মুরাবিতীনদের রাজত্ব টিকে ছিল। তারপর বার্বারদের মাসমুদা গোত্রের আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে তুমার্ত মুওয়াহহিদীন বা একত্ববাদী নাম ধারণ করে ৫৪২ হিজরিতে মুরাবিতীনদের রাজধানী ও স্পেন দখল করে নিজেকে 'আমীরুল মুমেনীন ঘোষণা করে। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মুওয়াহহিদীন সেনাবাহিনী খ্রিস্টানদের সাথে পরাজয় বরণ করলে তাদের রাজত্ব আর টিকে রাখা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ৬২৭ হিজরিতে এ গোত্রের রাজত্বের অবসান ঘটে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আল-মুওয়াহহিদ কর্তৃক সাময়িক ঐক্যসাধনের পর মাগরিব তিন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা: ফেজ-এর মারীনী রাজ্য, তিলিমসান-এর আল ওয়াদিদ রাজ্য এবং তিউনিসের হাফসী রাজ্য।

হাফসিয়া রাজত্ব

মুয়াহ্হিদীনরা তাদের পক্ষ থেকে তিউনিসিয়া হাফ্স[১৫] নামক এক ব্যক্তিকে তাদের প্রতিনিধিরূপে শাসক নিযুক্ত করে। তার বংশধররা বংশানুক্রমিকভাবে শাসনকার্য চালিয়ে যেতে থাকে অবশেষে ৬২৫ হিজরিতে এ বংশের আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ৬২৫হি./১২২৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আমীর যাকারিয়া (৬২৫-৪৭ হি./১২২৮-৪৯ খ্রি.) স্বাধীনতা অর্জনের পর এই সময় হতে হাফসী রাজ্য নামে পরিচিত সমগ্র আফ্রিকাকে একত্রিত করেন এবং তিন শতাব্দী ধরে তিউনেসিয়ায় সুনামের সাথে রাজত্ব করে। আবু যাকারিয়ার আধিপত্য মরক্কো ও স্পেনের ন্যায় দূরবর্তী স্থানসমূহেও বিস্তৃত ছিল। এছাড়া উত্তর মরক্কো

---

১৩ মাওলানা আকবর শাহ খান নজিরাবাদী, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩।

১৪ ইসলাম গ্রহণকারী বার্বার গোত্রের লোকজন তাঁদের সর্দার হিসেবে আবু বকর ইবনে উমরকে মনোনীত করে। আবু বকর তাঁর অনুচরদেরকে মুরাবিতীন নামে অভিহিত করেন। এর অর্থ হচ্ছে- এরা ইসলামের সীমান্তরক্ষী সেনাবাহিনী। এদেরকে মূলছেমীনও বলা হতো। (দ্র. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিরাবাদী, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩)।

১৫ এ নামের উৎস হচ্ছে পূর্বপুরুষ মাহদী ইবনে তুমারত আল-মুওয়াহহিদ মহান স্থপতিদের অন্যতম, শায়খ হাফস উমার ইবনে ইয়াহইয়া আল-হিনতাতী এর বিখ্যাত সহচর। তাঁর পুত্র শায়খ আবু মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবী হাফস (৬০৩-৬১৮ হি./১২০৭-১২২১ খ্রি.) আফ্রিকা শাসন করেন। তাঁর পুত্র আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল ওয়ায়াহিদ ৬২৩হি./১২২৬ খ্রি. ছিলেন শাসনকর্তা, কিন্তু ৬২৫ হি./১২২৮ খ্রিস্টাব্দ সালে তিনি তাঁর ভ্রাতাদের একজন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া কর্তৃক অপসৃত হন।

ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং নাসরী ও মারীনীগণ তাঁর আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। তিনি তিউনিসকে বহুপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন।[১৬]

ইবনে খালদুনের জন্মের পূর্বকাল থেকে আরম্ভ করে শৈশবকাল পর্যন্ত প্রায় অস্থিতিশীল হাফসী সাম্রাজ্য বারংবার ভাঙ্গা-গড়ার সম্মুখীন হয়েও কোনো প্রকারে টিকে ছিল; এ সময়ে তা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। তিউনিসের বুক থেকে তা বলতে গেলে নিশ্চিহ্নই হয়ে যায়। ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে ফেযের মারিনী সম্রাট আবুল হাসান তিউনিস অধিকার করেন। তিনি ১৩৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিলমিসানের আবদুল ওয়াদিদ রাজ্যের শাসক হিসাবে শক্তি সঞ্চয় করে আসছিলেন। কিন্তু এ বিজয়ের পরবর্তী বছরই (৭৫০ হি./১৩৪৯ খ্রি.) বেদুইনদের হাতে পরাজিত হয়ে আবুল হাসান তিউনিসের অধিকারও ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হন। এর ফলে তথাকার হাফসী শাসনের ভাগ্যে পরিবর্তন দেখা দিলেও তা তার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মারিনী সম্রাট আবুল হাসানের পুত্র আবু ইনান ৭৫৮ হি./১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় তিউনিস বিজয় করতে সক্ষম হন। অবশ্য তাঁর এ বিজয়ও ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। কারণ তখন হাফসী সাম্রাজ্য নতুন শক্তিতে জাগ্রত হবার চেষ্টা করছে। এরই ফলে আবু ইনানের মৃত্যুর পর হাফসী সাম্রাজ্যের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পথে সামান্য বাধাবিপত্তি ছাড়া খুব বড় কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয়নি।[১৭] তারপর হাফসী বংশ দীর্ঘ সময় রাজত্ব করার পর ৯৪১ হিজরি/১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে উসমানী আমীরুল বাহ্‌রমার রূসা খায়রুদ্দীন তিউনিস দখল করে এলাকাটিকে উসমানী সাম্রাজ্য করে চিরতরে এ বংশের রাজত্বের অবসান ঘটায়।

উসমানী খিলাফতকাল

হিজরি সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময় ফ্রান্সের ক্রুসেডীয় (খ্রিস্টান) শাসক ৯ম লুই তিউনিসিয়া দখল করে ছিলেন। কিন্তু সম্রাট লুই মারাত্মক কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তার ক্রুসেডীয় অভিযান ব্যর্থ হয়।

১৬ শতকে উসমানীয় তুর্কিদের উত্থানের পর হিজরি ১০ম শতকে স্পেনের সম্রার্ট ৫ম চার্লস তিউনিসিয়ার উপর হামলা ও দখল করার পর সেখানে রক্তপাত ঘটালেও উসমানীয় সাম্রাজ্যের এডমিরাল খায়রুদ্দীন বারবারোসা সামুদ্রিক যুদ্ধে তাকে পরাজিত করেন। (৯৪৪ হিজরি মোতাবেক ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ) এভাবে তিউনিসিয়া তুরস্কের উসমানীয় খিলাফতের

---

১৬ ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৫শ খন্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯৬খ্রি.), পৃ. ১৮৩।

১৭ ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৫শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

অধীনে চলে যায়।[১৮] তারপর ১০৭৬ হিজরি মোতাবেক ১৬৬৫ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের সামুদ্রিক বাহিনী তিউনিসিয়ার উপর গোলা বর্ষণ করে। তবে ক্রুসেডীয়রা তা দখলে নিতে সমর্থ হয়নি। অবশেষে ১২৯৯ হিজরি মোতাবেক ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হবার পর পুনরায় তিউনিসিয়ার উপর হামলা চালিয়ে তা দখল করে নেয়। প্রায় পৌনে এক শতক পর্যন্ত তিউনিসিয়ার উপর ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শাসন বহাল থাকে। এই দীর্ঘকাল ফ্রান্সের শাসনাধীন মরক্কো এবং আলজেরিয়া ইত্যাদি এলাকার মতো ফরাসি ভাষাই এখানকার সরকারি ভাষা হিসাবে চালু থাকে। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপিয়ান কৃষ্টি-কালচারের প্রাধান্য ও দেশটিতে বৃদ্ধি পায়। এই মুসলিম দেশ তিউনিসিয়া পরে বিদেশি শাসনাধীনে চলে যায়। ১৯৫৬ সালে দেশটি ফ্রান্সের শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

---

১৮ ইয়াহইয়া আরমাজানী, মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, অনুবাদ, মুহাম্মদ এনামুল হক (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ২১৪।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের সমকালীন মুসলিম বিশ্ব

উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে ইসলামের মৌল প্রশাসনিক নীতিমালা শিথিল হলেও সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে যায়নি। খ্রিস্টোত্তর ৭০০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণের হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের দক্ষিণ অঞ্চল সহ সুদূর স্পেন, ফ্রান্স পর্যন্ত ইসলামের বিজয়ের মেসেজ পৌঁছে যায়। উমাইয়্যা বংশের ধ্বংসস্তুপে 'আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠা হয়। আব্বাসী খিলাফতের শেষ দিকে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ১০ শতাব্দী থেকেই উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব ও মধ্য এশিয়াতে বেশ-কটি শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। মুসলমান বিভিন্ন গোষ্ঠী, গোত্রের প্রাধান্য মেনে ইসলামের মূলধারা থেকে সরে গিয়ে সামন্তবাদে জড়িয়ে পড়ে। অবশ্য তখনও রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে তাদের শক্তি-সামর্থ্য ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার রাজন্যবর্গের নিকট উপেক্ষার বিষয়বস্তু ছিল না। এ সময় বাগদাদ সাম্রাজ্যের আশে-পাশে নতুন নতুন শক্তির উদ্ভব হলেও তারা বাগদাদের খলিফার অনুমতি ও অনুমোদন স্বাপেক্ষেই ক্ষমতা প্রয়োগ করত। বাগদাদ ভিত্তিক ইসলামি খিলাফত ছাড়াও পরবর্তী তিনশত বছরের মধ্যে অনেকগুলি মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় যা দক্ষিণ ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।[১৯] ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের[২০] বাগদাদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আব্বাসীয় খিলাফাত ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়। আব্বাসীয় খলিফা আল মুতী হতে আন নাসির অর্থাৎ (৯৪৬-১১৯৪ খ্রি.) সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ ২৫০ বছর প্রাচ্য ইসলামি সাম্রাজ্যে ফারসি বুওয়াইরী ও তুর্কী সেলজুকী সালাতানাত প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ সময় আব্বাসী খলিফাগণ ইহলৌকিক কর্তৃত্ব বা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব হতে

---

১৯ The Imperial Gazetteer of India, articles chera, chola and Pandua as quoted W.W. Hunter : The Indian Empire, 3rd Edition, 1966, p. 322.

২০ হালাকু খান (১২১৮-১২৬৫ খ্রি.) ছিলেন একজন মঙ্গোল শাসক ও চেঙ্গিসখানের নাতি। তিনি পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল জয় করেছিলেন। তার নেতৃত্বে মঙ্গোলরা ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল বিখ্যাত নগরী 'বাগদাদ' ধ্বংস করে। মঙ্গোলরা শহরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাগদাদের বাইতুল হিকমাহ ধ্বংস করে দেয়। বাগদাদের ধ্বংসের ফলে মামলুক শাসিত মিসরের কায়রো মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্র হয়ে উঠে। অবশ্য পরবর্তীতে মোঙ্গলরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে কোন কোন দেশে মুসলমানদের সহায়তাকারী হিসেবে গণ্য হয়েছেন।

বঞ্চিত ছিলেন। তারা এ সময় মুসলমানদের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে আমিরুল মোমেনীন পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন মাত্র।[২১]

১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দ (৮০০ হিজরি)-এর দিকে মোঙ্গল পতন ও ধ্বংসের যুগে তৈমুর[২২] নামে এক ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে। তৈমুর-এর শরীরে ছিল মোঙ্গল আর তাতার রক্ত। তৈমুর তার ২৫ বছরের সামরিক জীবনে খাওয়ারিজম (পূর্ব ইরান) থেকে আরম্ভ করে ইরান, জার্জিয়া, ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে ভারতে ঢুকে দিল্লিতে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে আসাম হয়ে তিব্বতে চলে যান। তবে ভারতে তার কোন স্থায়ী অধিকৃত অঞ্চল ছিল না। তৈমুরকে বলা হয়- ''One of the boldest and most destructive conquerors in human history''[২৩] তিনিও চেঙ্গিসখানের (১১৬২- ১২২৭ খ্রি.[২৪]) মতই যুদ্ধের মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করার নীতিকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি জয়ের ক্ষেত্রেও তিনি দিল্লিকে আতঙ্কের শহরে পরিণত করেছিলেন। তবে দিল্লিতে তার দখলের কোন স্থায়িত্ব ছিল না। ১৪০৪ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়।

দুরপ্রাচ্যে মোঙ্গল গোত্র অধিপতি চেঙ্গিসখান এক বিশ্ব সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। ফলে ইসলামী জগতের সঙ্গে তাঁর সংঘাত সৃষ্টি হয়। ১২১৯ থেকে ১২৩১ পর্যন্ত মোঙ্গলরা গোটা ইরান আযারবাইজান হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত মৃত্যু আর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে। একের

---

২১ P.K. Hitti : History of the Arabs, (London 1951), pp. 158.

২২ তৈমুর লং (১৩৩৬-১৪০৫খ্রি.) উজবেকিস্তানে জন্মগ্রহণকারী একজন তুর্কি-মংগোলীয় বংশোদ্ভূত শাসক। তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল আধুনিক তুরস্ক, ইরাক, কুয়েত, ইরান থেকে মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ অংশ যার মধ্যে রয়েছে কাজাখস্তান, আফগানিস্তান, রাশিয়া, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান, পাকিস্তান, ভারতবর্ষ এমনকি চীনের কাশগর পর্যন্ত।তিনি মিসর এবং সিরিয়া অঞ্চলের মামলুকের পতন, ওসমানী সাম্রাজ্যের উত্থান এবং দিল্লীর সুলতানি শাসনের উৎখাত করে একসময়য় মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসক হিসেবে তৈমুরী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি 'তুজুক-ই-তৈমুরী' নামে একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

২৩ Satish Chandra : Medieval India, Past Two : (Moghal Empire), (1526-1748), Delhi, 1999, p. 15.

২৪ চেঙ্গিসখান মঙ্গোল রাজ্যের (১২০৬-১৩৬৮ খ্রি.) প্রতিষ্ঠাতা। ১১৬২ খৃষ্টাব্দে চীনের এক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি মাইসুফা বাহাদুরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ১২২৭ খৃষ্টাব্দে প্রায় ২৫ বছর রাজত্ব করে মৃত্যু বরণ করেন। এই ২৫ বছরের রাজত্বকালেই তিনি পৃথিবীর সভ্য সমাজের একটি সর্ব বৃহৎ অংশ নিয়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেন। চেঙ্গিসখান ১২২৭ খ্রি. মারা যাওয়ার পর মঙ্গোল সাম্রাজ্য প্রায় ১৫০ বছর ধরে রাজত্ব করেছিল।

পর মুসলিম নগরী ধবংস্তুপে পরিণত হয়েছিল। চতুর্দশ নাগাদ মোঙ্গলরা ইসলামে দীক্ষিত হয়ে প্রধান মুসলিম শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উসমানী-তুর্কি পরিবার ইসলামি বিশ্বের উপর তাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক নেতৃত্ব দেয়; ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া– এই তিন মহাদেশের বিরাট অংশের উপর তাদের প্রভাববলয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত।[২৫]

ইবনে খালদুনের জীবন ছিল ঘটনাবহুল। তিনি ও তাঁর পূর্বপুরুষ তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, গ্রানাডা এবং মিসরের মামলুক[২৬] রাজবংশের উত্তান-পতনই কেবল লক্ষ করেননি, এসব ঘটনার তাঁরা ছিলেন প্রত্যক্ষ অংশীদার। খালদুন তিউনিসিয়ায় মাত্র বিশ বছর বয়সে রাজনৈতিক সচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন রাজদরবারে কমপক্ষে বিশ বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩৬৩ সালে গ্রাডানার রাজা তাঁকে সেভিলে রাষ্ট্রদূত করে পাঠান। তিনি তাঁর কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় রাজদরবারের উপদেষ্টা ও কাজী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। এজন্য তাঁকে কারাগারেও যেতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, সেখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে তিনি নিরলসভাবে নিয়োজিত ছিলেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ ও রাজনীতি সম্পর্কে প্রচুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করেন।

ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.) ইসলামী জগতের পশ্চিম প্রান্ত, মাগরিবে একের পর রাজবংশের পতন প্রত্যক্ষ করেছেন। প্লেগ মহামারিতে ধ্বংস হয়ে গেছে অসংখ্য জনবসতি। যাযাবর গোত্রগুলো মিসর থেকে উত্তর আফ্রিকায় এসে ব্যাপক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেই সঙ্গে যোগ হয় ঐতিহ্যবাহী বার্বার (Berbar) সমাজের নিম্নমুখী যাত্রা। ইবনে খালদুনের পরিবার তিউনিশিয়ায় এসেছিলেন স্পেন থেকে। খ্রিস্টানরা ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভা এবং ১২৪৮-এ সেভিল দখল করে নিয়েছিল। সমৃদ্ধ মুসলিম রাজ্য আল-আন্দালুসের বাকি রয়ে গিয়েছিল কেবল গ্রানাডা, যা ১৪৯২ তে খ্রিস্টানদের কাছে চলে যায়। চতুর্দশ

---

২৫ মুসা আনসারী : ইসলামী সমাজ কাঠামোর রূপান্তার ধারা; ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৭২।

২৬ মামলুক শব্দের অর্থ ক্রীতদাস। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মালিক-উস সালেহ মধ্য এশিয়া হতে হাজার হাজার তুর্কি ক্রীতদাস ক্রয় করে তাদেরকে সংগঠিত করেন। এ দাসদেরকে 'মামলুক' বলা হত। মামলুকদেরকে প্রথমে দেহরক্ষী বাহিনীতে ভর্তি করা হয়। কালক্রমে মামলুকরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মিশরে আইয়ুবীয় বংশের দুর্বলতার সুযোগে মামলুকরা নিজেদের একজনকে মিসরের সুলতান পদে স্থাপন করেন। এভাবেই মিশরে মামলুকদের শাসনকাল শুরু হয়। (দ্র. P.K. Hitti, History of Arabs, ibid, p. 345)

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে খালদুন মোঙ্গল রাজ্যগুলোর পতন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ইবনে খালদুন তাঁর জীবনের তেইশটি বছর (৭৮৪-৮০৮খ্রি.) মিসরে অতিবাহিত করেছেন। কায়রোতে তিনি মামলুক সুলতানদের প্রতিষ্ঠানে আইনের অধ্যাপক ও বিচারকের পদ অলংকৃত করেন। তবে ঘটনার দিক থেকে ইবনে খালদুনের উত্তর আফ্রিকার রাজনৈতিক জীবনই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিজরি অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর আফ্রিকার রাজনৈতিক ইতিহাসে চাঞ্চল্যকর অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল ইবনে খালদুনের রাজনৈতিক জীবনেরই বিশেষ অধ্যায়। সেখানে তিনি দুর্যোগ আর চক্রান্তে বেড়াজাল অতিক্রমের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন; ফলে তাঁকে যেমন কঠোর বিরুদ্ধবাদিতার মোকাবেলা করতে হয়েছিল, তেমনি প্রভাবশীল ও কর্তৃত্বময় পদমর্যাদায়ও তিনি অভিষিক্ত হয়েছিলেন। ঝটিকাতুল্য এ রাজনৈতিক জীবন শেষে তিনি মিশরে অনেকটা নির্জনতায় কাটিয়েছেন। অবশ্য এ সময় তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। একটি হলো পরিবার বিয়োগ, অপরটি তাতার নেতা তৈমুরের (১৩৬৬-১৪০৪ খ্রি.) সাথে বৈঠক।[২৭]

[২৭] আখ্তার-উল্-আলম, ইবনে খালদুন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯ খ্রি.), ২য় সং, পৃ. ৬১।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের সমকালীন শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা

উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হয় তা পরবর্তী পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিকাশ লাভ করে।[২৮] অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত (৭৫৬-১৪৯২খ্রি.) আরবীভাষী লোকেরাই পৃথিবীব্যাপী সংস্কৃতি ও সভ্যতার মশালবাহী ছিল (Bearers of torch of culture and civilization)।[২৯] পি.কে. হিট্টি বলেন, মধ্যযুগীয় ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসে স্পেন একটি গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে।' তমসাচ্ছন্ন ইউরোপে স্পেনই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলেকবর্তিকা।

অষ্টম শতাব্দীতে তিউনিস আইন ও ধর্মীয় শিক্ষাদানের কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। কারওয়ানের সুখ্যাতি নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই তিউনিসে সুবিখ্যাত উস্তাদগণ শিক্ষাদান করছিলেন। ধর্মীয় বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাঁরা দেশটিকে ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিরেন। এদের মাঝে বিখ্যাত ছিলেন, হাদিসবেত্তা 'আলী ইবনে যিয়াদ ও আব্বাস ইবনুল ওয়ালিদ আল-ফারিসী। ফাতিমী শাসনামলের গুরুতে আবুল-আরাব আত-তামীমী তিউনিসীয় আলিমগণের প্রথমদিকে ব্যক্তিত্বগণের একখানি প্রয়োজনীয় বিবরণী লিখে গিয়েছেন, যা কিতাব তাবাকাত 'উলামা' তূনুস, সম্পাদনা ও অনুবাদ মুহাম্মদ ইবনে চেনের-Lists of Savants of Ifrikiya'-এর সহযোগে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩০]

---

২৮ ইব্রাহীম খাঁ, আরবজাতির ইতিকথা (ঢাকা : বুক ভিলা, ১৯৭০ খ্রি.), পৃ. ৯১; কে. আলী : মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস (ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৩৩।

২৯ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম শাসনের ইতিহাস, ১ম সং, (ঢাকাঃ উত্তরণ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১১১।

৩০ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২শ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫।

তখনকার সময় মুসলিম স্পেন শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার দিক দিয়ে পৃথিবীর অন্যান শহর থেকে বেশ উন্নত ছিল। এ সময় স্পেনের শহর কর্ডোভা[৩১], সেভিল[৩২], গ্রানাডা[৩৩] প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম ক্ষেত্র ছিল। এ সময় ইউরোপ থেকে বহু মনীষী ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে স্পেনে এসে মুসলিম বিদ্যালয় ও জ্ঞানের কেন্দ্রসমূহ অধ্যয়ন ও গবেষণা করে তার আলোকে ইউরোপকে উদ্ভাসিত করেন এবং রেনেসাঁর জন্ম দেন। এমনকি জ্ঞান চর্চার, বিরোধী পোপদের মধ্যেও জ্ঞান আহরণের উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টার (Sylvester-II) স্পেন থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখে যখন ইউরোপে যান, তখন জনগণের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। ইউরোপে তদানীন্তন মূর্খ জনগণ বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির কথা শুনে হতবাক হয়ে যায় এবং ধারণা করে যে, ঐসব শিক্ষিত লোকদের উপর কোন প্রেতাত্মা বা অলৌকিক জীব ভর করেছে। ক্রমান্বয়ে ভুল ধারণার নিরসন হয়, ইউরোপেও জ্ঞানের মশাল দিকে দিকে জ্বলে ওঠে।[৩৪]

ফাতেমীয় খিলাফতের সময় আফ্রিকা মহাদেশের সমগ্র উত্তরাঞ্চল তাদের অধিকারে আসে এবং শিল্প সাহিত্যের এক নবযুগের সূচনা হয়। অচিরে ফেজ, মিকনসা, সেগেলমেসা, তাহার্ত, কায়রোয়া এবং সর্বোপরি কায়রো সংস্কৃতি ও জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়।[৩৫]

---

৩১ কর্ডোভা স্পেনের একটি শহর। স্পেনে উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আবদুর রহমান ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভাকে তার সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন। পরবর্তীতে কর্ডোভা উমাইয়া আমিরদের পৃষ্ঠাপোষকতায় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতির তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত হয়। কর্ডোভা তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল। (দ্র. P.K. Hitti, History of the Arabs (London: 1951), p. 526).

৩২ কর্ডোভা ও টলেডোর মত মুসলিম স্পেনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় শহর ছিল সেভিল। মূর সভ্যতার অত্যতম পাদপীঠ হিসেবে সেভিল পাশ্চাত্য জগতে পরিচিতি লাভ করে। এই শহরের গৌরবময় ঐতিহ্যের সূত্রপাত হয় আল-মুয়াহ-হিদুনদের (Al-Mohades)-দের রাজত্বকালে 'আল-মুওয়াহহিদুন' শাসন ১১৪৬-১২৬৯খ্রি.) র্পন্ত কায়েম ছিল। এ আমলে সেভিল মূর সভ্যতার একটি আকর্ষণীয় প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। জ্ঞান চর্চা, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, চারু ও কারুকলার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে সেভিল ইউরোপে বিশেষ পরিচিত ছিল। (দ্র. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, স্পেনে মুসলিম সভ্যতা (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১০ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৩)

৩৩ গ্রানাডাকে মুসলিম স্পেনের অন্যতম শহর। এ শহর ছিল মূর সভ্যতার সর্বশেষ আশ্রয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষি, উৎপাদন ও প্রাচুর্যের ফলে গ্রানাডা নগরীর গৌরব ও সুনাম সারা জগৎব্যাপী বিস্তার লাভ করে। (দ্র. আর্নেস্ট কুহনেল, ইসলামী শিল্পকলা ও স্থাপত্য, বাংলা অনুবাদ, মোসলেম আলী বিশ্বাস (চট্টগ্রাম: ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ১২০।)

৩৪ মুহাম্মদ আহ্‌সান উল্লাহ, খিলাফতের ইতিহাস, অনুবাদক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার সিদ্দিকী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ঙ-চ (সম্পাদকীয়)।

৩৫ Sayed Ameer Ali, The Spirit of Islam (Chistophers, 1955.), p. 375.

ফাতেমী খলিফা আবু তামীম মা'আদ আল-মুইয (৯৫২-৯৭৫ খ্রি.)-এর সময় সেনাপতি জওহর ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে আল-আযহার মসজিদ নির্মাণ করেন। মুসলিম জাহানের পণ্ডিতরা চতুর্দিক থেকে এখানে এসে তাফসীর, হাদীস, ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, কাব্য, তর্কশাস্ত্র ও আইনশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন।[৩৬] এ প্রতিষ্ঠানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুসলিম পণ্ডিতগণ তৎকালীন সময় পাঠদান করেছেন। আল-মাকরিযি (১৩৪৬-১৪৪২ খ্রি.) আল-আনওয়ার (আল-হাকিমী) বলেন: ইবনেুল হাইসাম (৯৬৫-১০৩৯ খ্রি.) এখানে পাঠদান করেছিলেন।[৩৭] এছাড়া আবদুল লতিফ আল-বাগদাদী (১২৬০-১৩৩১ খ্রি.), ইবনে খালদুন স্বয়ং নিজে মিশরে এসে অধ্যাপনা করেছিলেন। এ সময় মামলুক সুলতানদের প্রতিষ্ঠিত মিসর ও সিরিয়ায় বড় বড় মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এসব প্রতিষ্ঠানে চতুর্দিক থেকে আগত ছাত্ররা ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা লাভ করত। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল। এতে জ্ঞানের প্রতিটি শাখার দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য কিতাবাদি সংরক্ষিত ছিল।

তবে ইবনে খালদুন সমকালীন ইবনে রুশদের পর থেকে মুসলিম জগতে বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে যে স্থবিরতা দেখা দেয়। এ সময় থেকে বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত এসময়ে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মুসলমানরা তেমন অগ্রগতি করতে পারেনি। এর কারণ হল- এসময় মুসলমানদের মধ্যে এক চরম স্বার্থপর মনোভাব দেখা দিল, ফলে মুসলমানরা বিভক্ত হয়ে পড়ল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে। প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা করার পরিবর্তে তারা ক্রমশ হয়ে পড়ল কুসংস্কারাচ্ছন্ন।[৩৮]

এ যুগে পরিবেশে শিক্ষা-দীক্ষার যে প্রচলন ও প্রতিপত্তি ছিল ক্ষয়িষ্ণু। বিশেষ করে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্লেগ মহামারির তাণ্ডবলীলা সে ক্ষয়কে আরো অবধারিত করে এনেছিল। ইবনে খালদুন তাঁর আলম-মুকাদ্দিমায় এ সম্পর্কে অত্যন্ত আগেবপূর্ণ বর্ণনা দান করেছেন এবং জনবসতির অভাবে কীভাবে সর্বপ্রকার শিল্পকর্মও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তারও উদাহরণ উপস্থিত করেছেন। সুতরাং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার জনজীবনে যে এর প্রভাব

---

৩৬ Mackensen, Ruth Stellhorn, Background of the History of Muslim Libraries (American Journal of Semitic Languages, II, 1937), p. 22; Durant Will, The Age of Faity (Simon & Schuster, 1950), p. 288.

৩৭ Encyclopaedia of Islam, Vol. I (E.J. Brill, 1960), p. 806; Abdul Latif al-Bagdadi, Kitab al-lfidah Wa'IItibar (Kamal Hafuth Zand & others, Trans. Eastern Key, George Allen & Unwin, 1965), p. 6.

৩৮ ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি (ঢাকা: মাওলানা ব্রাদার্স, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৩১২-১৩।

পড়েছিল, সেকথা উল্লেখ না করলেও চলে। তবু ইবনে খালদুনের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, তিনি এ বিলীয়মান শিক্ষাদীক্ষা থেকেও নিজের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। একারণেই তাঁর পিতার নিকট শিক্ষালাভের সৌভাগ্য অর্জন ও তাঁর পুণ্য প্রভাবকে নিজের জীবনে গ্রহণ করেও ইবনে খালদুন তাঁর অন্যান্য শিক্ষকদের কথাও সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। কারণ, তৎকালে ধর্মীয় বিধান দান ও অন্যান্য ব্যাপারে মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের এ পরিচিতির একটি প্রথাগত ব্যাপক মূল্য ছিল। যে কোনো বিষয়ে মন্তব্য প্রদানের সূত্র হিসাবে এ শিক্ষকদের কথা উল্লেখ করতে হত। এ কারণে ইবনে খালদুনও সে প্রথাকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন। তবু তাঁর শিক্ষকদের বিবরণ দানের ক্ষেত্রে স্পেনীয় কিংবা তৎসংশ্লিষ্ট শিক্ষকেরা যে ধরনের ধারাবাহিক উল্লেখের মর্যাদা পেয়েছেন, অন্যরা তেমনটি পাননি। এর কারণ ইতিপূর্বেও একবার উল্লেখ করেছি; ইবনে খালদুন মনন ও মানস প্রক্রিয়ার দিক থেকে স্পেনের সাথেই অধিকতরভাবে যুক্ত ছিলেন।

ইবনে খালদুনের বংশধরেরা ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সেভিলে বসবাস করেন। অতঃপর খালদুন পরিবারই নয়, বরং স্পেনের বহু গণ্যমান্য পরিবার একই কারণে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় এসে পড়েন। বস্তুত তাদের আগমনের ফলে স্পেনের সভ্যতা-সংস্কৃতির এক ব্যাপক প্রভাব উক্ত অঞ্চলের জনজীবনে অনুভূত হতে থাকে। ইবনে খালদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় এ সম্পর্কে বারংবার উল্লেখ করেছেন। এর ফলে একদিকে যেমন তৎকালীন আফ্রিকার শিক্ষা-দীক্ষায় নতুন চৈতন্যের সৃষ্টি হয়, তেমনি অন্যদিকে এরই কল্যাণে এ স্পেনীয় মুসলিমরা আফ্রিকার রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে স্পেনের অধিকতর আধিপত্যই এর কারণ। তদুপরি তুলনামূলকভাবে খালদুন পরিবারের স্পেনে বসবাসের দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যও এর সাথে যুক্ত হয়েছে।

ইবনে খালদুন আফ্রিকার সম্রাটদের দরবারে উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত থেকেও এটাকে নিতান্ত চাকরি বলে মনে করেছেন এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় আনুগত্যের অধিক কোনো প্রকার দায়িত্ববোধে নিজেকে জড়িত করেননি। তাছাড়া উত্তর আফ্রিকার গোলযোগপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থা তাঁকে বিচলিত করেছিল। ফল ইবনে খালদুন কখনো আফ্রিকা, কখনো স্পেন এবং জীবনের শেষকাল মিশরে অতিবাহিত করেছিলেন।[৩৯]

---

৩৯ ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২ খ্রি.), খ.১, পৃ. ৩।

১৩ শতকে তিউনিসিয়ার বার্বার আঞ্চলিক বার্বার ভাষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু আরবরা সেখানে আরবী ভাষার প্রচলন করেন। তবে শহরের আরবী ভাষার সাথে বেদুইন গ্রামের ভাষার পরিবর্তন হত। ব্যঞ্জনধ্বনি পদ্ধতি ও ব্যাকরণের দিক হতে বেদুইন কথ্য ভাষা শহরের আরবী হতে ভিন্ন রূপ হয়ে যেত বলে ইবনে খালদুন বর্ণনা করেছেন।

ইবনে খালদুনের সমকালীন জীবনী, ইতিহাস, ইসলামী ধর্মশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যুগের পণ্ডিতগণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.), হাদীস বিশারদ ইবনে হাজার আসকালানী (১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.) এ যুগের খ্যাতিমান ইসলামী পণ্ডিত ছিলেন। কুরআন, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও দর্শনসহ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্নশাস্ত্রে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। কবি শরাফ উদ্দীন মুহাম্মদ আল-বুসীরী (১২১৩-১২৯৬ খ্রি.) 'আল-বুরদাহ' নামক কাব্য লিখে খ্যাতি এ যুগে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

এ সময় ইতিহাসবিদ আবুল ফিদা (১২৭৩-১৩৩১ খ্রি.) 'মুখতাসার তারীখ-উল-বাশার' নামে মানবজাতির ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করেছিলেন। আবুল মহাসিন ইবনে তাগরি-বিরদি (১৪১১-১৪৬৯ খ্রি.) 'আন-নুজুম-উল-জাহিরাহ ফি মুলুক মিসর ওয়াল কাহিরাহ' নামে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এতে আরব বিজয়ের সময় হতে ১৪৫৩ সময় পর্যন্ত মিসরের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জালাল-উদ্দিন-আস-সুয়ুতী (১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.) কুরআন, হাদীস, আইন, দর্শন, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ লিখেছিলেন। তকি-উদ্দীন আহমদ আল-মাকরীজি (১৩৬৪-১৪৪২ খ্রি.) মিসরের মামলুকদের যুগের খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি মিসরের ভৌগোলিক, বিবরণ, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেছেন।[৪০]

ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা

তিউনিসিয়ার অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলিম। তবে তিউনিসিয়াতে ইহুদি ও ইউরোপীয় অধিবাসীদের বসবাস ছিল। এখানে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বসবাসও ছিল। হাফসীগণের শাসনামলে তিউনিসের সর্বোচ্চ ধর্মীয় দায়িত্ব পারন করতেন 'কাদি'ল জামা'আ' (সামাজিকগণের কাযী) এবং রাষ্ট্রে প্রধান মুফতী 'শাইখুল ইসলাম' উপাধি ধারণ করতো এবং মুফতীদের ব্যাপক ক্ষমতা ছিল।

---

৪০ মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, আরব জাতির ইতিহাস (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৩৮৯-৩৯১।

তিউনিসিয়া প্রাচীন বার্বারদের আবাসস্থল ছিল। দীর্ঘকাল যাবত আরব সৈনিকগণ সংখ্যায় যথেষ্ট ছিলনা বিধায় পুরাতন বার্বার গোষ্ঠীগুলিতে কোন বড় ধরনের পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু খ্রিস্টীয় ১১ শতকে প্রথমে হেলালী ও পরে ১২শ ও ১৩শ শতকে সুলায়মান গোত্রীয় আরবদের সময় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। তারা স্থানীয় বার্বারদের সাথে মিশে তাদেরকে সম্পূর্ণ নিজেদের প্রভাবাধীনে নিয়ে আসে। ফলে বর্তমানে কোনটি আরবগোত্র আর কোনটি বার্বার গোত্র তা বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় না। ইবনে খালদুন তৎকালের বার্বারদের সম্বন্ধে তাঁর মুকাদ্দিমায় উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন তিউনিসিয়াতে যাযাবরদের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল। এদের বেশিরভাগ নেফযাওয়া ও তিউনিসিয়া সাহারা অঞ্চলে বসবাস করত।

তৎকালীন সময়ে কামিল ব্যক্তিবর্গের বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দ্বীনের আরকান ও ফরজসমূহ প্রতিপালন সত্ত্বেও স্থবিরতা ও অধোগতি লক্ষ করা যায়। নেতৃস্থানীয় ও ধনিক শ্রেণি ইসলামের মূলনীতিসমূহ ছেড়ে ক্ষমতা ও সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন ছিল এবং বিলাসিতা ও ভোগ-সম্ভোগে বিভোর ছিল। তখন শিয়া, খারেজি সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের দ্বন্দ্ব ছিল। এ যুগে মুসলমানগণ শিয়া, সুন্নি ও বিভিন্ন ধর্মীয় দল উপদলে বিভক্ত হওয়ার ফলে ইসলামি সমাজ বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। মুসলিম উম্মাহর শক্তিমত্তাকে এসব জিনিস ভীষণভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল। ফলে একদিকে গোটা উম্মাহ যেমন বিভক্ত হয়ে পড়েছিল বিভিন্ন মাযহাব, ফিরকা ও সম্প্রদায়ে, তেমনিক অন্যদিকে গোটা ইসলামী সালতানাত টকুরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন দেশ ও রাজ্যে। মুসলিম উম্মাহর শক্তিমত্তাকে এসব জিনিস ভীষণভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল। ফলে উম্মাহর শক্তি তখন নিয়োজিত ছিল রাজনৈতিক গোলযোগ দমনের কাজে।

এ যুগটি মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের মধ্যাহ্নকাল। জ্ঞানে-প্রাচুর্যে, দৃষ্টি প্রসারতায় এ যুগ আলোক উদ্ভাসিত। কিন্তু ধর্মীয় ফিতনা ও অনৈক্যের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা ও উত্থানের সাথে সাথে মুসলিম এক্য ক্রমেই পতন ঘটেছে। এ সময় তাসাউফ শাস্ত্র উন্নতি লাভ করেছিল। তবে এর ভেতর বহু অনৈসলামী উপাদান ও ভাবধারা ঢুকে পড়েছিল এবং অনেক পেশাদার মুর্খ-জাহিল ও বিদআতী এ দলে শামিল ছিল।

তৎকালীন সময়ে দার্শনিকদের একটি দল ধর্ম ও আম্বিয়া (আ)-এর পেশকৃত শিক্ষা থেকে দূরে গিয়ে স্বাধীন মত প্রচার ও প্রসারে লিপ্ত ছিল। অপর একটি দল দর্শনকেই সত্যের মূল ও মাপকাঠি অভিহিত করে ধর্মকে এর সঙ্গে জুড়ে দিতে চাইত এবং ঐশীবাণীকে তারা বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস চালাত। এরা এ্যারিস্টোটল ও প্লেটোর অনুকরণকারী ছিল। ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমার বিভিন্ন স্থানে এই এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রাচীনকাল থেকে তিউনিসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিউনিসিয়ার অবস্থান খুবই সুবিধাজনক। মধ্য এশিয়ার বহির্মুখে, বেশ উর্বর জমিন ও অঞ্চল। সমুদ্র এত কাছে যে, নিকটবর্তী ইউরোপীয় উপকূলভূমির সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। মুসলিম বিজয়ের পর থেকেই তিউনিস আলোকজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাস্‌সান ইবনেুন নুমান ৬৯৮ খ্রি. এখানে একটি অস্ত্রাগার নির্মাণ করেছিলেন। উমাইয়া গভর্নর ইবনেুল হাবহাব ১১৪ হি./৭৩২ খ্রি. এখানে একটি জামি মসজিদ নির্মাণ করেন যা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত নগরের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ ছিল।

৮ ও ৯ম শতকে তিউনিসের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বিকশিত হতে থাকে। খ্রিস্টীয় দশম শতকে তিউনিস শহরটির বেশ উন্নতি হয়েছিল। এসময়কার প্রাচুর্যের কথা ইবনে হাওকালের বিবরণী হতে পাওয়া যায়। তিনি এখানকার মৃৎশিল্পের এবং শহরের চতুর্দিকের বাগ-বাগিচা ও কূপ হতে চাকার সাহায্যে পানি সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদির বিবরণ দিয়েছেন। হাফসীগণের সময় আবু মুহাম্মদ ইবনে আবী হাফস এখানে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিলেন। ইবনে বতুতা তাঁর উল্লেখ করেছেন। তিনি মসজিদ ও মাদ্‌রাসা তৈরি করেন এবং এগুলোর চতুর্দিকে মহল্লাগুলি সংগঠিত করেন; পাশে সুকুল আততারীন (তৈল ও আতর) ব্যসায়ীদের জন্য ও কাপড় ব্যবসায়ীদের (সুকুল কুমাশ) জন্য গৃহনির্মাণ করেছিলেন।[৪১]

ইউরোপের সাথে তিউনিসের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারিত ছিল। খ্রিস্টীয় ১৩০০ শতকের তিউনিস ছিল অনেক সমৃদ্ধ শহরের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট, শ্রমজীবী ব্যবসায়ী, স্বর্ণ-রৌপ্যকার যাবতীয় সবকিছু তিউনিস শহরকে সমৃদ্ধ করেছিল এবং প্রতিটি মহল্লা একেকটি বহিঃদেওয়াল দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

---

৪১ O. Houdas and R. Basset, Mission scientif en Tunisie, Algiers 1882, pp. 5-9.

তিউনিসিয়ার উত্তরের বিস্তীর্ণ তটরেখা দেশটির বড় সম্পদ। এ অঞ্চলেই উর্বর উপত্যকাসমূহ অবস্থিত। উত্তরের উপকূলবর্তী এলাকাগুলোতে প্রধানত কৃষি কাজ হয়। এদিকের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ ও মনোরম, শীতকালে বৃষ্টি হয়। দক্ষিণদিকে সাহারা মরুভূমির অন্তর্গত। প্রধান প্রধান উৎপাদন গম, গোল আলূ, জলপাই, ওট, বিট, আঙ্গুর, খেজুর ও কমলালেবু। অন্যান্য উৎপাদন যব, টমেটো, তরমুজ, সিম, মরিচ, তামাক, আপেল, পিচ এবং অন্যান্য ফলমুল। উত্তরাঞ্চলেই ব্যাপকভাবে পশুপালন করা হয়। যেমন, ভেড়া, ছাগল, গরু, গাধা, ঘোড়া, উট, খচ্চর, হাঁস-মুরগি এবং এগুলির গোশত, দুধ, চামড়া, পশম ও ডিম দেশের বড় সম্পদ। সমুদ্র হতে মাছ আহরণ তৎকালীন অধিবাসীদের অন্যতম পেশা ছিল।[৪২]

[৪২] ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ১২শ, পৃ. ৪৬৮; ৪৭২-৭৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবনে খালদুনের জীবন-পরিক্রমা

১ম পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের বংশধারা ও শিক্ষাজীবন

২য় পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের কর্ম জীবন

৩য় পরিচ্ছেদ
মিশরে ইবন খালদুন ও তাঁর শেষ জীবন

১ম পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের বংশধারা ও শিক্ষাজীবন

ইবনে খালদুনের সমগ্র জীবনকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। ইবনে খালদুনের জীবনের প্রথম ২০ বৎসর কাল হল– বাল্য ও শিক্ষাজীবন। দ্বিতীয় ভাগে ২৩ বৎসরকাল পরবর্তী অধ্যয়ন, সমীক্ষা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে অতিবাহিত হয়। তৃতীয় ভাগে সুদীর্ঘ ৩১ বৎসরকাল তিনি সুপণ্ডিত, শিক্ষক ও প্রশাসক-বিচারক হিসবে অতিবাহিত করেন। তাঁর জীবনের উল্লিখিত প্রথম দু'ভাগে মুসলিম পাশ্চাত্য তথা তিউনেশিয়া ও স্পেনে কাটে। তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মাগরিব ও মিশরে কাটান।

জন্ম ও বংশধারা

আল্লামা ইবনে খালদুন তিউনিসের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ৭৩২ হিজরির ১ রমজান (২৭ মে, ১৩৩২ খ্রি:) জন্মগ্রহণ করেন।[৪৩] তাঁর পুরো নাম ওলীউদ্দিন আবু যায়েদ আবদুর রহমান ইবনে মুহম্মদ ইবনে খালদুন আল-হাযরামী। এ নামের মধ্যে 'ওলী উদ্দিন' তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত উপাধি; যার অর্থ হল 'ধর্মের অভিভাবক'। আবু যায়েদ তাঁর ডাকনাম; মূল নাম আবদুর রহমান এবং তাঁর পিতার নাম মুহম্মদ। তাঁর মিতামহের নামও ছিল মুহম্মদ। ইবনে খালদুন তাঁর পারিবারিক নাম। আর এ নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিত। বংশধারা হল– ওয়ালীউদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ, ইবনে মুহাম্মদ, ইবনে আল-হাসান, ইবনে জাবির, ইবনে মুহাম্মদ, ইবনে ইব্রাহীম, ইবনে আবদুর রহমান ইবনে খালদুন।

পূর্বপুরুষ ও বংশীয় ঐহিত্য

'খালদুন'[৪৪] পরিবারের সর্বব্যাপী সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি ক্রিয়াশীল ছিল। দীর্ঘকাল ধরে এ পরিবার স্পেন ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় উচ্চরাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি গড়ে তুলেছিল। এ আরব পরিবার দক্ষিণ আরবের

---

৪৩ ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২ খ্রি.), খ.১, পৃ. ৩।

৪৪ স্পেনীয় ঐতিহাসিক ইবনে হাজমের মতে খালদুনের এ পূর্বপুরুষের নাম ছিল 'খালেদ' এবং এ খালেদ শব্দটিই 'খালদুন' উচ্চারিত হয়ে শেষ পর্যন্ত 'খালদুন'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। আবশ্য ইবনে খালদুন স্বয়ং তাঁর আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। বরং তিনি যেভাবে খালদুন বংশের প্রতিষ্ঠাতা পূর্বপুরুষ থেকে নিজেকে অধস্তন দশম পুরুষ ধরে সংখ্যা গণনা করেছেন, তা সন্দেহের উদ্রেক করে। কারণ আল-মুকাদ্দিমায় এ সম্পর্কে তাঁর নিজের বর্ণিত নিয়ম অনুসারে এক শতাব্দীতে তিন পুরুষ ধরলেও এ সংখ্যা নিতান্তই কম বলে মনে হয়। (দ্র. ইবনে হাযম, জামহারা, সম্পাদনায় খবার-Provencal, p. 430; ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১।)

হাদ্রামাওত থেকে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মুসলিম বিজয় অভিযানের সূচনাপর্বে স্পেনের সিভিলে বসতি স্থাপন করেন।

ইবনে খালদুনের পূর্ব-পুরুষরা একসময়ে দক্ষিণ আরবের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁর 'আল-হাযরামী' উপাধির মধ্যে সে ইতিহাসেরই ইঙ্গিত বিদ্যমান। সম্ভবত তাঁর এ বংশগত পরিচয়ের কল্যাণেই তিনি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার আরব-বেদুইন গোত্রগুলোর উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তারের অধিকারী হন।[৪৫]

ইবনে খালদুনের পরদাদা যিনি ইবনে খালদুন নামে পরিচিত, ইয়ামেনী সৈন্যদলের সঙ্গে আন্দালুসিয়ায় প্রবেশ করে 'কারমোনা'তে বসবাস করতে আরম্ভ করেন।

খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ দিকে কুরাইব ইবনে খালদুনের আবির্ভাবে এ পরিবারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। হিজরি তৃতীয় শতকের শেষের দিকে উমাইয়া শাসনকর্তা আমীর ইবনে মুহাম্মদ (২৭৪-৩০০ হি.) শাসনকালে খালদুন গোত্র ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। আমীর ইবনে মুহাম্মদের রাজত্বকাল বিদ্রোহ ও বিপ্লবের জন্য খ্যাত। সেভিল ছিল বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র। এই বিপ্লবীদের মধ্যে উমাইয়া ইবনে আদুল গাফির আব্দুল্লাহ ইবনে হাজ্জাজ, কুরাইব ও খালেদ ইবনে খালদুন প্রমুখ প্রখ্যাতনামা পরিবার ও গোত্রের নাম ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুরাইব ইবনে খালদুন সমগ্র শক্তিকে করায়ত্ব করে নিয়ে নিজেকে সেভিলের শাসনকর্তা হিসেবে ঘোষণা করেন। তাঁর নেতৃত্বে সেভিলায় একটি অর্ধ-স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয় এবং খালদুন পরিবার এখানে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে। প্রায় একদশক রাজ্য শাসনের পর ৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে উক্ত কুরাইব নিহত হন।

এরপর খালদুন গোত্রের ইতিহাসে ভাটার টান পরিলক্ষিত হয়। সারা উমাইয়া রাজত্বকালে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের শাসনামলে এমনকি ইবনে আব্বাস কর্তৃক সেভিল জয়ের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েও তাদের খ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়।

ইবনে আব্বাস কর্তৃক সেভিল জয়ের পর বনু খালদুনের পরিবার পুনরায় আবার জেগে উঠে। বনু আব্বাসের অধীনে বনু খালদুনের অনেকেই মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি উচ্চপদ লাভ করতে সক্ষম

---

৪৫ Allen J. Fromherz, *Ibn Khaldun, Life and Times* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010): 42-43; M. Saeed Shiekh, Studies in Muslim Philosophy (Lahore: Pakistan Philosorphica Congress, 1962); Ibn Khaldun, The Muqaddimah An Introduction to History, trans. Frans Rosenthal, Vol. I, II, III, Bollingen Series XLII (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980), p. 12.

হন। প্রখ্যাত জঙ্গে জাল্লাকা এই সময়েই সংঘঠিত হয়। ৪৯০হিজরি/১০৬৮ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত এই যুদ্ধে ইবনে আব্বাস এবং তাঁর সুহৃদ মোরাবিদ বংশীয় ইউসুফ ইবনে তাশকীন, ক্যাস্টাইলের অধিপতি ষষ্ঠ আল্‌ফনসকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। এরপর পরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের দ্রুত পতন নেমে আসে এবং মোরাবীদ বংশীয়গণ কিছুদিনের জন্য মুসলিম স্পেনের শাসনভার গ্রহণ করেন। এ সময় থেকেই এ পরিবারের সদস্যরা শুধু রাজনীতি নয়, জ্ঞানগুণের চর্চাতেও সুনাম অর্জন করতে থাকেন। এ জন্যই দেখা যায় খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে সেভিলার কর্তৃত্ব একপ্রকার এ খালদুন পরিবারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। এ সময় খালদুন পরিবারে বহু ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায় সমসাময়িককালে সকলের আদর্শস্থানীয় যে ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। একাদশ শতাব্দীতে খালদুন পরিবারে আবু মুসলিম আমর ইবনে আহমদ ইবনে খালদুন (মৃ. ৩৩৯ হিজরি)-এর আবির্ভাব ঘটে। যিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী মাসলামা আল মাজরিতীর শিষ্য ছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বেষণে তাঁর নিজেরও খ্যাতি ছিল। ইবনে খালদুন তাঁর এ পূর্বপুরুষের নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছেন। ইনি বিখ্যাত কুরাইব ইবনে খালদুনের ভ্রাতা মুহম্মদের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ ছিলেন।

এমনিভাবে প্রায় সুদীর্ঘ পাঁচশত বছরের ঐতিহ্য বহন করে খালদুন পরিবার যখন সর্বত্র সুপরিচিত ও সম্মানিত এবং সেভিলার নগরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন তথাকার আলমোহেদ শাসনের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে।[৪৬] খ্রিস্টানদের অগ্রাভিযান ক্রমশ স্পেনের মুসলিম শাসনকে সংকুচিত করে আনতে থাকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে খালদুন পরিবার উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার নিরাপদ পরিবেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। অবশ্য সেখানেও তাঁরা অপরিচিত ছিলেন না। তদুপরি তাদের এক আত্মীয় ইবনেুল মুহতাসিব ছিলেন আফ্রিকার এ অঞ্চলেরই অধিবাসী। তিনি এক সময়ে তথাকার হেফসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়াকে একটি ক্রীতদাসী উপহার দিয়েছিলেন। কালক্রমে এ ক্রীতদাসীই সম্রাটের কতিপয় সন্তানের জননী হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে উক্ত ইবনেুল মুহতাসিব সম্রাট পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন। খালদুন পরিবার ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণকালে এ ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট সহায়ক হয়। এ ছাড়া স্পেনে অবস্থানকালে তাঁদের পারিবারিক

---

[৪৬] Yves Lacoste, Ibn Khaldun: The Birth of History and the Past of the Third World (London: Verso, 1984): 36-37

কৃতিত্ব এ ভিন্ন পরিবেশেও তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা লাভকে সহজ করে তোলে। সুতরাং খালদুন পরিবার আফ্রিকায় এসেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথেই বসবাস করতে আরম্ভ করেন।

স্পেন ত্যাগ করে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় এসেছিলেন ইবনে খালদুনের পিতামহের পিতামহ হাসান ইবনে মুহম্মদ। তিনি ছিলেন ইবনে খালদুনের চতুর্থ পূর্বপুরুষ। তিনি এখানে এসে প্রথমদিকে কিছুকাল সিওটার (سبتة) বসবাস করেন। সেখান থেকে ইফরাকিয়্যা গমনের পর হাফসী সম্রাট আবু জাকারিয়ার (৬২৫-৪৭ হি./১২২৮-৪৯ খ্রি.) তিউনিসে এসে বসতি স্থাপন করেন। এখানে এসে হাসান ইবনে মুহম্মদ মক্কায় হজ্জব্রত সমাপন করে আসে। সেখান থেকে এসে 'বন'-এ সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হলে সম্রাট তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী একটি জায়গীরও দান করেন। এভাবে হাফসী সম্রাটদের সাথে খালদুন পরিবারের সখ্যতার সূত্রপাত হয় এবং কালক্রমে তাঁদের খ্যাতি ও সমৃদ্ধি দেখা দেয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও উক্ত পরিবারের সদস্যরা শান্তিতে বসবাস করতে পারেননি। ইবনে খালদুনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পূর্বপুরুষের অনেকেই এ হাফসী সম্রাটদের মধ্যেকার বিদ্রোহ বিপ্লবে বিপর্যস্ত হয়েছে। তবু তাঁদের মধ্যে বিজয়ী পক্ষের সাথে যুক্ত থাকার একটা অভ্যাস ছিল বলে এ প্রকার সাময়িক বিপর্যয়ের পর আবার সুদিন ফিরে এসেছে।

ইবনে খালদুনের পিতামহের পিতামহ হাসান সম্রাট আবু জাকারিয়ার শাসন আমলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর পুত্র আবু বকরর সম্রাট আবু ইসহাকের শাসনামলে (৬৭৮-৮১/১২৭৯-৮৩) উচ্চ রাজকীয় পদ অর্থাৎ 'সাহিবে আশগাল' বা অর্থমন্ত্রী অভিষিক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু হাফসী সম্রাটদের বিরুদ্ধ আমীর ইবনে আবু উমারার (৬৮১-২/১২৮৩-৪) বিদ্রোহের সময় তিনি ধৃত ও নিহত হন।[৪৭] তাঁর পুত্র অর্থাৎ ইবনে খালদুনের পিতামহের নাম ছিল মুহম্মদ। তিনি 'নায়েবে হাজেব' পদে ছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হাফসী সম্রাটরা তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতেন এবং এ কারণে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব ছিল অসামান্য। এর ফল হিসাবে শেষ জীবনে তাঁকে উচ্চতর পদমর্যাদা দান করা হয়; কিন্তু তিনি নিজেই তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। সম্ভবত তাঁর পিতার করুণ পরিণতি তাঁকে উচ্চপদ লাভের লোভ সংবরণ করতে উৎসাহিত করে থাকবে। এর ফলে তিনি

---

৪৭ ইবনে খালদুনের এ প্রপিতামহ 'আদাবুল কাতিব' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারী ইবনে আবী উমারা তাঁকে রাস্ট্রীয় পদ থেকে অপসারণ ও অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেন। (দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭ খ্রি.), খ.৩, পৃ. ৬১৭)

শান্তিতে অবসর জীবন-যাপন করার সুযোগ পান এবং জ্ঞানার্জন ও ধর্মপালনে মনোযোগ দেন। ৭৩৭ হি./১৩৩৭ খ্রি. তাঁর মৃত্যু হয়।

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের পিতা মুহাম্মদ ছিলেন এই মুহাম্মদেরই পুত্র। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি রাজনীতির ধার ধারতেন না বরং অধ্যয়নই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। ফিকাহ, ভাষাতত্ত্ব ও কবিতা ছিল তাঁর সব চেয়ে প্রিয়। বস্তুত ইবনে খালদুনের এ শান্তিপ্রিয় সম্মানিত পিতামহের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়নেই তাঁর পিতা মুহম্মদ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এ কারণেই রাজকীয় পদমর্যাদা বা রাজনীতির প্রতি তিনি নিরাসক্ত ছিলেন। যার ফলে পিতামহ ও পিতার এ পুণ্যপ্রভাব ইবনে খালদুনের জীবনে এমন সুফল লাভ করেছিল। ইবনে খালদুনের পিতা হিজরি ৭৪৮-৫০হি./১৩৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্লেগ মহামারিতে[৪৮] ইন্তিকাল করেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আবু জায়েদ ওলী উদ্দীন আবদুর রহমান ছিলেন তখন যুবক হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনিই ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন নামে পরিচিত হয়েছিলেন। ইবনে খালদুনের অন্য ভায়েরা হলেন, ওমর, মুসা, ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ। এঁদের মধ্যে ইয়াহইয়া উজিরের পদ লাভ করে জীবনের কর্মক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৪৯]

বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন

ইবনে খালদুনের পরিবারটি ছিল বিদ্যানুরাগী। ফলে তিনি প্রচলিত শিক্ষার সব সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাতময় জীবন সংগ্রামের যে ঐতিহ্যের মধ্যে তাঁর বংশ গড়ে উঠেছিল, সেই ঐতিহ্য তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পিতার কোলেই ইবনে খালদুন লালিত-পালিত এবং পিতাই ছিলেন তাঁর প্রথম উস্তাদ। তাঁর পিতা তৎকালীন একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন। তিনি পুত্রকে ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষাদান করেন।[৫০]

---

৪৮ ইংরেজি Blacl Death-নামক এ মহামারীর প্রভাবে ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও সিরীয় দেশ প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। ইতিহাস থেকে জানা যায়– মহামারীর প্রভাবে ইংল্যান্ডে এক-তৃতীয়াংশ, মিসরে নয় লক্ষ, সিরিয়ার এক গাযা শহরেই ২২ হাজার নর-নারীর মৃত্যু হয়। সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে দৈনিক গড়ে পাঁচ শত লোকের মৃত্যু হয়েছিল। (দ্র. P.K. Hitti, History of the Arabs, p. 681; ঐতিহাসিক অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৪ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৩৯।)

৪৯ আখ্‌তার-উল্‌-আলম, ইবনে খালদুন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯ খ্রি.), ২য় সং, পৃ. ৬।

50 E.I.J. Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline, Cambridge, U.K. 1958, p. 260.

শৈশবেই তিনি কুরআন হিফজ করেন।[৫১] অতঃপর তিনি মুহম্মদ ইবনে সাদ ইবনে বোর্রাল-এর তত্ত্বাবধানে কুরআন-সুন্নাহ ও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানার্জনে ব্রতী হন। তিনি আরবি ভাষার শিক্ষক হিসাবে তাঁর পিতা ও বহু শিক্ষকের সহায়তা লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ ইবনে আল আরবি আল হাসায়রী, মুহম্মদ ইবনে আশ্‌শাওয়াশ আজ্জারজালী, আহমদ ইবনে আল আস্‌সার এবং মুহম্মদ ইবনে বাহর প্রমুখ জ্ঞানীদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত শিক্ষক ইবনে খালদুনকে আরবি কাব্যেও পাঠদান করেছিলেন। সম্ভবত তাঁর আগ্রহাতিশয্যেই ইবনে খালদুন কাব্য রচনা ও কাব্য সমালোচনায় দক্ষতা অর্জন করেন। এছাড়া যেসব আলেম আন্দালুসিয়া থেকে হিজরত করে এসেছিলেন তাঁদেরও সংশ্রব লাভ করেন। তিউনিসের আলেমগণের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করার পর তিনি ভাষা, ব্যাকরণ, ফিক্‌হ, হাদিস, কাব্য ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন।

আবুল হাসান মারীনী যখন ৭৪৮/১৩৪৭ সালে তিউনিস দখল করেন, তখন ইবনে খালদুন ঐ শাসনকর্তার দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতগণের নিকট শিক্ষালাভের সুযোগ অর্জন করেন। তাঁদের শিষ্যত্বে তিনি তর্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, ফিকহ এবং আরবী ভাষায়তত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান লাভ করেন।[৫২]

ইবনে খালদুনের সমসাময়িককালে হাদিসশাস্ত্র ও ফেকাহশাস্ত্র অত্যন্ত পরিণত বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। এতদুভয় বিষয়ের বিস্তার ও ব্যাপ্তি বিচিত্র শাখা-প্রশাখায় আচ্ছন্ন হয়ে জটিল আকার ধারণ করেছিল। হাদিসশাস্ত্রে ইবনে খালদুনের শিক্ষক ছিলেন শামসউদ্দিন মুহম্মদ ইবনে জাবির ইবনে সুলতান আলওয়াদিওয়ালী। ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর উস্তাদ ছিলেন মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আজ্জাইযানী, মুহম্মদ আল কাশীর ও বিখ্যাত মুহম্মদ ইবনে আবদুস সালাম আলহাওয়ারী (১২৭৮-১৩৪৮ খ্রি:)। দুর্ভাগ্যক্রমে ইবনে খালদুনের শিক্ষালাভের এ ধারাবাহিকতা খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি।

সতেরো/আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর জ্ঞানার্জন এভাবেই চলতে থাকে। ১৩৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দে মিসর থেকে মৌরিতানিয়া পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকায় ভয়াবহ প্লেগ রোগ দেখা দেয়। এ সর্বগ্রাসী প্লেগ মহামারিতে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে বর্ণনা

51 Mushin Mahdi, Ibn Khaldun's Philosophy of History: A Study in the Philosophic Foundation of the Science of Culture (London: George Allen and Unwin, 1957): 23.

52 ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খ্রি.), ২য় সং, খ. ১, পৃ. ১২৩; Fromherz, Allen J. *Ibn Khaldun, Life and Times* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010), o. 45-47.

করেন: "কার্পেটের মধ্যে যা ছিল সবশুদ্ধ কাপের্টকে জড়িয়ে নিয়েছে এ মহামারি। যাঁরা ছিলেন খ্যাতিমান, যাঁরা ছিলেন সর্দার এবং যাঁরা ছিলেন আলেম-উলামা তাঁরা সকলেই ইন্তেকাল করেছেন। ইন্তিকাল করেছেন আমার আব্বা এবং আম্মাজানও। আল্লাহ সকলের উপর রহম করুন।"[৫৩] ইবনে খালদুনের এ রচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে , পিতা-মাতা ও উস্তাদগণের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর শিক্ষার ধারাবাহিকতা কিছুটা ব্যাহত হয়। এরপর বাধ্য হয়েই তাঁকে জীবন সংগ্রামে পথে অগ্রসর হতে হয়। এ সময় তাঁর জীবন পরিবেশ কিছুটা বেদনাহত হলেও ইবনে খালদুন তা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করেছেন। এ পরিবেশেও তাঁর উদগ্র জ্ঞানপিপাসা জীবনরস সংগ্রহ করে নিয়েছে।

১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে মারিনী সম্রাট আবুল হাসানের তিউনিস বিজয়ের সময় অনেক স্বনামধন্য পণ্ডিত ব্যক্তিই তাঁর সাথে তিউনিসে এসে প্রবেশ করেছিলেন। বিজয়ের পরবর্তী পর্যায়ে ইবনে খালদুন তাঁদের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেন এবং সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের অনেকের পাণ্ডিত্যই তাঁকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এর থেকে মনে হয় তাদের মধ্যে পাণ্ডিত্যর একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল কিন্তু এখানে-সেখানে তাদের সামান্য উল্লেখ ছাড়া তাদের যোগ্য কোনো রচনার সন্ধান পরবর্তীকালে পাওয়া যায়নি।

ইবনে খালদুন যাঁদের কাছে একান্ত সক্রিয় আগ্রহে শিক্ষালাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ ইবনে সুলায়মান আসসাতী, আব্দুল মোহাইমিন ইবনে মুহম্মদ আল-হাযরামী এবং বিশেষভাবে মুহম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল-আবিলীর (১২৮৩-১৩৫৬ খ্রি.) নাম উল্লেখযোগ্য। এ শেষোক্ত শিক্ষককে ইবনে খালদুন তাঁর প্রধান শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর এ সুযোগ্য শিক্ষকের পাণ্ডিত্যে এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, মনে হয়, তাঁর মাতৃভূমি তিউনিস ত্যাগের পশ্চাতে এ শিক্ষকের প্রভাব বিদ্যমান। বস্তুত এ ক্ষেত্রে তিনি এ মান্যবর শিক্ষকের পদাংক অনুসরণ করেছেন। তাঁর তিউনিস ত্যাগ তাঁর প্রিয় শিষ্যের মনেও জন্মভূমি ত্যাগের বাসনা জাগিয়ে তুলেছে।

উপরোক্ত জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তিরা ছাড়াও সম্রাট আবুল হাসানের সঙ্গে আরো অনেক জ্ঞানীগুণী তিউনিসে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইবনে রেদোয়ান আল মালাকী ছিলেন ইবনে খালদুনের প্রায় সমবয়সী। অন্যান্যের মধ্যে মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে সাব্বাগ এবং মুহম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মারজুক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। এ

[৫৩] আখ্তার-উল্-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

শেষোক্ত জনের সঙ্গে ইবনে খালদুনের খুব একটা সৎভাব ছিল না। অবশ্য এঁদের কাউকেই তিনি শিক্ষক বলে উল্লেখ করেননি।

সাময়িকভাবে এমনি ধরনের জ্ঞানীগুণী শিক্ষকদের সান্নিধ্য লাভ করে ইবনে খালদুনের জ্ঞানার্জনের পিপাসার নিবৃত্তি হয়নি। তিনি আরো অনেকের কাছ থেকে আরো অনেক কিছু জেনে নেবার জন্য ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠেন। হয়তবা তিনি খালদুন পরিবারের এক সুযোগ্য সন্তান হিসাবে তিউনিসের সম্রাটদের সভাসদরূপে তাঁর জীবন কাটিয়ে দিতেন। আর তা হলে তাঁর পক্ষে বাইরের পৃথিবীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ ও আল-মুকাদ্দিমার ন্যায় মহৎগ্রন্থ রচনা কোনো কালেই সম্ভব হয়ে উঠত না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের কর্ম জীবন

ফেজ রাজসভায়

সম্রাট আবুল হাসান তিউনিসের অধিকার ত্যাগ করার পর দুর্বল হাফসী সম্রাটরা ইবনে তাফরাজীন নামীয় এক সামন্তের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছিল। ৭৫১হি./১৩৫০খ্রি. সনের শেষভাগে ফেজ-এর দরবারে প্রভাবশালী প্রাসাদ অধ্যক্ষ ইব্‌ন তাফরাজীন ২০ বৎসরের তরুণ ইবনে খালদুন পারিবারিক প্রথা অনুসারে এ সামন্তের দরবারেই 'সাহিবে আলামা' (শাসকের সরকারি স্বাক্ষর) পদে যোগদান করেন।[৫৪] সম্রাট আবু ইসহাকের পক্ষে তাফরাজীন তাঁকে এ পদে নিয়োগ দান করেন। বস্তুত এ পদটির তেমন কোনো কার্যকর গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু এর সহায়তায় তিনি প্রায় প্রতিটি রাজকীয় গোপনীয়তায় অংশগ্রহণ করতে পারতেন এবং প্রয়োজনে পরামর্শ দেবার সুযোগও পেতেন। এ পদটির একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল এবং এর মাধ্যমে ইবনে খালদুন ইচ্ছা করলে বৃহত্তর রাজনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি করতে পারতেন।[৫৫]

ইবনে খালদুন এ পদে দীর্ঘকার থাকার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কনস্টাইন (Constantine)-এর আমীর আবু সাঈদ (৭৫৩হি./১৩৫২খ্রি.) ইফ্‌রীকিয়্যা আক্রমণ করলে তাঁর ঐ পদত্যাগের এক মোক্ষম সময় উপস্থিত হয়।

তিউনিসের হেফসী সম্রাটদের এক প্রতিদ্বন্দ্বী কুস্তানতুনিয়ার জনগণের প্রয়োচনায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এ বিদ্রোহ দমনে তিউনিস থেকে যে সৈন্যদল প্রেরিত হয়, তার সাথে ইবনে খালদুনও ছিলেন। পরাজয়ের ফাঁকে তিনি তাঁর মনিবের সাথে ফেজ ছেড়ে এব্‌বায় (Ebba) গিয়ে সামরিক আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৫৬] কিছুদিন তিনি আলমোরারিতী শায়খদের সান্নিধ্যে কাটান। সেখান থেকে সিওটা ও কাফসা হয়ে বিস্করায় উপস্থিত হন। এ সময়েই বিভিন্ন আরব বেদুইন গোত্রের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। সেখানে তিনি মুয্‌নী গোত্রের সাহচর্যে শীতকাল অতিবাহিত করেন।কিন্তু এ ধরনের উদ্দেশ্যহীন ভ্রমন তাঁর মনকে ক্রমশ অস্থির করে তুলে। এখান থেকে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ভাগের শুরু, যা এক দিকে যেমন পণ্ডিতসূলভ

---

[৫৪] ইসলামী বিশ্বকোষ,, খ.৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮; মুহম্মদ আয়েশ উদ্দিন, রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি (ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ, ২৭৮।

[৫৫] ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী, ৪র্থ সংস্করণ, (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০১৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০।

[৫৬] ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত; ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

অন্যদিকে তেমনি দুঃসাহিকতাপূর্ণ। জীবনের গতিপথের নানা পট পরিবর্তনের মাঝে ইবনে খালদুনের এই অধ্যায়ের শুরু। পরবর্তীকালেও অনুরূপ পরিবর্তনের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

ইতোমধ্যে মারীনীয় শাসক আবুল হাসান এক অভিযানের পর ৭৫২হি./১৩৫১ খ্রি. নিহত হন। মাগরিবের পশ্চিমাঞ্চল তাঁর পুত্র আবু 'ইনানের নিয়ন্ত্রণে থেকে যায়। ইনান ফেযের সিংসাহনে অধিষ্ঠিত হন। ইবনে খালদুন স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য ফেযের মারিনী সম্রাট আবু ইনানের দরবারে উপস্থিত হন। তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ তেমন ফলপ্রসূ হয়নি; যার ফলে ইবনে খালদুন সামন্ত ইবনে আবু আমরের সাথে বগিতে চলে যেতে বাধ্য হন। ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত তিনি বগিতে কাটান। এ সময়েই সামন্ত ইবনে আবু আমরের মাধ্যমে ইবনে খালদুন সম্রাট আবু ইনানের আমন্ত্রণলিপি লাভ করেন। এতে তাঁকে মারিনী সম্রাটের দরবারি জ্ঞানীগুণীদের একজন হয়ে যোগদান করতে বলা হয়। ইবনে খালদুন এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং যথাসময়ে ফেযের রাজকীয় দরবারে উপস্থিত হন। রাজকীয় দরবারের অন্যতম জ্ঞানী হিসাবে ফেজে ইবনে খালদুন অনেক জ্ঞানীগুণীর সাক্ষাৎ লাভ করেন।[৫৭]

ফেযের দরবারে ইবনে খালদুন সুলতানের সচিব মণ্ডলীর (কিতাবাতুহ) অন্তর্ভুক্ত হন। অবশ্য এপদ সম্পর্কে তিনি আদৌ উৎসাহিত ছিলেন না। কেননা এই ধরনের পদ তাঁর ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। সেজন্য ইবনে খালদুন কিছুটা হতাশ হয়ে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। তিনি নিজেই বলেন, 'আমি চিন্তানুশীলন, অধ্যয়ন ও মহান শিক্ষকদের পদপ্রান্তে বসে তাঁদের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণে নিজেকে নিয়োজিত করলাম (এ মহান শিক্ষকগণ ঐ সময় মাগরিব ও স্পেন থেকে এসে ফেযে অস্থায়ীভাবে বসবাস করছিল) এবং তা হতে প্রভূত উপকৃত হলাম।"[৫৮] মোটকথা রাজনীতিতে আগ্রহ অপেক্ষা জ্ঞানানুসন্ধানেই তিনি অধিকতর আগ্রহী ছিলেন।

---

[৫৭] তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ আল-মাক্কারীর[৫৭] সান্নিধ্যে আসেন। এছাড়া তিনি বিশিষ্ট পণ্ডিত মুহম্মদ ইবনে আহমদ আলবী, কাজী মুহম্মদ ইবনে আবদুল রাজ্জাক এবং মুহম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া আল বারজীর সান্নিধ্য লাভ করেন। ফেজে অবস্থানকালে ইবনে খালদুন আরো যে সকল জ্ঞানীর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে চিকিৎসা ও জৌতিষশাস্ত্র বিশারত ইব্রাহিম ইবনে জারজারও ছিলেন। ১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় এ বিশিষ্ট পণ্ডিতের সঙ্গে শেভিলার পেড্রো দি ক্রয়েলের দরবারে ইবনে খালদুনের দেখা হয়। ফেজে তিনি মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে শরীফ মুহম্মদ ইবনে আহমদ আসসবতীকে (১২৯৪-১৩৫৯ খ্রি.) দেখতে পান এবং ১৩৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো তাঁর বিশিষ্ট শিক্ষক আবুল বরকাত মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ আল বালফিফীর সান্নিধ্যে আসেন। এ বিশিষ্ট জ্ঞানীর কথা ইবনে খালদুন তাঁর আল মুকাদ্দিমায় বারংবার শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছেন। এ প্রথম সাক্ষাতে ও পরবর্তীকালে ১৩৬১ খ্রিস্টাব্দে ইবনে খালদুন তাঁর নিকট ইমাম মালেকের 'মুয়াত্তা' গ্রন্থের পাঠ গ্রহণ করেন এবং তাঁর মিসরীয় শিষ্য ইবনে হজর আস্কালানীর বর্ণনা অনুসারে ইবনে খালদুন তাঁর এ বিশিষ্ট শিক্ষককে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

[৫৮] ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮।

উল্লেখ্য, মারিনী সম্রাট আবু ইনান বগির হাফসী বংশীয় সামন্ত আমীর আবু আবদুল্লাহকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্যপাট অধিকার করে নিয়েছিলেন। আমীর আবু আব্দুল্লাহ নজরবন্দি হিসাবে ফেজেই অবস্থান করছিলেন। ইবনে খালদুনের সাম্প্রতিক বিরক্তি তাঁকে উক্ত আবু আব্দুল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে উৎসাহিত করে। পূর্বপরিচয়ের সূত্র ধরে তাঁদের এ বন্ধুত্ব ক্রমশ গাঢ় ও স্থায়ী হয়ে উঠে। এর ফলে সম্রাট আবু ইনান ইবনে খালদুনের আনুগত্যে সন্দিহান হয়ে পড়েন। আর এরই ফল হিসাবে ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইবনে খালদুন কারারুদ্ধ হন।[৫৯] আবু ইনানের মৃত্যু অবধি তিনি দীর্ঘ দুই বৎসর ৭৫৮-৭৫৮৯হি./১৩৫৭-১৩৫৮ খ্রি.) কারাদণ্ড ভোগ করেন।[৬০] সম্রাট আবু ইনানের মৃত্যুর পর ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুক্ত পান।

সম্রাট আবু ইনানের মৃত্যুর পর মারিনী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এরপর সিংহাসনের দাবিদারদের মধ্যে সংঘাতজনিত গোলযোগ শুরু হয়, বিশ্বাসঘাতকতা ও রক্তপাত চলতে থাকে। অপরিবেশ এমন বিশৃঙ্খল হয়ে উঠে যে, গোত্রশক্তির অধিকার যে কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মারিনী পরিবারের যে কোনো একজন সদস্যকে সম্মুখে রেখে রাজ্য বিস্তার ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার খেলায় মেতে উঠেন। স্বয়ং ইবনে খালদুনও অবস্থার চাপে পড়ে এবং তাঁর কারাবাসের সেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আগ্রহে এতে যোগ দিতে বাধ্য হন এবং আবু সালিমের পক্ষ অবলম্বন করেন। অচিরেই ইবনে খালদুন ৭৮০হি./১৩৫৯খ্রি. সনে নুতন সুলতান আবু সালিমমের মন্ত্রী পরিষদের সচিব পদে নিযুক্ত হন। আবু সলিমের শাসনকালের শেষ পর্যায়ে ইবনে খালদুন 'মাজালিম' বিভাগের দায়িত্বে সমাসীন ছিলেন। এ বিভাগটি মূলত সেসব অন্যায় অবিচারের প্রতিকার করত, যা সরাসরি ধর্মীয় বিধানের আওতায় পড়ে না। তবু এটিই ইবনে খালদুনের প্রথম আইন-আদালত সম্পর্কীয় পদমর্যাদা।এ সময় ইবনে খালদুন রাজকীয় পদমর্যাদার প্রভাব ছাড়াও গদ্য ও পদ্য রচনার ক্ষেত্রে সুখ্যাতি অর্জন করেন ।

---

[৫৯] ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী, ৪র্থ সংস্করণ, (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ.২০।

[৬০] ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮।

সম্রাট আবু সলিমের অন্য এক মন্ত্রী ইবনে মারজুক ইবনে খালদুনের প্রভাব প্রতিপত্তিতে বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেন। অন্যদিকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তখন অন্য এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং এরই ফল হিসাবে সামরিক ও বেসামরিক লোকদের এক সফল অভ্যুত্থানে আবু সলিম ১৩৬১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে নিহত হন।

আবু সলিমের মৃত্যুর পর আবার গোলযোগ দেখা দেয়। ইবনে খালদুন এর আবর্তে পরে ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। বিজয়ীদের পক্ষে থাকার চেষ্টা সত্ত্বেও দিন দিন তিনি আশঙ্কাকাতর হয়ে পড়ছিলেন। অবশেষে তিনি ফেজ ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পরিবেশে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ফেযের তৎকালীন শাসকরা ইবনে খালদুনকে ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। শেষ পর্যন্ত তাঁর এ প্রকার আগ্রহের জয় হল এবং ফেযের শাসকদের সাথে তিনি চুক্তিবদ্ধ হতে রাজি হলেন। চুক্তির বিষয় ছিল, তিনি ফেজ ত্যাগ করে সোজা স্পেনে চলে যাবেন; উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার অন্য কোথাও বসবাস করতে চেষ্টা করবেন না।[৬১] এ চুক্তি অনুসারে ইবনে খালদুন সিওটা হয়ে ৭৬৪হি./১৩৬২ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের তৎকালীন একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র গ্রানাডায় গমন করেন।[৬২]

গ্রানাডার দরবারে

তখনও মুসলিম স্পেন শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার দিক দিয়ে উত্তর আফ্রিকার তুলনায় বেশ উন্নত ছিল। সেই গ্রানাডার রাজা পঞ্চম মোহাম্মদ (১৩৫৪-১৩৫৯ এবং ১৩৬২-১৩৯১) ও প্রধানমন্ত্রী ইবনে খতিব[৬৩] ইবনে খালদুন কে সাদরে অর্ভ্যনা জানান এবং তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা জানান। কিছুদিন পর সম্রাট পঞ্চম মুহম্মদ ইবনেুল আহমার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে এবং তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রী ইবনে খতিবসহ ৭৬১ হি./১৩৫৯ খ্রি. সনে ফেযে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এ সময় ইবনেুল খাতীব ও তরুণ ইবনে খালদুনের মধ্যে এক

---

৬১ Aziz Al-Azmeh, *Ibn Khaldun: An Essay in Reinterpretation* (London: Frank Cass & Company Ltd., 1982), p. 2-3.

৬২ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮।

৬৩ **ইবনে আল-খতীব:** লিসান আল-দীন ইবনে আল-খতিব সিরিয়া থেকে আগত একটি আরব পরিবারের সদস্য ছিলেন। তিনি ইবনেু খালদুনের সহকর্মী ও বন্ধু ছিলেন। তিনি ১৩১৩ খ্রি. সনে জন্মগ্রহন করেন এবং ১৩৭৪ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। গ্রানাডার বানু নাসির বংমের সপ্তম সুলতাম ইউসুফ আবু-আল-হাজ্জাজ (১৩৩৩-৫৪ খ্রি.) এবং তার পুত্র মুহাম্মদ (১৩৫৪-১৩৬২ খ্রি.) রাজত্বকালে ইবনেুল খতিব মর্যাদাপূর্ণ 'জু-আল-ওয়াজাতারাতাইন' বা দুই উজিরের পদ অলংকৃত করেন। 'জু-আল-ওয়াজাতারাতাইন' হচ্ছে, একই সঙ্গে সেনাধ্যক্ষ এবং রাজকর্মচারী এবং বুদ্ধিজীবী। তিনি সর্বমোট ষাটট গ্রন্থ রচনা করেন এবং এগুলো বেশীরভাগই ইতিহাস, ভুগোল, চিকিৎসা, দশ্ন এবং সুকুমার সাহিত্য সংক্রান্ত। এসব গ্রন্থের মাঝে গ্রানাডার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থটি সুপরিচিত। এটি 'আল-ইহাতা-ফি আখবার গ্রারানাতা' নামে দুইখণ্ডে রচিত হয়। (দ্র. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, স্পেনে মুসলিম সভ্যতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২)

নিখাদ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ৭৬৩ হি./১৩৬২ খ্রি. সনে মুহাম্মাদের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করলে ইবনেুল খাতীব তাঁর পূর্বপদে অধিষ্ঠিত হন। ইব্ন খালদুন ভাগ্যের পট পরিবর্তনে ভূমধ্যসাগরের ওপারে পলায়ন করতে বাধ্য হলেন। ফেজ-এ খতিবের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে গ্রানাডায় ইবনে খালদুন সর্বোচ্চ সম্মানে গৃহীত হন এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী ইবনে খতিবের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব নতুন সজীবতায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

গ্রানাডার সিংহাসন পুনরুদ্ধারের সময় সম্রাট পঞ্চম মুহম্মদ কাস্টিলার খ্রিস্টান সম্রাট ‘পেড্রো দি ক্রুয়েলের’ (Pedro the Cruel) নিকট থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি চুক্তি হবার কথা ছিল। সম্রাট মহম্মদ ইবনে খালদুনকে এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য ৭৬৫ হি./১৩৬৪ খ্রি. সনে ইবনে খালদুন উপরোক্ত দায়িত্ব নিয়ে সেভিলে যান। সম্রাট পেড্রো তাঁকে সসম্মানে বরণ করেন। উক্ত চুক্তি সম্পাদনে ইবনে খালদুন অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এমনকি সম্রাট পেড্রো দি ক্রয়েল পর্যন্ত তাঁর পাণ্ডিত্য ও কটুনৈতিক আরণে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।[৬৪] খ্রিস্টান বিশ্বের সঙ্গে তাঁর এই যোগাযোগ তাঁর মনে যথেষ্ট রেখাপাত করে। ঐ সময়টি ছিল তৎকালীন খ্রিস্টান বিশ্বের এক ক্রান্তিকাল। এ মিশন থেকে ফেরার পর আমীর তাঁকে প্রচুর সমাদর করেন। তবে এ সময় তাঁর বন্ধু ইবনেুল খতীব তাঁর সাফল্যে কিছুটা ঈর্ষান্বিত ও অসন্তুষ্ট হন। এ কারণে ইবনে খালদুন তাঁর অনুকূল অবস্থার পুরো সুযোগ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

গ্রানাডার সু-সংস্কৃত পরিবেশে ইবনে খালদুন অনেকটা নিরাপত্তা অনুভব করেছিলেন। এজন্যই কুস্তানতুনিয়া থেকে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনকে এখানে আনিয়ে নেন এবং একটি গ্রামের জায়গির লাভ করে শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। এখানে তাঁর প্রকাশ্য কোনো শত্রু ছিল না।

---

৬৪ তিনি ইবনে খালদুনকে শেভিলার রাজদরবারের যোগ্য পদে থেকে যাবার আবেদন জানান এবং খালদুন পরিবারের যাবতীয় সম্পত্তি তাঁর নিকট প্রত্যর্পণের আশ্বাস দেন। ইবনে খালদুন সম্রাটের এহেন সমাদরে অভিভূত হয়েছিলেন। আর তা হবারই কথা। কারণ এ শেভিলাই তাঁর পিতৃপুরুষদের দীর্ঘকালীন লীলাভূমি। তবু গ্রানাডার সম্রাটের বদান্যতা স্মরণ করে ইবনে খালদুনের পক্ষে সম্রাট পেড্রোর এ সাদর আমন্ত্রণে সাড়া দেয়া সম্ভব হয়নি। (দ্র. ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, অনুঃ গোলাম সামদানী কোরায়শী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।)

বগি রাজ দরবারে

গ্রানাডায় ইবনে খালদুনের এ ক্রমবর্ধমান মানসিক অস্বস্তির সময় তিনি তাঁর পুরাতন বন্ধু হাফসী পরিবারের আবু আবদুল্লাহর নিকট থেকে একটি সাদর আমন্ত্রণ লাভ করেন। আবু আবদুল্লাহ ১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় বগির শাসনক্ষমতা অধিকার করেছিলেন।[৬৫] তাঁর বন্ধুত্বের জন্যই ইবনে খালদুন ফেযে দীর্ঘদিন কারাবাস করেছিলেন, তাঁর বন্ধুত্বের জন্যই ইবনে খালদুন ফেযে দীর্ঘদিন কারাবাস করেছিলেন। তিনি ইবনে খালদুনকে বগিতে এনে তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। ইবনে খালদুন একান্ত আগ্রহের সাথে এ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন। ১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্রানাডা ত্যাগ করে বগিতে চলে আসেন।

ইবনে খালদুন বগির শাসক আবু আবদুল্লাহর 'হাজেব' তথা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যস্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। ইবনে খালদুন একই সাথে ফিকহশাস্ত্রের শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারক হিসেবে যুক্ত হন। ইবনে খালদুনের এই সাফল্য বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। এক বৎসর পর ১৩৬৬ খ্রি. সনে কনস্টানটাইন-এর আমীর আবুল আব্বাস স্বীয় জ্ঞাতিভ্রাতা আব্দুল্লাহ মুহাম্মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যুদ্ধে আব্দুল্লাহকে পরাজিত ও হত্যা করেন। ইবনে খালদুনের নিকট তাদের অবস্থার পরিবর্তন কিংবা নিজের আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনের কোনো পথই খোলা ছিল না বিধায় শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে রক্ষা করার জন্যই আবুল আব্বাসের পক্ষে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ইবনে খালদুন এ সময় ঘটনা প্রবাহের গতি বুঝতে পেরে সময়মত পদত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি দাওয়াবিন্দা 'আরব গোত্রের নিকট পরে বিসকারা-এর বানু মুযনী বেদুঈন গোত্রের বন্ধুদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৬৬] এ সময়কার অবস্থা সম্পর্কে ইবনে খালদুন নিজেই বর্ণনা করেন: "বস্তুতপক্ষে আমি ইতোমধ্যে পদের মোহ হতে মুক্ত হয়েছিলাম। সর্বোপরি, আমি অনেক দিন ধরে জ্ঞান

---

৬৫ এ আবু 'আবদিল্লাহর সঙ্গে ইবনে খালদুন ফেয-এ এক চক্রান্তে যোগ দিয়েছিলেন। আবু 'আবদিল্লাহ তাঁকে হাজিব পদ (প্রাসাদ অধ্যক্ষ) দানের প্রস্তাব করেন। তৎকালে হাজিব পদটি ছিল রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ।

৬৬ বেদুইনদের মধ্যে ইবনে খালদুনের পরিচিতি ও প্রভাব ছিল অসামান্য। বাবার বা আরব যে কোনো বেদুইন গোত্রে তিনি অবলীলাক্রমে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে তাদের মতামত পরিবর্তন সাধন করতে পারতেন। বস্তুত তাঁর এ প্রকার পরিচয় ও প্রভাব আমাদেরকে তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অমায়িকতা ও সারল্যের সে বৈশিষ্ট্য না থাকলে বেদুইনদের মধ্যে এ ধরনের প্রভাব বিস্তার তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। আসলে এ প্রভাবের সূত্রপাত হয় ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর তিউনিস ত্যাগের সময়। তখন তিনি বিস্করা, সিওটা ও বগির বিভিন্ন বেদুইন গোত্রে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। এ কারণেই বর্তমানেও মূলত আশ্রয় লাভের জন্য তিনি তাদের মধ্যে ফিরে আসেন।

চর্চায় অবহেলা করে আসছিলাম। তাই আমি শাসক রাজাদের সকল বিষয় হতে নিজেকে সরিয়ে আমার সকল শক্তি ও উদ্দীপনা অধ্যন ও শিক্ষাদানে নিয়োজিত করেছিলাম।"[৬৭] এভাবে তিনি বিসকারায় একজন জ্ঞানী হিসেবে জীবন-যাপনের চেষ্টা করেন।

এসময়ে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রাজনৈতিক অবস্থা একটা সরল প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে তিউনিস, তিলমিসান, বগি ও কুস্তানতুনিয়ার ক্ষমতাধারীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছিলেন। বিশেষ করে ইবনে খালদুনের অবস্থান সংশ্লিষ্ট এলাকায় আবুল আব্বাস ও আবু হাম্মুর প্রতিযোগিতা দিন দিন লক্ষগোচর হয়ে উঠছিল। কিন্তু এ সকল শক্তির কোনটিরই এমন কোন প্রাধান্য ছিল না যে, অন্যগুলোকে অবলীলায় কুক্ষিগত করে নিতে পারে। একমাত্র শক্তির এ ভারসাম্য বিনষ্ট হতে পারত বেদুইন গোত্রগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে; বস্তুত তাদের যে কোনো একপক্ষে যোগদান অন্যপক্ষের পরাজয়কে সুনিশ্চিত করে তুলত। আর বলাবাহুল্য যে, ভাগ্য নির্ধারণকারী বেদুইনদের এ শক্তি ও সহায়তার উপর ইবনে খালদুনের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

এমতাবস্থায় ইবনে খালদুন তিউনিসের হাফসী শাসক ও তিলিমসান (Tlemcen)-এর 'আবদুল ওয়াদিদ আবু হাম্মুর নিকট থেকে একটি আমন্ত্রণলিপি লাভ করেন। কিন্তু এ আবেদনে সাড়া দিতে ইবনে খালদুন ইতস্তত করছিলেন। কারণ ইবনে খালদুন যথার্থই বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজনীতির উচ্চমঞ্চে একবার সমাসীন হলে, তার থেকে নেমে নিরাপদ আশ্রয়ে বেরিয়ে আসা খুবই কষ্টকর; বরং অনেকাংশে অসম্ভব। এ কারণেই খুব সামান্য কিছু সময় ছাড়া তিনি রাজকীয় পদমর্যদার এ আবর্ত থেকে নিজেকে কখনোই সরিয়ে আনতে সক্ষম হননি।

এ সময়ে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রাজনীতিতে এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। উদ্যোগী ও বীর্যবান মারিনী যুবক আবদুল আজিজের নেতৃত্বে পুনরায় এ সাম্রাজ্যের জাগরণ দেখা দেয়। তিনি ফেযের নতুন শাসকরূপে ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে তিলমিসান আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এর ফলে আবু হাম্মুর অবস্থা সাময়িকভাবে শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত ইবনে খালদুন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বেদুইনকে সঙ্গে নিয়ে আবু হাম্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আবদুল আজিজের ক্রমবর্ধমান শক্তির বিস্তার রোধ করা আবু হাম্মুর পক্ষে সম্ভব হবে না এবং পরিণামে তা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ইবনে খালদুনের অবস্থানকে

[৬৭] ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৯।

অসম্ভব করে তুলবে। ইবনে খালদুন পুনরায় স্পেনে আশ্রয় গ্রহণ করার উদ্যোগ নিলেন। এ সময়ে সম্রাট আবদুল আজিজের একদল সৈন্যের হাতে ধরা পড়ে ইবনে খালদুন সম্রাট আবদুল আজিজের দরবারে উপস্থিত হতে বাধ্য হলেন। পরে সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি তিলমিসানের নিকটবর্তী 'আল-উব্বাদ'-এ গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে বিখ্যাত সাধক শায়ক আবু মাদায়েনের মাজার বিদ্যমান। ইবনে খালদুন সেখানে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় কাটিয়ে দিতে মনস্থ করলেন।[৬৮]

ইবনু সালামা দুর্গ ও জ্ঞান সাধনা

অনেক চড়াই-উৎরাই শেষে খালদুন যুগানা গোত্রের এক শক্তিমান শাখা বনি আরিফের আশ্রয়ে গিয়ে উপস্থিত হন। ইতিপূর্বে এ বনি আরিফেরই গোত্রপ্রধান মুহম্মদ ইবনে আরিফ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন; এবারও তিনি সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁর মধ্যস্থতার ফলেই আবু-হাম্মুর সম্ভাব্য বিরূপতা স্তিমিত হয়ে আসে এবং খালদুন সপরিবারে বনি আরিফের আশ্রয়ে বসবাস করার সুযোগ পান। পরবর্তী চার বৎসর (৭৭৬-৮০ হি./১৩৭৫-৭৯ খ্রি.) ইবনে খালদুন ওরান প্রদেশের অন্তর্গত অধুনা ফেরেন্দা (Frenda) হতে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ইবনে সালামার দুর্গ প্রাসাদে কাটান।

ইননে খালদুনের প্রতি বনি আরিফের এ সহায়তা ও আশ্রয়দান ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার নগর পরিবেশ ও রাজদরবারগুলো যা পারেনি। বনি আরিফ তা সম্ভব করে তুলেছিল। বস্তুত তাদের এ প্রকার নিরাপদ আশ্রয় না পেলে খালদুনের পক্ষে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি আল-মুকাদ্দিমা রচনা করা হয়ত সম্ভব হয়ে উঠত না। বনু আরিফের রইস মুহম্মদ ইবনে আরিফের সাথে ইবনে খালদুনের বন্ধুত্ব ছিল। ইবনে খালদুনের পাণ্ডিত্য ও এর ফলশ্রুতি সম্পর্কে তাঁর এ বেদুইন বন্ধুকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, তখন সর্বপ্রকারের সুযোগ তাঁর জন্য অবারিত হয়ে উঠল। মুহাম্মদ বিন আরিফ খালদুনের জন্য সুলতানের দরবারে সুপারিশ করেন। ৭৭৬ হি./১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দে এক উৎসবের দিন ইবনে খালদুন সুলতানের দরবারে হাজির হলেন। এক সময়ে মারিনী সম্রাট আবু ইনান বনি আরিফের সহায়তায় মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে গ্রামসহ একটি দুর্গ দান করেছিলেন। ইবনে খালদুন সপরিবারে সেই দুর্গ 'কেলাতু ইবনে সালামা'য় বসবাস করার সুযোগ লাভ করলেন। বস্তুত এমন শান্তিপূর্ণ নিরাপদ পরিবেশ ইবনে খালদুন ইতিপূর্বে আর কোথাও পাননি।

---

[৬৮] কাসদুল কারার ওয়াল-ইনকিবাদ ওয়াল-'উকূফ 'আলা কিরাআতিল ইলম, বিশ্বকোষ, পৃ. ৬২০।

এখানে ইবনে খালদুন নির্জনতা, শান্তি ও অবসরের মধ্যে প্রায় চার বছর অতিবাহিত করেন। রাজনৈতিক যোগলযোগ, রাজসভার চক্রান্ত, বিদেশ সফরের দুঃখ-দুর্দশা এবং সামরিক অভিযানাদির অশান্তি থেকে প্রথম তাঁর কিছুটা মুক্তি মিলল। এই প্রথম তাঁর অবসর হল– নিরালায় জ্ঞান সাধনা ও গবেষণার। এ নিরাশা শান্ত অবসরে ইবনে খালদুন ইতিহাস রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এ সময় তাঁর বয়স পয়তাল্লিশের কোঠায়।

প্রথমবারের মতো খালদুন কাঙ্ক্ষিত 'নির্জন বাস' আবদ্ধ হয়ে পড়েন। ইবনে সালামার নির্জন নিরুপদ্রব পরিবেশে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি পৃথিবীর ইতিহাস–'কিতাবুল ইবার' লিখতে বসলেন। সে সময়কার অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন: "এক সর্বগ্রাসী মহৎ অনুপ্রেরণায় বুঁদ হয়ে আমি আমার পরিকল্পিত ইতিহাসের ভূমিকা শেষ করেছি এবং এটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অদ্ভুতভাবে সে নিজেই তার শব্দ ও অর্থের যোগান দিয়ে গেছে।" ১৩৭৪-১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চার বছর তিনি এ দুর্গ-শহরে গবেষণায় রত থাকেন। এ সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁর 'নতুন বিজ্ঞান' বা 'সমাজ বিজ্ঞান' এর ধারণা উদ্ভাবন করেন।[৬৯]

৭৯৯ হি./১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে মাত্র পাঁচ মাসের পরিশ্রমে ইবনে খালদুন তাঁর জগদ্বিখ্যাত 'মুকাদ্দিমা' প্রণয়ন করতে সক্ষম হন। অতঃপর পুনরায় তিনি গ্রন্থখানি সংশোধন ও পরিমার্জন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই আশাতীত সাফল্যে ইবনে খালদুন নিজেই বিস্মিত হন। তিনি তাঁর কিতাবুল ইরাবে উল্লেখ করেন[৭০]– এই আশ্চর্য কৃতকার্যতা ও সফলতার পশ্চাতে ছিল সেই অভিজ্ঞতাপ্রসূত সুবিন্যস্ত চিন্তাধারা এবং তাদের প্রকাশনা, যারা প্রথম থেকে আমার মনে মণিকোঠায় বিদ্যমান ছিল ইতিহাসের 'মুকাদ্দিমা'। অর্থাৎ 'ভূমিকা' রচনা শেষ করার পর ইবনে খালদুন মূল ইতিহাস গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং আরব বার্বার ও জানাতা গোত্রের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে এ সকল ইতিহাস তাঁর 'তাওয়ারিখ' গ্রন্থের প্রথম ও শেষ অধ্যায়ে স্থান লাভ করে। বিশ্ব ইতিহাস রচনা করার কোন ইচ্ছা ছিল না। তিনি লিখতে চেয়েছিলেন শুধু আফ্রিকার বার্বার রাজ্যের ইতিহাস। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর মুকাদ্দিমায় লিখেছেন: "আমার এই ইতিহাস পুস্তকে আমি

---

৬৯ এ ভূমিকাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'আল-মুকাদ্দিমা'; ৭৭৯ হিজরি বা ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এটি সমাপ্ত করেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পিত ইতিহাস সমাপ্ত করতে তাঁকে আরো চার বছর পরিশ্রম করতে হয় এবং এ সময়ে তিনি তিউনিসের গ্রন্থাগারগুলোর সাহায্য গ্রহণ করতে সমর্থ হন। (Mohsin Mahdi, Ibn Khaldun's Philosophy of History, University of Chittagong Press (U.S.A. Phoenix edition, 1964), p. 27.

৭০ ইবনে খালদুন, কিতাবুল ইবার (বুলাক) আল-তারিফ ইবনে খালদুন ওয়া রিসালাতুছ সারকান ওয়া গারকাক, খণ্ড-৭, পৃ. ৪৪৪; আখ্‌তার-উল্‌-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

আমার সাধ্যমত শুধু বার্বারদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছি। এ কাজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বার্বারদের রাজ্য ও রাজত্ব, তাদের জাতি সত্ত্বা এবং তাদের বংশাবলির বিবরণ দান করা। অন্যান্য দেশের ইতিহাস আমি এড়িয়ে চলতে চেয়েছি, কেননা সেসব দেশ এবং তথাকার লোকজন সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া সে সব দেশের ইতিহাস প্রয়োজনানুপাতে বিস্তারিতভাবে আলোচিতও নয়।"[৭১]

তবে, বার্বারদের ইতিহাস রচনা করার পর ইবনে খালদুন তাঁর কর্মসূচির রদ্‌বদল করেছিলেন। পরে মানবজাতির ইতিহাস রচনার বাসনাও তাঁর মনে জেগেছিল। সময়টা ছিল ৭৮০ হিজরি। কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় পুস্তকাবলি, গবেষণার মাল-মসলা ও উদ্ধৃতির প্রয়োজনীয় প্রমাণপঞ্জি এই নির্জন ও প্রত্যন্ত এলাকায় মিলছিল না। বাধ্য হয়ে ইবনে খালদুন তিউনিসে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

পুনরায় তিউনিসে

সালামার দুর্গে অবস্থানকালে মুকাদ্দিমার প্রণয়ন অব্যাহত রাখার নিমিত্তে বিপুল পরিমাণ দলিল-প্রমাণের আবশ্যকতা প্রকট হয়ে উঠছিল। কারণ, এখানে শান্তি থাকলেও প্রয়োজনীয় বই পুস্তক ও জ্ঞানীগুণীর সাহচর্যের অভাব ছিল। সেজন্যই ইবনে খালদুন তিউনিসে ফিরে যাবার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। কারণ, তাঁর জানা মতে একমাত্র তথাকার গ্রন্থাগারগুলোই তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারে।

ইবনে খালদুন তিউনিসিয়ায় হাফসী রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্থপতি আবুল আব্বাসের কাছে একজন গবেষকের জ্ঞান সাধনার প্রয়োজন উল্লেখ করে তিউনিসে আসার অনুমতি দেবার জন্য আবেদন জানালেন। সম্রাট আবুল আব্বাস খালদুন পরিবারের ঐতিহ্য ও ইবনে খালদুনের পাণ্ডিত্যের প্রতি মোটামুটি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এজন্যই শেষ পর্যন্ত তাঁকে তিউনিসে ফিরে আসতে অনুমতি প্রদান করেন। ইবনে খালদুন ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে সপরিবারে তিউনিসে নিজ ভূমিতে এসে নুতন জীবন শুরু করেন।

ইতোমধ্যে ইবনে খালদুন তাঁর গবেষণার প্রয়োজনীয় মাল-মসলা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। রচনাবলি পুনর্লিখিত ও সুমার্জিত হল। ৭৮৪ হি./১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে ইবনে খালদুন মুকাদ্দিমা এবং আরব, বার্বা ও জানাতা গোত্রের ইতিহাস সহযোগে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ইবার (তারীখ)-এর প্রথম সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনার কাজ সম্পূর্ণ করে ফেললেন।

---

৭১ ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২০।

আরবদের ইতিহাসে ইবনে খালদুন– প্রাক ইসলামী ও ইসলামোত্তর কালের শাসকবর্গের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পক্ষান্তরে বার্বারদের ইতিহাসে কেবল মাত্র তাঁর সমসাময়িককালের ৭৮৩ হিজরি অর্থাৎ-সুলতান আবুল আব্বাস কর্তৃক তাওজির দখল পর্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণসমূহে ক্রমে ক্রমে প্রাচ্যের মুসলিম রাজত্ব-কাহিনি, প্রাচীন জাতিসমূহ ও খ্রিস্টান জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসও সংযোজিত হয়েছিল।[৭২] ইবনে খালদুন সুলতানের দরবারে গ্রন্থটি দাখিলের দিন সুদীর্ঘ স্তুতিমূলক কবিতাসহ গ্রন্থের প্রথম কপিটি সুলতানকে উপহার দেন। এ দীর্ঘ কবিতায় ইবনে খালদুন তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ ও উপযোগিতা সম্পর্কে উল্লেখ করে গেছেন। সেই সাথে তিনি সুলতানের সহৃদয়তা ও অনুগ্রহের কথাও বর্ণনা করেছেন। কাসিদাটির প্রথম কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ:

"তোমার দরবার ছাড়া মুসাফিরের আশ্রয় কোথায়?
তোমার অনুগ্রহ ছাড়া উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঠাঁই-ই বা কোথায়?

নিজের রচনা সম্বন্ধে তিনি লিখেন:

এই যে এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে কালের এবং মানুষের ইতিহাস;
এখানে রয়েছে সেই শিক্ষা- যা সত্যের অনুগামী।
এখানে রয়েছে ইতিহাসের সমস্ত ঘটনা
এবং রয়েছে সেসব ঘটনাও যা তাদের লেখকেরা এড়িয়ে গেছেন।
আমার সাধ্যমত এর প্রকাশ করেছি সহজ অথচ সুন্দর।
উৎসর্গ করলাম তোমার প্রতি আমার এই দৌলত,
যা চিরদিনই প্রতিভাত হবে গৌরবের বস্তুরূপে।
কসম করছি,– বাড়িয়ে বলছি না এতটুকু-
কারণ, বাড়িয়ে বলাকে আমি ঘৃণা করি।

তিউনিসে ইবনে খালদুন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য শিক্ষার্থীদের ভিড় জমতে থাকে। এভাবে অতি অল্প দিনেই তিনি তিউনিসের শিক্ষা পরিবেশে নিজের বিশিষ্টতা সপ্রমাণ করতে সক্ষম হন। কিন্তু শিক্ষাদানে তাঁর সাফল্য ও শাসকের সমাদরের কারণে ইবনে খালদুনের অনেক শত্রুর সৃষ্টি

---

৭২ আখ্‌তার-উল্‌-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১।

হয়। তাঁর এ প্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ইবনে আরফা বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন এবং নানাভাবে ইবনে খালদুনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় যোগ দেন। বিখ্যাত ইব্ন আরাফার মত ব্যক্তি সে কূট-চক্রান্তের মধ্যমণি হওয়ায় ইবনে খালদুন চরম অশুভ আশঙ্কা করতে থাকেন। তিনি মুসলিম পাশ্চাত্য তথা মাগরিব পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। সেজন্য তিনি সম্রাটের নিকট হজ্জব্রত পালনের জন্য অনুমতি চাইলেন। সুলতান তাঁর অনুমতি মঞ্জুর করেন। আলেকজান্দ্রিয়া যাবার জন্য একটি জাহাজ তখন প্রস্তুত ছিল। ইবনে খালদুন ৭৮৪ হি./১৩৮২ খ্রি. সনে জাহাজে আরোহণ করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মিশরে ইবনে খালদুন ও তাঁর শেষ জীবন

কায়রোতে ইবনে খালদুন

১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে ইবনে খালদুন মামলুক রাজধানী পৌঁছে বিস্মিত হন। এর বিস্তৃত জনবহুল পথঘাট, এর সুদৃশ্য আকাশচুম্বী সৌধমালা, এর পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ বিপণিকেন্দ্র, এর শিক্ষার্থীমুখর বিচিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি নীলনদের বদান্যতায় সৃষ্ট এর মনোরম প্রাকৃতিক শোভা ইবনে খালদুনের মনে এক অদ্ভুত আবেগের সৃষ্টি করেছিল।[৭৩] কায়রোর শান-শওকত সম্পর্কে ইবনে খালদুন লিখেন, "আমি এমন একটা জায়গা দেখলাম, যা গোটা বিশ্বের সেরা দুনিয়ার গুলিস্তান, জগতের রঙ্গমঞ্চ, লক্ষ লক্ষ মানুষের মিলনের স্থান, ইসলামের প্রাণকেন্দ্র এবং রাজ্যের রাজধানী। এর মহল এবং কিল্লাগুলি আসমান স্পর্শ করে। আর এর শিক্ষায়তন ও বিদ্যালয়গুলি জ্ঞানের আলো বিকীর্ণ করে। এখানকার আলিমগণ ইলমের দুনিয়ায় চাঁদ সেতারার সমতুল্য। শহরের রাস্তাসমূহ জনাকীর্ণ, বাজারে জাঁকজমকের ছড়াছড়ি!"[৭৪]

ফলে তিনি এখানেই জীবনের অবিশিষ্টকাল কাটিয়ে দেবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। কায়রো সে সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলিম শিক্ষা কেন্দ্ররূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। তাছাড়া কায়রোর রাজদরবারে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সেবিগণ বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতেন। হয়তবা রাজানুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষাতেই ৭৮৪ হিজরি/১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে ইবনে খালদুন কায়রোতে গিয়ে হাজির হন।

তৎকালে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার অনেক ভাগ্যান্বেষী নানা কাজে ব্যাপৃত হয়ে মিশরে অবস্থান করছিল এবং ইবনে খালদুনের ও তাঁর বংশের খ্যাতি অনেকেই জানত। সেজন্য এ অপরিচিত পরিবেশে তাঁর যোগ্য মর্যাদা লাভে সহায়তা করেছে। তিনি কায়রো পৌঁছার পরই আলাউদ্দিন তিম্বুগা জাওয়ানী নামে এক প্রভাবশালী তুর্কি আমীরের সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন কনে। বস্তুত এ আমীরই তাঁকে কায়রোর তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে পরিচিতি লাভের প্রাথমিক সুযোগ করে দেন এবং তাঁরই মাধ্যমে মিসরের তৎকালীন শাসক সম্রাট মালীক জহীর বারকুকের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে। সম্রাট বারকুক তাঁকে ১৩৮৪

---

৭৩ ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, অনুবাদ, গোলাম সামদানী, কোরায়শী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

৭৪ আখ্তার-উল্-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কৌমিয়া মাদ্রাসার মালেকী ফিকাহশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এভাবে ইবনে খালদুন কায়রোর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজের অধীত ও অর্জিত জ্ঞান বিতরণের সুযোগ লাভ করেন।

কৌমিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপনায় নিযুক্ত হওয়ার কয়েক মাস পরেই সম্রাট বারকুক ইবনে খালদুনকে মিসরের মালেকী মাজহাবের প্রধান বিচারকের পদে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান। ৭৮৬ হি./১৩৮৪ খ্রি. সনে তিনি প্রধান কাযী নিযুক্ত হন। এতে তাঁর প্রভাব-পতিপত্তির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

ইবনে খালদুন প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর মিশরে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি এ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের অযোগ্যতা, দুর্নীতি, গোষ্ঠীপ্রীতি ও ঘুষ প্রথাকে কঠোর হস্তে দমন করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে শুধু মিসরীয় নয়, মিশরে অবস্থানকারী তাঁর স্বদেশীয় বহুলোক ও তাঁর বিরোধী হয়ে উঠে। বস্তুত তৎকালীন মিশরে এ সকল ব্যাপার প্রথাগতভাবে স্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এর সঙ্গে সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও জড়িত ছিলেন। ফলে, একজন বিদেশি, তিনি যত জ্ঞানীগুণীই হোন না কেন, প্রধান বিচারকের পদে সমাসীন হয়ে দীর্ঘদিনের প্রথাকে পরিবর্তন করে ফেলবেন, এ বিষয়টি তারা সহ্য করতে পারেননি। কাজেই এক বছর যেতে না যেতেই তাঁদের চক্রান্তের ফলে ইবনে খালদুন ৭৮৭ হি./ ১৩৮৫ খ্রি. সনে উক্ত পদ থেকে বিচ্যুত হন।

সম্রাট বারকুকের আবেদন ও বন্ধুস্থানীয়দের অনুরোধে তিনি ৭৮৯/১৩৮৭ খ্রি. সনে নব প্রতিষ্ঠিত জহীরিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপনায় যোগ দেন এবং সম্রাটের অনুমতিক্রমে ১৩৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সে উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। দীর্ঘ আট মাস কাল মক্কা, মদিনার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে এবং বহু জ্ঞানীগুণীর সাহচর্য লাভ করে তিনি পুনরায় কায়রোতে ফিরে আসেন। এর কয়েক মাস পরে ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তাঁকে সারগাতমিশিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। কিছুদিন পরে একই সঙ্গে তিনি ‘বাইবার’ মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন।

তৈমুরের দরবারে ইবনে খালদুন

অতঃপর দীর্ঘ ১৪ বছর অধ্যাপনার পর ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় প্রধান বিচারক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পরেই সম্রাট বারকুকের মৃত্যু হয়। সম্রাট বারকুকের পর মিসরের সিংহাসনে বসেন তাঁর দশ বছর বয়স্ক বালকপুত্র নাসিল-আল-ফেরাজ। এ পরিবর্তনেও ইবনে খালদুনের পূর্বতন পদমর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। কিছুদিন পর বিভিন্ন চক্রান্তের ফলে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে তিনি প্রধান বিচারকের পদ থেকে বিচ্যুত হন। এ সময়ে সংবাদ এসে পৌঁছায় যে, সম্রাট তৈমুর লঙ্গের (১৩৬৬-১৪০৪ খ্রি.) নেতৃত্বে তাতারী সৈন্যদল আলেপ্পা জয় করে দামেশকের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মিসরীয় সম্রাট শত্রুদের এ অগ্রাভিযান প্রতিহত করার জন্য সসৈন্যে দামেশ্কে যাত্রা করেন। এ সময় ইবনে খালদুনও তাঁর সাথে অভিযানে যোগ দিয়ে ১৪০০ খিস্টাব্দের শেষ দিকে দামেশকে পৌছান।

তৈমুর লং আলেপ্পো দখলের পর দামিশ্ক অবরোধ করে হুমকির সৃষ্টি করেছিল। এ সময়ে 'কায়রোতে সিংহাসন অধিকারের একটি ষড়যন্ত্র চলছে'-এ সংবাদ শুনে সম্রাট নাসির আল-ফেরাজ মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন। ইবনে খালদুনসহ সকল অনেকে দামেশকে তাতারী সৈন্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত জ্ঞানীগুণীরা ইবনে খালদুনের নেতৃত্বে সম্রাট তৈমুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি সসম্মানে তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তাঁদের মধ্যে নগরীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কীয় বিষয় ছাড়াও অন্য অনেক বিষয়ে আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনী 'আত-তারিফ' গ্রন্থে সম্পর্কে লিখেন: "আমি তাঁবুর ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তিনি (তৈমুর) বসে ছিলেন; প্রবেশ করেই আমি আত্মসমর্পণ করার ভঙ্গিতে সালাম করলাম। তিনি মাথা তুলে চেয়ে দেখলেন এবং হস্ত বাড়িয়ে দিলেন। আমি তাতে বুসা প্রদান করলাম। তিনি আমাকে বসার আদেশ করলেন। যেখানে ছিলাম সেখানেই বসে পড়লাম। অতঃপর তিনি তাঁর জনৈক সহচর হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ আবদুল জাব্বার ইবনে নোমানকে আমাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করার জন্য ডেকে পাঠালেন।[৭৫]

ইবনে খালদুনের সঙ্গে সম্রাট তৈমুর লঙ দীর্ঘসময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ব্যক্তিগত খবর, মিসর থেকে তাঁর আসার কারণ ইত্যাদি বিষয়াদি ছাড়াও তৈমুর তাঁর নিকট থেকে উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহ, তাদের শহর বন্দর ও অধিবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ

---

[৭৫] আখ্‌তার-উল্‌-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

করেছিলেন। পরিশেষে উত্তর আফ্রিকার উপরে এখখানি পুস্তক রচনার জন্য তিনি ইবনে খালদুনকে অনুরোধ করেছিলেন। ইবনে খালদুনও তৈমুরের নিকট তাঁর সমাজবিষয়ক নিজস্ব মতবাদসমূহ এবং রাষ্ট্রের মূল শক্তি, উত্থান-পতন ও সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

সম্রাট তৈমুর ইবনে খালদুনের পাণ্ডিত্য ও নির্ভীকতায় মুগ্ধ হন এবং তাঁর অনুরোধ রক্ষ করে নগরীর অধিবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার অঙ্গীকার করেন।[৭৬] কিন্তু পরিণামে আত্মসমর্পণে দেরি করার অজুহাত দেখিয়ে তাতারীরা তাদের এ অঙ্গীকার রক্ষা করেনি। ইবনে খালদুন সম্রাটের নিকট থেকে সসম্মানে ১৪০১ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় মিশরে ফিরে আসেন।[৭৭]

ইবনে খালদুনের শেষ জীবন

তৈমুরের ঘটনার পর ইবনে খালদুন আরও পাঁচ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে কয়েক বার প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ও তা থেকে বিচ্যুত হওয়া ছাড়া তাঁর জীবনের অন্য কোনো বিশেষ সংবাদ জানা যায় না। ১৪০১ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে তিনি তৃতীয় বার প্রধান বিচারক হন এবং ১৪০২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে পদচ্যুত হন। পুনরায় ঐ বছরেরই জুলাই মাসে চতুর্থবার উক্ত পদে যোগদন করেন এবং ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ সনে তাঁর ইন্তিকালের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ষষ্ঠ ও শেষ বারের মতো তিনি কাযী পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৭৮]

পুনরায় ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি পঞ্চম বার ঐ পদে যোগ দেন এবং তিন মাস পরে পদচ্যুত হন। তার শেষ বা ষষ্ঠ বার উক্ত প্রধান বিচারকের পদে যোগদানের সময় ছিল ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস এবং এ যোগদানের কয়েকদিন পরেই ৮০৮হিজরি/১৭ মার্চ, ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ সনে ইন্তিকাল করেন।[৭৯]

---

৭৬ ইবনে খালদুন তৈমুর লংয়ের সাথে সাক্ষাৎকারের এক বিস্তারিত বিবরণ তাঁর আত্মজীবনীতে (তারীফ)-এ দিয়েছেন। ইবনে খালদুনের মতে হয়ত মনে হয়েছিল যে, তৈমুর লংয়ের মধ্যে শতাব্দীর এমন এক ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পেয়েছেন যাঁর মাঝে মুসলিম জাহানকে পুনরায় একত্র করার ও ইতিহাসকে এক নয়া দিক-নির্দেশনা দেওয়ার মত যথেষ্ট অনুরাগ (আসাবিয়্যা) আছে। (দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২১।)

৭৭ আখ্তার-উল্-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭।

৭৮ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২১।

৭৯ E. I. J. Rosenthal, Political Thoght in Medieval Islam (U.S.A.: Cambridge University press, 1958), p, 161.

কবর: ইবনে খালদুন মিসরের কায়রোতে কোথায় বসবাস করতেন এ বিষয়ে বরেণ্য ঐতিহাসিকদের কৌতূহলের বিষয়। আল-জামাল আল-বিশবিশির[৮০] গ্রন্থ হতে ইবনে হাজার আসকালানী (র) উদ্ধৃত থেকে এ সম্বন্ধে দু'টি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। আল-জামাল তাঁর প্রথম বিবৃতিতে বলেছেন যে, 'তিনি একদিন আল-সালিহিয়ার অদূরে ইবনে খালদুনের সাক্ষাৎ পান। ইবনে খালদুন তখন তাঁর কয়েকজন সহকারী বিচারককে নিয়ে গৃহাভিমুখে রওনা হয়েছিলেন।' এ তথ্যের ভিত্তিতে বুঝা যায় যে, তিনি সালেহিয়া জেলার কোথাও বসবাস করতেন। এ জেলায় তাঁর শিক্ষায়তনটি স্থাপিত ছিল। শিক্ষায়তনটিতেই প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাঁর দপ্তর স্থাপিত হয় এবং কাছাকাছি কোথাও মালেকী মাযহাবের কার্যালয় অবস্থিত ছিল। তাই বেইন আল-কাসেরিনের বা এর কাছাকাছি কোথাও তাঁর বাসস্থান অবস্থিত ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।[৮১]

আল-জামাল তাঁর দ্বিতীয় বিবৃতিতে ৮০৩ হিজরিতে দামেস্ক থেকে ইবনে খালদুনের প্রত্যাবর্তনের পর বিচারক হিসেবে তাঁর নিয়োগ প্রসঙ্গে বলেন: 'ইবনে খালদুন নীল নদের কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসতেন এবং গান শুনতে পছন্দ করতেন।' এ থেকে ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন যে, ইবনে খালদুন নীল নদের অববাহিকায় অবস্থিত কোন জেলায় সম্ভবত রাওদা দ্বীপে অথবা আল-ফুসতাতের অপর পার বসবাস করতেন।

ইবনে খালদুনের মাযার সম্বন্ধে আল-সাখাবী তাঁর পুস্তকে উদ্ধৃত করেছেন যে, বাব আল নসরের বাইরে সূফি গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আল-মাকরিজী বলেন, অষ্টম শতকে আমীর ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কবরস্থানের কয়েকটি কবরের মধ্যবর্তী স্থানে ইবনে খালদুনকে দাফন করা হয়। এই কবরটি ছিল বাব আল-নাসরের উপকণ্ঠে, আল-রাই-দানিয়ার (এখন আল-আব্বাসিয়া) দিকে অবস্থিত।[৮২]

---

৮০ তাঁর পূর্ণনাম জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ আল-বিশবিশি ৭৬২হিজরি সনে ঘারবিয়া প্রদেশের বিশবিশ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও ৮২০ হিজরি সনে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ ও আলিম। এক সময় তিনি কায়রোর হিসবার (সরকারী ওকালতি) পরিচালক নিযুক্ত হন। (দ্র. আল-সাখাবী, আল-দাবু আল-লামী, খ. ৭, ৩য় অধ্যায়, পৃ. ৪১১ (জীবনী দ্রষ্টব্য); আখ্‌তার-উল্‌-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পাদটীকা, পৃ. ৬৫।)

৮১ আল-মাকরিজি, আল-খিতাব, খ. ২, পৃ. ৩৭১-৭২; আখ্‌তার-উল্‌-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩।

৮২ আল-মাকরিজি, আল-খিতাব, খ. ২, পৃ. ৩৭১-৭২; আখ্‌তার-উল্‌-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

সন্তানাদি

ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে সর্বপ্রথম পরিবার-পরিজনের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদিগকে শ্যালকের নিকট কুস্তানতুলিয়ায় পাঠিয়ে দেন। তাঁর স্ত্রীর পরিচয় বা সন্তানাদির সংখ্যা, কখন বিয়ে করেছিলেন, সে সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। ইবনে খালদুন প্রসঙ্গক্রমে তাঁর পিতা ও ভাইদের কথা তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করলেও তাঁর ব্যক্তিগত পরিবার-পরিজনদের কথা তেমন গুরুত্বসহকারে ও বিস্তৃত আকারে কোথাও তুলে ধরেননি। তবে ধারণা করা হয় যে, ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে তিউনিস ত্যাগের পর তিনি বিয়ে করেন। হাফসী সম্রাটদের একজন বিশিষ্ট সেনাপতি ও সমরমন্ত্রী মুহম্মদ ইবনে হাকিম ছিলেন তাঁর শ্বশুর। ফেজে তিনি এ ইবনে হাকিম তনয়াকে নিয়েই বিবাহিত জীবন-যাপন করেন।[৮৩] অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায়, ইবনে খালদুনের স্ত্রী ও পাঁচটি কন্যা সন্তান নৌকাডুবিতে মারা যায়। ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিউনিস থেকে মিশরে আসার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শুধু তাঁর দুই পুত্র মুহম্মদ ও আলী মিশরে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ইবনে খালদুন স্বয়ং তাঁর আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেননি।

ইবনে খালদুনের পিতা-মাতার মৃত্যুর পর বড় ভাই মুহম্মদ তাঁদের পরিবারের কর্তা ছিলেন। তিনি ছাড়াও ইবনে খালদুনের আরও ভাই ছিলেন। তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ভাই ইয়াহিয়া তুলনামূলকভাবে খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি কয়েকবারই উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। [৮৪]

---

৮৩ ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী, ৪র্থ সংস্করণ, (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ২৫।

৮৪ প্রাগুক্ত।

তৃতীয় অধ্যায়
ইবনে খালদুনে রচনাবলি ও মূল্যায়ন

১ম পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের রচনাবলী

২য় পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুন রচিত মুকাদ্দিমা

৩য় পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুন রচিত মুকাদ্দিমার মূল্যায়ন

১ম পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের রচনাবলি

ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক তথা সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ইবনে খালদুনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ব্যাপক দার্শনিক শিক্ষালাভ করেন; বিশেষত ইবনে সিনা[৮৫] ও ইবনে রুশ্‌দ-এর রচনাবলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে এবং ইবনে রুশ্‌দ-এর রচনাবলির ওপর তিনি বেশ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করেন। এছাড়াও ইবনে খালদুন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন, যেগুলি সম্বন্ধে এখনও জানা যায়নি। তাঁর দার্শনিক অবদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকের একটি হলো গ্রিক-আরবীয় দর্শনের ওপর বিস্তৃত মন্তব্য ও সমীক্ষা রচনা এবং অপরটি ইসলামের ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ে মৌলিক রচনা। এ ছাড়াও লুবাব আল-মুহাস্‌সাল এবং শিফা আল-সাইল নামক দুটি গ্রন্থে স্কলাস্টিক ধর্মতত্ত্ব ও মরমিবাদে তিনি যে অবদান রেখে যান, তা-ও রীতিমত অসামান্য।

ইবনে খালদুনের রচনাবলী

ইবনে খালদুন তাঁর রচিত মুকাদ্দিমা ও ‘ইরাব-এর জন্য পরিচিত। তবে তিনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন সেগুলির বর্তমানে অস্তিত্ব নেই। নিম্নে ইবনে খালদুনের রচনাবলী সম্পর্কে আলোকপডাত করা হল:

- ‘কিতাব মুহাস্‌‘সাল আফ্‌কারিল-মুতাকাদ্দিমীন ওয়াল-মুতা‘আখ্‌খিরীন মিনা’ল-‘উলামা’ ওয়াল-হুকামা’ ওয়াল-মুতাকাল্লিমীন (**كتاب محصل افكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين**)। আনুমানিক বিশ বছর বয়সে আল-আবিলীর প্রভাবে ইবনে খালদুন আর্‌-রাযীর অনুসরণে ধর্মতাত্ত্বিক দাশনিক বিশ্বকোষের এক সংক্ষিপ্ত

---

৮৫ চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক আল শাইখ আল বাইম আবূ আলী আল হোসেইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা আল বুখারী ইবনে সীনা। তিনি ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বুখারার নিকটবর্তী আফশানাতে জন্মগ্রহণ করেন। ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইস্পাহানে মৃত্যুবরণ করেন। ২১ বছর বয়সে তিনি ‘আল মুজমুয়া’ নামে একটি ‘বিশ্ব কোষ’ রচনা করেন। তাঁর ‘আল কানুন’ গ্রন্থটি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক বিপ্লব এনে দেয়। এত বিশাল গ্রন্থ সে যুগে আর কেউ রচনা করতে পারেনি। এটি ল্যাটিন ইংরেজী, হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ করা হয। ইউরোপের মেডিকেল কলেজগুলোতে গ্রন্থটি প্রায় হাজার বছর যাবত পাঠ্যছিল। ‘আল কানুন’ ৫টি বিশাল খন্ডে বিভক্ত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ লাখেরও বেশী। এছাড়া তাঁর ‘আশ শিফা’ দর্শন শাস্ত্রের একটি অমূল্য গ্রন্থ। এটি ২০ খন্ডে বিভক্ত। এতে রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রাণীতত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্বসহ যাবতীয় বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ইবনে সিনা পদার্থ বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, জ্যামিতি, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

বিবরণী প্রণয়নে প্রয়াসী হন। এটা কার্যত ধর্মবিশ্বাস ও এর দার্শনিক প্রতিক্রিয়া প্রভাবের সমস্যা সংশ্লিষ্ট নিখিল 'আরব মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্ত অবয়বের রূপরেখা, লুবাব'বুল মুহাসসাল ফী উসূলিদ-দীন শীর্ষক এ সংক্ষিপ্ত বিবরণী গ্রন্থে ইবনে খালদুনের চিন্তার গতিধারার নির্দেশনা রয়েছে, যা কোন দিনই তিনি বিস্মৃত হননি।[৮৬]

- 'আল-রিহালা আল-তারিফ (Al-Rihla al-Taarif: 1394) নামে ইবনে খালদুনের একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রয়েছে। গ্রন্থটি লেখার সমাপ্তি ঘটেছে জিলক্বাদ ৮০৭হি./মে ১৪০৫খ্রিস্টাব্দ সনে। এটি সাত খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।
- 'শিফা উস-সাইল। এটি সূফিতত্ত্বেরউপর রচিত গ্রন্থ, যা তাঁর জীবনের শেষভাগে লেখা হয়েছে।

ইবনেুল খাতীব তাঁর রচিত 'ইহাতা' গ্রন্থে ইবনে খালদুন রচিত আরো পাঁচটি গ্রন্থের ব্যাপারে জানা যায়। তিনি বলেন, ইবনে খালদুন ৫টি রচনার কাজ করেছেন:

১। আল-বুসীরীর বুরদা-এর একটি ভাষ্যগ্রন্থ;

২। আল-মানতিক অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রের রূপরেখা;

৩। আল-হিসাব গণিত সংক্রান্ত রচনা;

৪। ইবনে রুশদের রচনাবলীর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য;

৫। উসূল ফিকহের উপর ইবনেুল খাতীবের একটি কবিতার ভাষ্য 'লুবাব আল মাহসুল''।

উপরোল্লিখিত সবকটি গ্রন্থই বর্তমানে লুপ্ত। এমনকি ইবনে খালদুন তাঁর রচিত 'তারীফ' গ্রন্থেও এগুলির বিবরণ উল্লেখ করেননি। তাঁর মিসরীয় জীবনীকারও দৃশ্যত এগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেনি।[৮৭]

---

৮৬ ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬২২।

৮৭ ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭ খ্রি.), খ.৩, পৃ. ৬১৯।

গবেষক রংগলাল সেনের মতে, ইবনে খালদুন চুয়াত্তর বছর বেঁচে থাকলেও জ্ঞানের জগতে তাঁর সক্রিয় বিচরণকাল হচ্ছে চুয়ান্ন বছর, যার মধ্যে মাত্র চার বছরেরও কম সময়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'মুকাদ্দিমা' রচনা করেন। তাছাড়া, খালদুনের সমকালীন আরব লেকখদের রচনা থেকে জানা যায় যে, তিনি কবিতা লিখেছেন এবং কতক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। এসবের উল্লেখযোগ্য হল- ইবনে রশীদসহ আরো কয়েকজন আরব দার্শনিকের পুস্তক পর্যালোচনা। অধিকন্তু, যুক্তিবিদ্যা ও পাটিগণিত নিয়েও তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু তাঁর এসব রচনা ও বইপত্রের অধিকাংশ হারিয়ে যাওয়ায় পরবর্তী প্রজন্মের পাঠকদের কাছে চিরদিনের মতো অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তবে একটিমাত্র গ্রন্থের জন্য অবশ্যই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর সেটি হচ্ছে- কিতাব আল-ইবার (Kitab al-ibar)।"[৮৮]

---

[৮৮] রংগলাল সেন, ইবনে খালদুন: সমাজবিজ্ঞানের অনানুষ্ঠানিক জনক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৫-৮৬, জুন-অক্টোবর ২০০৬ খ্রি. /জৈষ্ঠ-কার্তিক ১৪১৩, পৃ. ৩২।

২য় পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুন রচিত মুকাদ্দিমা

ইবনে খালদুনের মহান সৃষ্টি হল-কিতাব আল-ইবার, বিশ্ব ইতিহাস। পুরো নামঃ কিতাব আল-ইবার ওয়া দিওয়ান আল মুবতাদা ওয়া আল-খবর ফি আয়্যাম আল-আজম ওয়া আল-বার্বার (Book of instructive examples and register of subject and predicate dealing with the his tory of the Arabs, Persians and Berbers)।[৮৯]

গ্রন্থটি সাত খণ্ডে রচিত। এ রচনার ভূমিকার শিরোনাম 'মুকাদ্দিমা'। মুকাদ্দিমা এত ব্যাপক আকারে লিখা যে, এটা প্রথম খণ্ডের প্রায় সব স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এতে প্রকৃতি ও ইতিহাস দর্শন প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের অভিমতগুলো সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে। অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই মুকাদ্দিমা নতুন বিষয় সমূহের অবতারণা করেছে। যেমন বিজ্ঞান বা ইতিহাস দর্শন এবং সমাজ বিজ্ঞান। পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মতে, মুকাদ্দিমা হচ্ছে তথ্য সরবরাহের এক জ্ঞানভাণ্ডার- বহনযোগ্য এক ধরনের বিশ্বকোষ। এ রচনাতে সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, যেমন, জ্যোতির্বিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, নীতিবিদ্যা, নৃবিদ্যা, শিক্ষাবিজ্ঞান, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা, দ্বান্দ্বিকবাদ, অধিবিদ্যা, গূঢ়বাদ, ভবিষ্যৎ কথা, মনোবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াবহির্ভূত ব্যাপার বা অবস্থাদি (যথাঃ ইন্দ্রিয়াতীত প্রক্রিয়ার জ্ঞান জানাজানি, পূর্বাহ্নে লব্ধ জ্ঞান, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষকরণ চিকিৎসা বিদ্যা, সংগীতবিদ্যা, কৃষি, রসায়ন, যুক্তিবিদ্যা) প্রভৃতি।[৯০]

কিতাব আল-ইবার-এর প্রকাশ

ইবনে খালদুনের রচনাবলি অনেকদিন পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। মাঝে মাঝে মুকাদ্দিমা গ্রন্থ ও মূল ইতিহাস গ্রন্থের বাচাই করা অংশগুলো অনূদিত ও প্রকাশিত হলেও পূর্ণাঙ্গ রচনাবলির কোনো প্রচার তেমন একটা ছিল না। ইবনে খালদুনের ইতিহাসের বিরাট অংশ মুসলিম

---

৮৯ ড. মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, মুসলিম ইতিহাসতত্ত্ব (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৬৭।

৯০ আব্দুল হালিম, মুসলিম দর্শন চেতনা ও প্রবাহ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৮৮।

সাম্রাজ্য সম্পর্কিত ইতিহাস ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে নোয়েল ভারগার কর্তৃক ফরাসি ভাষায় অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়। রয়্যাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৯নং পাণ্ডুলিপি থেকে কোয়াট্রিমেয়ারের সম্পাদনায় ১৮৫৮ সালে খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এদিকে ১২৭৪ হিজরি (১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে) শেখ নাসের আল-হুরানী কর্তৃত মিসরের কায়রোতে 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থ প্রথমবারের মত প্রকাশিত হয়। শেখ নাসের যে পাণ্ডুলিপি থেকে পুস্তকটি সংকলন করেন, তাতে একটি উৎসর্গ অনুচ্ছেদ ছিল, কিন্তু প্যারিস সংকলনের পাণ্ডুলিপিতে উক্ত উৎসর্গ অনুচ্ছেদ নেই। এরপর বেশ কয়েকবার পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে।[৯১]

বুলাক (কায়রো) সরকারি মুদ্রণালয় ইবনে খালদুনের সমগ্র গ্রন্থ কিতাব 'আল-ইবার' ক্রমানুসারে সাত খণ্ডে প্রকাশ করেছে। ১২৮৪ হিজরি/১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে শেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। ইবনে খালদুনের কতিপয় খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলন করে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়। পাণ্ডুলিপিগুলো প্রত্যেকটি কিছুটা অসম্পূর্ণ হলেও পরিপূরক হিসেবে ব্যবহারের ফলে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি সংগ্রহ ও সংকলন করা সম্ভব হয়েছে। উৎসর্গ অনুচ্ছেদযুক্ত উপরোক্ত ১২৭৪ হিজরির সংস্করণ থেকে 'মুকাদ্দিমা' পুস্তকটি সংকলিত হয়। আলোচ্য উৎসর্গ অনুচ্ছেদটি থেকে ইবনে খালদুনের ইতিহাস ও তাঁর গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা সম্ভব। এই অনুচ্ছেদে দেখা যায়, তিনি এ 'মুকাদ্দিমা' পুস্তকটি তাঁর মনিব, বানু মারিনের সুলতান আবু ফারিস আবদুল আজিজ ইবনে আবুল হাসানের গ্রন্থাগারের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গে তিনি বলেছিলেন: "রাজধানী ফেযে অবস্থিত কুরাইন মসজিদে পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমৃদ্ধশালী গ্রন্থাগারের জন্য প্রেরিত হলো।"[৯২]

আধুনিক গবেষকগণের মতে, বন খালদুন ফেযে এই পুস্তকের দু'টি খণ্ড প্রেরণ করেছিলেন। কুরাইন মসজিদের গ্রন্থাগারে আজও উক্ত দু'টি খণ্ড সংরক্ষিত আছে। এম. আলফ্রেড বেল প্রথমে উক্ত খণ্ড দু'টির সন্ধান লাভ করেন। কুরাইন মসজিদের লাইব্রেরিতে পুস্তকাবলীর যে তালিকা রয়েছে, তাতে খন্ড দু'টির উল্লেখ আছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি আরো

---

৯১ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী (ঢাকা: র‍্যাকস পাবলিকেশন্স, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৪০।

৯২ এই সুলতান আব্দুল আজিজ ছিলেন সুলতান আবুল হাসানের পুত্র। তিনি আবু সলিমের পুত্র; আর আবু সলিম হচ্ছেন আবুল আব্বাসের পুত্র। সুলতান আবদুল আজিজ ৭৯৬ হিজরিতে সিংসাহনে আরোহণ করেন এবং ৭৯৯ হিজরিতে সাকারে ইন্তিকাল করেন। এ হিসেবে ৭৯৬-৭৯৯ হিজরির মধ্যেই যে ইবনে খালদুন পুস্তকটি উৎসর্গ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। (দ্র. আখ্তার-উল্-আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-৩৭)

জানিয়েছেন যে, উক্ত খণ্ড দু'টির একটিতে ওয়াক্ফ-এর ফরমুলা লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৯৩] পরবর্তীকালে এ. লেভি প্রভেনকাল উক্ত আবিষ্কারের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে 'জার্নাল অব এশিয়াটি'-কে এক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধে যে ওয়াক্ফ ফরমুলার আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়, উক্ত ওয়াক্ফ ফরমুলার তারিখ ছিল- ২১ শে সফর, ৭৯৯ হিজরি। এই খণ্ডের শেষে লিপিকার (নকল-নবীশ) উল্লেখ করেন যে, তিনি গ্রন্থাগারের মূল কপি থেকে এই খণ্ডটি নকল করেছেন।[৯৪] ইবনে খালদুনের প্রচেষ্টায় ও বারবার সরকারদ্বয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হলে মিসরের সুলতান জহির বারবুক উত্তর আফ্রিকার সুলতানের নিকট যে সওগাত প্রেরণ করেছিলেন, তার সাথে এ পুস্তকটিও প্রেরিত হয়েছিল। ইতোমধ্যে সুলতান আবদুল আজিজ ইন্তিকাল করেন; কিন্তু কায়রোতে তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ পৌঁছে দেরীতে। তবে ইবনে খালদুন তাঁর সাবেক মনিব ও পৃষ্ঠপোষক বনু মারিনের গ্রন্থাগারের জন্য যে পুস্তকটি উপহার পাঠিয়েছিলেন, তা তার রচনাবলির পূর্ণাঙ্গ ও সংশোধিত কপি নয়। ইবনে খালদুন তাঁর গ্রন্থের প্রথম কপি লেখার পনের বছর অতিবাহিত হয় এই অন্তবর্তীকালীন সময়ে কায়রোতে অবস্থানকালে তিনি তাঁর রচনাবলিতে বহু পরিমার্জন ও সংশোধন করেন। গ্রন্থের প্রায় সকল অংশেই এই সংশোধন সাধিত হয়েছিল। ইবনে খালদুন ইতোপূর্বে ইতিহাস গ্রন্থে যে সকল ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তার সাথে এই সংশোধনের সময় প্রয়োজনীয় উদাহরণ হিসেবে ৭৯৫, ৭৯৬ এমনকি ৭৯৭ হিজরির ঘটনাবলিও যোগ করেন।[৯৫]

মিসরের গ্রন্থাগারে (মোস্তফা পাশার সংগৃহীত) কিতাব আল-ইবারের আরেকটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। দশ খণ্ডে বিভক্ত এই পাণ্ডুলিপিতে অবশ্য একটি খণ্ড (সম্পাদিত সপ্তম খণ্ড) নেই। এই পাণ্ডুলিপিটিতেও উপরোল্লিখিত উৎসর্গ অনুচ্ছেদটি সংযোজিত রয়েছে। এ থেকেই বুঝা যায় যে, ফেযের দরবারের জন্য প্রেরিত মূল পাণ্ডুলিপি থেকেই এই পাণ্ডুলিপিটি হুবহু কপি করে রাখা হয়েছে।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ সনে কোয়াট্রিমেয়ার কর্তৃক 'মুকাদ্দিমা' প্রকাশের পর বেরন দ্যা স্লানী ফরাসি ভাষায় পুস্তকটির অনুবাদ শুরু করেন। কোয়াট্রি মেয়ারের প্রচেষ্টাতেই এই উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল; কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে অনুবাদ অসমাপ্ত থেকে যায়। এম. দ্যা স্লানীর ফরাসি অনুবাদ

---

৯৩ A. Bel: Catalogue des livres Arab es de la Bibliotheque de la Moiquee de El-Quaraviyin a Fez, p. 6.

৯৪ Journal of Asiatic Society (Juillet-September), pp. 163-64.

৯৫ আখ্তার-উল্-আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-৩৭।

১৮৬৩-৬৮ খ্রিস্টাব্দের বিশাল আকারে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। দ্যা স্লানী, কোয়াট্রি মেয়ার সম্পাদিত মূল আরবীকে সামান্য ব্যতিক্রম ধরে নিয়ে মূল পাণ্ডুলিপির সাথে অপরাপর পাণ্ডুলিপির তুলনামূলক আলোচনারও অবতারণা করেন। তিনি ইবনে খালদুনের আত্মচরিত (আল-তারিফ) অনুবাদের কাজেও হাত দেন এবং মৃত্যু পূর্বপর্যন্ত তিনি সমসাময়িক মিসরীয় ঐতিহাসিক যেমন, মাকরিজি, আল-আইনী, ইবনে কাদী, শোহবা প্রমুখের মতামতের উল্লেখসহ উক্ত আত্মচরিত অনুবাদ করে যান। দ্যা স্লানী ইবনে খালদুনের রচনার আঙ্গিক নিয়ে অভিযোগ করে বলেন, "আঙ্গিক কিছুটা দুর্বল ও দ্ব্যর্থবোধক, তাছাড়া তিনি এত বেশি বিশেষণ ব্যবহার করতেন, যার ফলে তাঁর বক্তব্য অনুধাবন করা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য অনুধাবন করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।"[৯৬] প্রকৃতপক্ষে দ্যা স্লানীর অনুবাদই বহুক্ষেত্রে দ্ব্যর্থবোধক। এক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের উপর অবেধ্যতার বোধ চাপানো যুক্তিসঙ্গত কিনা বিবেচ্য। কেননা, ফরাসি অনুবাদেই দুর্বলতার লক্ষণ সুস্পষ্ট।[৯৭] দ্যা স্লানী, ইবনে খালদুনের ইতিহাস গ্রন্থের বৃহত্তর অংশের অর্থাৎ বার্বার রাজত্ব সম্পর্কিত অংশের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। এই অংশটি দু'টি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত। এতে দেখা যায়, অনুবাদক বহু পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা করেছেন। বহুস্থানে মূল বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত করেছেন এবং কোন কোন স্থানে অন্যান্য লেখকদের রচনা থেকে পাওয়া তথ্যও সন্নিবেশিত করেছেন। দ্য স্লানীর এই ফরাসি অনুবাদ পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে আলজিয়ার্সে (১৮৫২-১৮৫৬খ্রি.)।

ইবনে খালদুনের ইতিহাসের অপরাপর কয়েকটি অংশও ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়। এর মধ্যে ডজি অনূদিত "Historie des Benou al-Ahmar Rose de Grenade-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত অনুবাদ দু'টি Journal Aisatique-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। বানু আবদ আল-ওয়াদ সম্পর্কিত ইতিহাস অংশ-এ বেল কর্তৃক অনূদিত হয়ে æHistoire des Beni Abdel Wad Rois de Telmcan' নামে তিন খণ্ডে আলজিয়ার্সে প্রকাশিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে পেরিজাদ কর্তৃক তুর্কি ভাষায় 'মুকাদ্দিমা'র প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদক ১১৬২হিজরি/১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ সনে ইন্তিকাল করেন। ইতিহাসের অপরাপর কয়েকটি অংশও ফরাসি ভাষায় অনুদিত হয়।

---

৯৬ De Slane: Les Prolegomenes d' Ibn Kbaldoun, Vol. I, p. 112.

৯৭ আখ্তার-উল্-আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

ইবনে খালদুনের ইতিহাসের কতিপয় অংশ জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তন্মধ্যে তিসেন হাসেন অনূদিত 'Dil Gesehichte der Ogailiden Dynastie'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। সিরীয় উপকূলের ক্রুসেডের বিবরণ সম্বন্ধীয় কয়েকটি অধ্যায় টর্নবার্গ 'Geschiehte der Franken Welche die kusten adn Grenzlaender Syriens bestzten' নামে অনুবাদ করেছেন। ভন হ্যামার ও ভন ক্রোমার মুকাদ্দিমা ও ইতিহাসের অংশ বিশেষের কিছু কিছু অনুবাদ করেছেন। এছাড়া জার্মান ভাষায় ইবনে খালদুনের রাষ্ট্র সংক্রান্ত আলোচনা অংশ 'Die Gesanken Ibn Khaldoun's uber den staat'-নামে প্রকাশিত হয়েছে। এর টীকা লিখেছেন–এডুইন রোমেন থাল। মুকাদ্দিমার কতিপয় অংশ ইতালীয় ভাষায়ও অনুদিত ও প্রকশিত হয়েছে। উক্ত অংশগুলি অনুবাদ করেন ল্যান্সি। সিসিলি সম্পর্কিত ইতিহাস অংশ অনুবাদ করেন আমরি। ইয়েমেন সম্পর্কিত অধ্যায়ের ইংরেজি অনুবাদ করেন H. Cassels Kay। ল্যাটিন, রুশ ও অন্যান্য ভাষায় 'মুকাদ্দিমার' আরও কতিপয় অংশের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। [৯৮]

বার্লিনর, লিডেন ফ্লোরেন্স, লেলিলগ্রাড, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, মিলান, মিউনিক ও ভিয়েনায় 'মুকাদ্দিমার' হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। সমগ্র গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ বা খণ্ড খণ্ড অংশের পাণ্ডুলিপি মিসরীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। এছাড়াও এখানে সমাপ্ত প্রায় অবস্থায় দু'টি কপি ও কতিপয় পৃথক পৃথক অংশ রয়েছে। আল-আযহার মসজিদ, ওসমানিয়া, জেমি জামি, কনস্টান্টিনোপলে ইব্রাহিম পাশার সংগৃহিত পুস্তকাবলির মধ্যে, ফেজে অবস্থিত কোরানিয়া মসজিদে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, অক্সফোর্ড, তুরিন, তুরিনজেন, তিউনিস ও আলজিয়ার্সে সংরক্ষিত রয়েছে। মিসরের লাইব্রেরিতে মোস্তফা পাশার সংগৃহিত পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর এক কপি আত্মচরিত (আর-রিসালা আল-তারিফ) সংরক্ষিত আছে। কয়েকটি গ্রন্থাগার ও অনেক সংগ্রাহকের পক্ষ থেকে এই আত্মচরিত বেশ কয়েকবার নকল করে নেওয়া হয়েছে।[৯৯]

---

[৯৮] আখ্তার-উল্-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-৩৯।

[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুন রচিত মুকাদ্দিমার মূল্যায়ন

ইবনে খালদুন রচিত মুকাদ্দিমা পাঠ করে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরাই তাঁকে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইউরোপের অনেক ঐতিহাসিক, দার্শনিক, নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী রয়েছেন যাঁরা খালুদনের অবদানকে নানাভাবে পর্যালোচনা করেছেন। নিম্নে তাঁদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের মতামত তুলে ধরা হল।

চতুর্দশ শতকের লেখকদের উক্ত ধ্রুপদী গ্রন্থ ইউরোপে অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস তত্ত্বের ভিত্তি রচনা করেছে। তাঁদের মতে, এক্ষেত্রে ইবনে খালদুনের যেমন কোন পূর্বসূরি ছিলেন না, তেমনি তাঁর কোন উত্তরসূরিও নেই। এ প্রসঙ্গে মুকাদ্দিমা-র নির্বাচিত অংশের অনুবাদক বৈরুতে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক চার্লস ইসাবি-র নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্বৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেন: "We must accept the work of the fourteenth century Arab philosopher and historian, Ibn Khaldun. The prolegomena to his Universal History are remarkable in expounding a theory of history which anticipates that of the European eighteenth century writers, and even Marx; but also as the work of an exceptional man who had neither predecessors nor followers."[১০০]

অর্থাৎ, চতুর্দ্দশ শতকের আরব দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন-এর গবেষণাকর্মকে আমরা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারি। সর্বজনীন ইতিহাসের তাঁর মুখবন্ধ ইতিহাসতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করেছে, যাতে এমনকি, উনিশ শতকের কার্ল মার্কসসহ আঠারো শতকের ইউরোপীয় লেখকদের ধ্যান-ধারণার পূর্বাভাব পাওয়া যায়। খালদুন সত্যিই ছিলেন একজন ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। চার্লস ইসাবি তার বক্তব্যের সমর্থনে তার উক্ত গ্রন্থের পূর্বাভাষের পূর্বে পাশ্চাত্যের তিনজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মতামত তুলে ধরেছেন। এখানে তাঁদের বক্তব্যে পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপে উদ্বৃত করলে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। প্রমত,

---

[১০০] Charles Issawi, An Arab Philosophy of History, John Murry (London: 1963), p. 99.

আরনল্ড জে, টয়নবি বলেছেন: "...in the prolegomena (Muquaddimat) to his Universal History he (Khaldun) has concieved and formulated a phiolsophy of history which is undoubtedly the greatest work of its kind that has ever yet been created by any kind in any time or place. It was his single brief 'acquiescence' from a life of practical activity that gave Ibn Khaldun his opportunity to cast his creative thought into literary shape."[১০১] অর্থাৎ ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমা গ্রন্থের মুখবন্ধে ইতিহাসের দর্শন সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত ও তার রূপরেখা প্রণয়ন করেন তা নিঃসন্দেহে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সর্বোত্তম কর্ম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এটি ইবনে খালদুনের বাস্তব কর্মময় জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনমাত্র, যা পাঠকদের পরিতৃপ্ত করে। খালদুন তাঁর উক্ত গ্রন্থে সৃষ্টিশীল চিন্তাকে সাহিত্যের স্বরূপে উদ্ভাসিত করার অপূর্ব সুযোগ পেয়েছিলেন।

জর্জ সার্টন-এর মতে, "Ibn Khaldun was a historian, politician, sociologist, economist, a deep student of human affairs to analyse the past of mankind in order to understand its present and its future. Not only is he the greatest historian of the Middle Ages, but one of the first phiolsophers of history, a forerunner of Machiavelli, Bodin, Vico, Comte...what is equally remarkable, Ibn Khaldun ventured to speculate on what we should call to-day the methods of historical research..." অর্থাৎ, ইবনে খালদুন একজন ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং মানুষের কর্মকাণ্ডের গভীর অনুসন্ধিৎসু ছাত্র। তিনি মানবজাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উপলব্ধির জন্য এর অতীতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বিশেষভাবে ব্রতী হয়েছিলেন। খালদুন কেবল মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকই ছিলেন না। তিনি মেকিয়াভেলি, বোঁদে, ভিকো এবং সমাজবিজ্ঞানের আনুষ্ঠানিক জনক আগস্ট কোঁৎ-

---

১০১ Arnold G. Toynbee, A Study of History, VoII-II (London: Oxford University Press, 1935), Quoted in Charles Issawi, An Arab Philosophy of History, John Murry (London: 1969), p. IX-X.

এরও ছিলেন অগ্রপথিক। এছাড়া, যেটি সমভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে, খালদুন সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতির বিকাশ সাধনে সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

রবার্ট ফ্লিন্ট বলেন, "He was admirale alike by his originality and Sagacity, his profundity and his comprehensiveness,"[১০২] অর্থাৎ, প্রাচীন গ্রিক ও রোমান দার্শনিক প্লেটো, এরিস্টটল এবং অগাস্টিন-এর কেউই খালদুনের সমকালীন ছিলেন না এবং অন্যরা এমন কি তাঁর সাথে উল্লিখিত হওয়ারও অযোগ্য। ইতিহাসের দর্শনচর্চায় খালদুনের মৌলিকত্ব, প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য এবং সামগ্রিকতা তাঁকে সমভাবে প্রশংসতি করেছে।

অস্ট্রিয়ার প্রাচ্যবাদী সামাজিক ঐতিহাসিক ব্যারন ভন ক্রেমার (Baron Von Kremer) সংস্কৃতি তথা সভ্যতার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে খালদুনের রচনাসমূহের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত তাঁর "Ibn Khaldun and his history of the civilization of the Muslim Empire" নামক এক বিখ্যাত প্রবন্ধে খালদুনের অবদান বিশ্লেষণ করেছেন। ইংরেজি ভাষায় অনূদিত তাঁর উক্ত নিবন্ধে ক্রেমার দেখিয়েছেন খালদুন কিভাবে মুসলিম সভ্যতার উত্থান-পতন পর্যালোচনা করেছেন। ক্রেমারের মতে, খালদুন অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যাকে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। ক্রেমার আরো বলেছেন, খালদুন যেভাবে মানব সভ্যতার বিভিন্ন স্তর চিহ্নিত করেছেন তা আসলে সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় ছাড়া অন্য কিছু নয়। তবে ইবনে খালদুনকে সংস্কৃতির ইতিহাসবিদ হিসেবে আখ্যায়িত করার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ক্রেমারের বিবেচনায় খালদুনের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতির মৌলিক প্রস্তাবসমূহের বিকাশ সাধন, যা পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা অনুসৃত 'ঐতিহাসিক পদ্ধতি' (Historical Method) তথা 'ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান' (Historical Sociology) নামে অভিহিত হয়েছে।

---

১০২ Robert Flint, History the Philosophy of History (London: Gohn Murray, 1969); Issawi, 1969, p.x

ডাচ পণ্ডিত টি.জে. দ্যা বোয়ার (TJ. De Boer)-এর মতে ইবনে খালদুন মূখ্যত দার্শনিক। তাঁর দর্শনচিন্তার আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, খালদুন নিজে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও কখনো রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন না। উল্লেখ্য, এরই নাম 'ইহজাগতিকতা', যাকে আধুনিক রাজনৈতিক পরিভাষায়, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' (Secularism) বলা হয়।[১০৩] তাঁর মতে, ইবনে খালদুনের বৈজ্ঞানিকতত্ত্বসমূহ ধর্মের দ্বারা কখনো প্রভাবিত হয়নি; বরং এরিস্টটল এবং প্লেটোর যুক্তিশীল ভাবাদর্শের দ্বারাই তাঁর ধ্যান-ধারণা অধিকতর রূপায়িত হয়েছিল। কিন্তু ইবনে খালদুন এমন একটি নতুন দার্শনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলেন, যা এরিস্টটলের চিন্তায় কখনো আসেনি। এর কারণ খালদুন তাঁর ইতিহাসতত্ত্ব থেকে ঐ দার্শিনিক ব্যবস্থার বিকাশ সাধন করতে চেয়েছিলেন, যা সামাজিক জীবন ভিন্ন অন্য কিছু নয়। অধিকন্তু, সমাজের অভ্যন্তরেই মানুষের বৌদ্ধিক সংস্কৃতিরও উন্মেষ ঘটে। বোয়ার তাঁর খালদুন-সমীক্ষণ যেভাবে সম্পন্ন করেছেন তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে: "Ibn Khaldun's hope to have a successor who would continue his research was realished, but not in Islam. Being without a predecessor he remained also without a successor".[১০৪] অর্থাৎ ইবনে খালদুন চেয়েছিলেন তাঁর কোন উত্তরসূরির দ্বারা তাঁর সূচিত গবেষণা বাস্তবায়িত হোক; কিন্তু সেটি সম্ভব হয়নি। এজন্য পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মতে তাঁর যেমন কোন পূর্বসুরি ছিলেন না, তেমনি তাঁর কোন উত্তরসূরিও নেই। তিনি জ্ঞানের জগতে এককভাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি হিসেবে রয়ে গেলেন।

অপরদিকে পোল্যান্ডের সামাজিক নৃবিজ্ঞানী লুডউইক গামপ্লোভিজ (Ludwig Gumplowicz) ইবনে খালদুনকে একজন প্রকৃত সমাজবিজ্ঞানী হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। তিনি খালদুনের বিভিন্ন তত্ত্বকে পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন তত্ত্বের সাথে তুলনা করেন। তাঁর মতে, সমাজ সমীক্ষার ক্ষেত্রে খালদুন উচ্চ মর্যাদার আসনে

---

১০৩ Mohammad Abdullah Enan, Ibn Khaldun: His Life and Works (New Delhi: Kitab Bhaban, 1997), p. 156.

১০৪ T.J. de Boer, Society and Philosophy in Islam, English Translation (Stuttgart, Deutsche verlagsanstantt, 1901), p. 177-84; Abdullah Enan, Ibn Khaldun, ibid, p. 156-57.

অধিষ্ঠিতঃ “Gumplowicz says that Ibn Khaldun attains the summit of social investigation when he expounds his observations on the reciprocal action of social groups and that these groups themselves are the production of the milieu.”[১০৫] অর্থাৎ, গামপ্লোভিজের বিবেচনায় সামাজিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে খালদুন শীর্ষস্থানের অধিকারী। কারণ তিনি সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের পারস্পরিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন যে, এসব গোষ্ঠী তাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি-প্রসূত। পরিবেশ ও তার ফলাফল সম্পর্কে খালদুনের পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করে যে, তিনি ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) এর পাঁচশ বছর পূর্বে ‘আত্তীকরণ’ (law of assimilation)-এর সূত্র সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ডারউইন তাঁর বিখ্যাত The Origin of Species (1859) গ্রন্থে এ সূত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ইবনে খালদুন সম্পর্কে গামপ্লোভিজের নিম্নোক্ত উপসংহারমূলক মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণঃ “I wanted to show that long before not only Auguste Comte, but also Vico, whom the Italians wanted forcibly to consider as the first European Sociologist, a pious Muslim studied with perspicacity the social phenomena, and expressed profound ideas on this subject. What he wrote is what we term today as ‘Sociology”.[১০৬] অর্থাৎ, ইবনে খালদুন শুধু আগস্ট কোঁতের অনেক আগেই সমাজবিজ্ঞানের সূচনা করেননি, একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম হলেও ইটালীয় সমাজ দার্শনিক ভিকোরও (যাকে তাঁর স্বদেশীরা জোর করেও ইউরোপের প্রথম সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে বিবেচনা করার পক্ষপাতী) পূর্বে সামাজিক প্রপঞ্চসমূহকে যেভাবে স্বচ্ছতার সাথে অধ্যয়ন করেছেন এবং এসব বিষয়ে তাঁর গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমি সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারি যে, আজ আমরা যাকে ‘সমাজবিজ্ঞান’ বলছি ইবনে খালদুন সে-বিষয়ে আগেই লিখে গেছেন।

---

[১০৫] Abdullah Enan, Ibn Khaldun, ibid, p. 157.

[১০৬] ibid, p. 159.

ফরাসি চিন্তাবিদ এম. মৌনিয়ের (M. Maunier) ১৯১২ এবং ১৯১৭ সালে প্রকাশিত তার দুটি প্রবন্ধে ইবনে খালদুনের ধ্যান-ধারণাকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, ইবনে খালদুন একদিকে দার্শনিক, আর অন্যদিকে অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী। মুকাদ্দিমা গ্রন্থে প্রতিফলিত ইবনে খালদুনের চিন্তা সম্পর্কে যে ধারণা তিনি ব্যক্ত করেছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ "It is a great mixture of universal laws, and an encyclopaedia of the sciences of the age. Is method is particularly excellent and reveals a true scientific spirit. (His) ideas... are based on analytic observation of events and are the mirror of facts." [১০৭] অর্থাৎ- মুকাদ্দিমা গ্রন্থটি হচ্ছে সর্বজনীন সূত্রের এক অনুপম সংমিশ্রণ এবং সে যুগের একটি জ্ঞানকোষ বিশেষ। একটি সমাজবিজ্ঞান বিবিধ বিষয়ের একটি পরিপূর্ণ পাঠ। মুকাদ্দিমা রচনায় একটি চমৎকার পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। কারণ তাতে সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভাত হয়েছে। যেহেতু তাঁর ধ্যান-ধারণাসমূহ ঘটনাবলির বিশ্লেষণাত্মক পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু এসবকে ঘটনার দর্পণ হিসেবে গণ্য করা যায়।

---

[১০৭] Abdullah Enan, Ibn Khaldun, ibid, p. 159.

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজের পরিচিতি, প্রয়োজনীয়তা ও ক্রমবিকাশ

১ম পরিচ্ছেদ
সমাজের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

২য় পরিচ্ছেদ
সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের পরিচিতি ও উদ্ভব

৩য় পরিচ্ছেদ
সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ

৪র্থ পরিচ্ছেদ
সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে দার্শনিকদের ধারণাসমূহ

১ম পরিচ্ছেদ
সমাজের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষ সামাজিক জীব। সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না এবং বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের তাগিদে মানুষকে সমাজে বসবাস করতে হয়। সমাজই মানুষের জন্ম, সমাজেই তার লালন-পালন, তার শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম কর্ম, ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয়। মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তাই সমাজ সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। কারণ সমাজ এবং মানুষ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মানুষবিহীন সমাজের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি না- আবার সমাজবিহীন মানুষের কথা আমরা কল্পনা করতে পারি না। যুগের প্রেক্ষিতে ‘সমাজ’ প্রত্যয়টি নানাভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। সাধারণ অর্থে সমাজ হলো অভিন্ন উদ্দেশ্য প্রণোদিত এমন এক দল লোকের সমাবেশ, যারা পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হয়ে অভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। নিজের প্রয়োজন পূরণ ও সহজ-স্বাভাবিক জীবন যাপনের লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালার মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে মানুষ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-কে নিয়ে মানবজাতির প্রথম পরিবার গঠিত হয় এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি সমন্বয়ে গড়ে ওঠে আদিমতম সমাজ।

সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি

“দুনিয়ার সমস্ত মানুষ একই বংশোদ্ভুত”-এ মতের উপরই সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ

“মানবজাতি আসলে একই সম্প্রদায়; অতঃপর তারা আলাদা হয়ে গেলো।”[১০৮] আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম একজোড়া মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তারপরে সেই জোড়া হতে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্ম হয়েছে। প্রথম দিক দিয়ে একজোড়া মানুষের সন্তানগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত একই দল ও একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোন প্রকার বিরোধ-বৈষম্য তাদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু তাদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল ততই তারা পৃথিবীর নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং এ বিস্তৃতির ফলে তারা অতি স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বংশ, জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ল।

---

[১০৮] আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৯।

আল্লাহ বলেন:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ

"মানবজাতি একই সম্প্রদায় ছিল, এবং (যখন তারা আলাদা হয়ে গেলো) স্বস্তিদানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে আল্লাহ পয়গাম্বরদের প্রেরণ করলেন এবং কোথায় তাদের পার্থক্য এই বিচার করার জন্যে প্রকাশ করলেন সত্যের বাণী।[১০৯] যখন মানুষের মাঝে ভাষা বিভিন্ন হয়ে গেল, পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে অনেক বৈষম্য ও বৈচিত্র দেখা দিল। দৈনন্দিন জীবন যাপনের রীতিনীতিও আলাদা হয়ে গেল এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আবহাওয়ায় তাদের রং, রূপ ও আকার-আকৃতি পর্যন্ত বদলে গেল। এসব পার্থক্য একেবারেই স্বাভাবিক। এসবের দ্বারা মানব সমাজে পারস্পরিক পরিচয় লাভ করা যায় বলে ইসলামও এগুলোকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু পার্থক্য বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে মানব সমাজে বর্ণ, বংশ, ভাষা, জাতীয়তা এবং স্বাদেশিকতরা যে হিংসা-দ্বেষ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, ইসলাম তা কিছুতেই সমর্থন করে না। মানুষ এবং মানুষের মধ্যে শুধু জন্মের ভিত্তিতে উচ্চ-নীচ, আশারফ-আতরফ এবং আপন-পরের যে পার্থক্য করা হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে তা একেবারেই জাহেলিয়্যাত একেবারেই মূর্খতাব্যঞ্জক। ইসলাম সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে সম্বোধন করে বলে যে, তোমরা সকলেই এক মাতা ও এক পিতার সন্তান, তোমরা পরস্পর ভাই ভাই এবং মানুষ হওয়ার দিক দিয়ে তোমরা সকলেই সমান।

সমাজের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষ নিয়েই সমাজ। সমাজ হচ্ছে, 'যে সব সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে আমরা জীবন যাপন করি, সেগুলোর সংগঠিত রূপ। যে সম্পর্ক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক সব দিকেই পরিব্যাপ্ত। সে সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণি ও গোষ্ঠী। সাধারণ সামাজিক স্বার্থরক্ষা ও বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে বাধ্য হয়েই পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মানুষ সমাজ গঠন করেছে।[১১০] সমাজ বিজ্ঞানী জিসবার্ট বলেন, "Society in general consists in the complicated network of social relationship by which every human being is interconnected with

---

১০৯ আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৩।

110 Murtada Mutahari, Society and History, English Translation Mahliqa Qarai (Tehran: Islamic Propagation Organization, 1985), p. 7.

his fellowmen". "সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কে জটিল জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত।"[১১১]

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, "Man is dependent on society for protectin comport, nuture, education, equipment, opportunity and the multitude of definite services which society provides. His birth in society brings with it the absolute need of society itself". "মানুষ তার নিরাপত্তা, সুখ, পুষ্টি, শিক্ষা, উপকরণ, সুযোগ-সুবিধা এবং সমাজের দেয়া বহুমুখী সেবার কার্যের জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল। সমাজে মানুষের জন্মগ্রহণই সমাজের প্রয়োজনীয়তার কথা সূচিত করে।"[১১২]

বাংলা একাডেমির অভিধানে বলা হয়েছে, সমাজ হচ্ছে 'পরস্পর সহযোগিতা ও সহানুভূতির সঙ্গে বসবাসকারী মনুষ্য গোষ্ঠী।[১১৩]

সমাজ বিজ্ঞানী গিডিংস বলেন, "Society is a number of like-minded individuals who know and enjoy their like-mindedness and therefore able to work together for common ends". "সমাজ হলো সমমনোভাবাপন্ন এমন একদল লোকের সমাবেশ, যার সদস্যরা তাদের অভিন্ন মানসিকতা সম্পর্কে জানে এবং সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করে।"[১১৪]

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সন্তুষ্টি, জীবনের নিরাপত্তা, উন্নত জীবন যাপন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে সমাজের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ বিহীন মানুষের অস্তিত্ব চিন্তাই করা যায় না। মানুষ তার অস্তিত্বের প্রয়োজনেই সমাজ গঠন করে, সমাজবদ্ধ জীবন প্রণালী তার জীবনযাপনকে সহজ করে তোলে। এ সমাজ গঠনের উপাদান সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রদার্শনিকগণ বিভিন্ন মতবাদ প্রদান করেন। তাঁরা সমাজ সভ্যতার উদ্ভব, বিকাশ এবং পতনের যৌক্তিক কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করেন।

---

111 P. Gisbert, Fundamentals of Sociology (India: Orient Blackswan Pvt Ltd. 2010), p. 10.

112 R.M Mcive and Page, Society (USA: The Macmillan Company, 1967), p. 8.

১১৩ সম্পাদনা পরিষদ, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৪১৩ বাং), পৃ. ১১২২।

114 F. H. Giddings, Principles of Sociology (India: Cosmo Publications, 2004), p. 5.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের পরিচিতি ও উদ্ভব

সামাজিক বিজ্ঞান ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের দু'টি ধারা। একটি হলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অন্যটি সামাজিক বিজ্ঞান। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষভাবে সমাজ ও সমাজের মানুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। সামাজিক বিজ্ঞান মানুষকে সামাজিক জীবন হিসেবে বিবেচনা করে তার আলোচ্য ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করে যার মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রা পরিচালনায় সরাসরি কিছু বিষয় অন্তর্ভূক্ত, যেমন– সমাজবিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পৌরনীতি ও সুশাসন, অর্থনীতি, জনবিজ্ঞান প্রভৃতি। সামাজিক বিজ্ঞানের এ সকল শাখা বা বিষয়গুলো স্বতন্ত্রভাবে রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষের বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে। এর মধ্যে ব্যক্তি, সমাজকাঠামো, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সম্পদ, নেতৃত্ব, মানবজাতির উৎপত্তি, বিকাশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য যে, স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি শাখার আলোচনার ক্ষেত্র আলাদাভাবে বিদ্যমান থাকলেও সমষ্টিগতভাবে এরা সামাজিক বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে পরিচিত। তাই একই পরিবারের সদস্যের মতো সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ পৃথক হওয়া সত্ত্বেও এসব শাখা পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ।[১১৫]

সামাজিক বিজ্ঞান হলো সমাজের সামগ্রিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন সেখানে সমাজের বিভিন্ন দিক, যেমন, সমাজের বিকাশ, সমাজ কাঠামো, সামাজিক কার্যাবলি, সামাজিক স্তর বিন্যাস, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান, সামাজিক সম্পর্ক ও আচরণ, সামাজিক গতিশীলতা, সামাজিক পরিবর্তন ও এর ধারা, আইন প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়।[১১৬]

সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

সমাজবিজ্ঞান বলতে 'সমাজ বিষয়ক বিজ্ঞান', 'সমাজের বৈজ্ঞানিক নিরিখ', 'মানবিক সম্পর্কের পর্যালোচনা, 'সামাজিক সম্পর্কের বিজ্ঞান' এবং মানবের সমাজবদ্ধ থাকার প্রবণতা ও সম্মিলিত হতে উদ্ভূত সমাজের বৈশিষ্ট্য আলোচনা ও পর্যালোচনার বিজ্ঞান বোঝায়।

---

১১৫ তৌফিক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর ও হারুন-অর-রশিদ, সমাজকর্ম, ১ম পত্র (ঢাকা: অক্ষরপত্র প্রকাশনী, ২০১৭ খ্রি.), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৩৮।

১১৬ Frankin Giddings, Principal of Sociology, 1908, p. 25; Kingsley Davis, Human Society, p. 9-10.

সমাজবিজ্ঞান যেহেতু গোটা সমাজকে নিয়ে অধ্যয়ন করে তাই সমাজবিজ্ঞান কি তা এক কথায় ব্যাখ্যা করা কঠিন। উৎপত্তিগত অর্থে সমাজবিজ্ঞান (Sociology) শব্দটি ল্যাটিন 'Socious' এবং গ্রিক 'Logos' শব্দ থেকে এসেছে। যা অর্থ যথাক্রমে সমাজ ও জ্ঞান বা বিজ্ঞান। অর্থাৎ শাব্দিক অর্থে 'Sociology' হচ্ছে সমাজের বা সামাজিক সম্পর্কের বিজ্ঞান। সুতরাং সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ যে শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় তাকে সমাজবিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যায়।[১১৭] সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কে Oxford Advanced Learners Dictionary-তে বলা হয়েছে,

"Social science is a particular subject connected with the study of people in society" "সামাজিক বিজ্ঞান হলো একটি নির্দিষ্ট বিষয় যা সমাজের মানুষকে নিয়ে পর্যালোচনা করে।"[১১৮]

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক কিংসলে ডেভিস তাঁর 'Human Society' গ্রন্থে বলেন, "Sociology is a special discipline devoted to the way in which societies achieve their unity and continuity and way in which they change." অর্থাৎ সমাজ কিরূপে তা ঐক্য, সংহতি ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এবং কিরূপে তা পরিবর্তিত হয়, সমাজবিজ্ঞান বিশেষভাবে তারই অনুশীলন করে। এখানে দেখা যাচ্ছে ডেভিস সমাজবিজ্ঞান 'General Science of Society' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। যার মূল আলোচ্য বিষয় হিসেবে সামাজিক সংগঠন সামাজিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, মানুষ ও সমাজ এবং সামাজিক পরিবর্তনের চিহ্নিত করেছেন।

সমাজ বিজ্ঞানী গিন্‌সবার্গ (Ginsberg) সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে বলেন, It is concerned with all that happens to human beings in virtue of their relation to each other". অর্থাৎ মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধহেতু তাদের যা কিছু ঘটে সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।"[১১৯]

---

১১৭ অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক মতিলাল ও অন্যান্য, সমাজদর্শন (কলকাতা, ২০০১ খ্রি.), চতুর্দশ সংস্করণ, পৃ. ৩।

১১৮ Oxford Advanced Learners Dictionary, Oxford University Press, 7th Edition, 2006, p-1452.

১১৯ Morris Ginsberg: Reason and Unreason in Society, p. 1.

আরনল্ড ডব্লিউ. গ্রীন বলেন, ‘Sociology is thd synthesizing and generalizing science of man in all his social ralationships’[১২০]

সমাজ বিজ্ঞানী কিম্বাল ইয়ং এবং রেমণ্ড ডব্লিউ.ম্যাক-এর ভাষায়: ‘সমাজ বিজ্ঞান হল- সামাজিক জীবনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।’[১২১]

সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন ও নিমকফ্ তাঁদের ‘ A Handkbook of Society’ নামক গ্রন্থে বলেন, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজজীবনের বৈজ্ঞানিক অধ্যায়। সমাজবিজ্ঞানী ফ্রাংকলিন এইচ. গিডিংস তাঁর ‘Principles of Sociology’ নামক গ্রন্থে বলেন, সমাজবিজ্ঞান মানুষের মানসিক সংযোগের বিজ্ঞান। গিডিংস তাঁর এ সংজ্ঞায় সমাজবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছেন।

সমাজ বিজ্ঞানী মরিস জিন্সবার্গ ব্যাপকতর অর্থে মানবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সম্পর্কের উপর গুরুত্বারোপ করে সমাজ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, ‘সমাজ বিজ্ঞানে মানব সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া এবং পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তার অবস্থা ও পরিণতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়।’[১২২]

জার্মান সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) বলেন: “সমাজ বিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যাতে সামাজিক কার্যাবলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর প্রকৃতি ও ফলাফলের কার্যকারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ধারণা লাভে সক্ষম হই।”[১২৩]

সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্ভব

মানুষের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল প্রকার সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য প্রথমতঃ একটি মাত্র সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। আর এটি বহুদিন চলতে থাকে। সে যাই হোক, কালক্রমে সমাজ জীবনের বিশেষ বিশেষ দিক দিয়ে ‘অনন্য সাধারণ সামাজিক বিজ্ঞান (Single Science of Society) থেকে একাধিক সামাজিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়; যেমন,

---

১২০ Arnold W. Green, Sociology: An Analysis of life in Modern Society (New York, St. Louis, 1968), Fifth Edition, p. 2.

১২১ Kimball Young and Raymond W. Mack, Principles of Sociology, Eurasia Publishing house (Ned Delhi), p. 1.

১২২ Moris Ginsberg, Sociology, Home University Library, (Oxford, 1965), p. 1.

১২৩ Max Weber, Economy and Society, Totowa, N.J. Bedminister Press, 1968, p. 4.

অর্থনীতি (Economics), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science), সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান (Cultural Anthropology) এবং সমাজবিজ্ঞান (Sociology)। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও বলা হয় যে, এসব সামাজিক বিজ্ঞান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল, তবুও এটা ঠিক যে, আধুনিককালে এসব সামাজিক বিজ্ঞানের প্রত্যেকটিতে মানব জীবনের এক একটি বিশেষ দিক নিয়ে পাঠ করা হয়, যেমন, অর্থনীতিতে মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় পার্থিব কার্যকলাপ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মানুষের নিরাপত্তার উপযোগী রাষ্ট্রীয় আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে আলাদাভাবে পাঠ করা হয়। অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞানে শুধুমাত্র সামাজিক সম্পর্ককে পাঠ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সমাজবিজ্ঞানে অন্য সকল সামাজিক বিজ্ঞানের সমগ্র বিষয়বস্তু নিয়ে আলেচনা করা হয়। অর্থাৎ মানুষের সকল প্রকার যৌথ কার্যকলাপ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানে নিজস্ব পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণের প্রেক্ষিতে পাঠ করা হয়।[১২৪]

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও প্রয়োজনীয়তা

সমাজ সম্পর্কিত বহুবিধ জ্ঞানের সমন্বিত রূপই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞানের পরিধি এবং বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ, ব্যক্তি বা সমাজজীবনের এমন কোন দিক নেই, যা সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আওতায় আনা যায় না। এভাবে দেখা যায় যে, ব্যক্তির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক, ধর্মীয় প্রভৃতি মানুষের জীবনের প্রধান বিষয়গুলোই সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। বস্তুত: সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির অন্য নাম। উক্ত পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মানুষের আচরণ ও কার্যাবলির যথারীতি বিশ্লেষণ অবশ্যই সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত। মূলত মানুষের আচরণ বলতে যা কিছু বুঝায় সবই সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। যেসব বিজ্ঞান সমাজ-জীবনে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে সেগুলিকে সামাজিক বিজ্ঞান বলা হয়। যেমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতি। সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে সমাজবিজ্ঞানের প্রভেদ রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানগুলি সমাজ-জীবনে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের বিভিন্ন দিক পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করে। সামাজিক বিজ্ঞান মানুষের কার্যকলাপের সামগ্রিক আলোচনা করে না। সমাজ-জীবনের সামগ্রিক আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞান। অর্থাৎ মানব-জীবনের পারস্পরিক সম্বন্ধের সামগ্রিক আলোচনা করাই

---

[১২৪] স্যামুয়েল কোনিগ, সমাজবিজ্ঞান, অনুবাদ, রঙ্গলাল সেন (ঢাকা: বই বিতান, ১৯৯৭ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ১৫-১৬।

সমাজবিজ্ঞানের কাজ।[১২৫] সমাজবিজ্ঞানে সমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াবলির বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়। এজন্য সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু অনেক বিস্তৃত। বর্তমান পরিবর্তনশীল সমাজ কাঠামো সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হলে মানব জীবনের প্রতিটি স্তরেই সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন অপরিহার্য।

সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কারণ, সমাজের লোকেরা কিভাবে জীবন-যাপন করে তাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সম্পর্ক সঠিক জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন রয়েছে।[১২৬] আমরা যদি সমাজের মানুষের রীতিনীতি, সামাজিক কার্যাবলী স্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে চাই, তবে সমাজবিজ্ঞান থেকে আমাদের সাহায্য নিতে হবে। তাই সহজেই অনুমান করা যায় যে, সমাজ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হলে সমাজবিজ্ঞানের প্রয়াজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে। তাছাড়া, নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলেও সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।[১২৭]

সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি

সামাজিক বিজ্ঞান ঐতিহ্যগতভাবে এটি একটি প্রাচীনতম বিজ্ঞান বলে স্বীকৃত। সমাজ জীবনের সূচনা লগ্ন থেকেই সমাজ সংক্রান্ত আলোচনা ও গবেষণা শুরু হয়েছে। সমাজ সম্পর্কিত বহুবিধ জ্ঞানের সমন্বিত রূপই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। মানুষের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভাবনা আদিকাল থেকে চলে আসছে। আদিতে সকল রকম চিন্তা-চেতনা দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্ত মানবচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারায় দর্শনশাস্ত্রের সীমানা পেরিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে। এভাবে মানুষের বিচিত্র জ্ঞানের শাখা হিসেবে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, মনোবিদ্যা, ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।

সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। এঁদের মধ্যে সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খ্রি.পূ.), প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রি.পূ.), এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২

---

১২৫ অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত ও অন্যান্য, সমাজদর্শন (কলকাতা: ২০০১ খ্রি.), চতুর্দশ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ১।

১২৬ Kingsley Davis, Human Society (New York: Macmillan), p. 158.

১২৭ H Elmar Bames, Social Institutions (New York: Prentice Hall, 1946), p. 34.

খ্রি.পূ.)[১২৮], কৌটিল্য, ইবনে খালদুন, ম্যাকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রি.), ভিকো (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.), সেন্ট সাইমন, অগাস্ট কোঁত[১২৯]-এর মতবাদ উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত সমাজবিজ্ঞানীদের অবদানে সমাজবিজ্ঞান ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান পণ্ডিতদের লেখায় সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনা সমৃদ্ধি লাভ করে। গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটো (Plato) এবং এরিস্টটল (Aristotle)-এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

---

১২৮ এরিস্টটল ছিলেন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে গ্রীসের স্টাগিরা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্লেটোর শিষ্য এবং মহাবীর আলেকজাণ্ডারের (মৃ. খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩) শিক্ষক। অ্যারিস্টটলের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৭০টির অধিক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল– পোয়েটিকস্, মিটিওরলজি, ফিজিক্স, মেটাফিজিকস্ প্রভৃতি। অ্যারিস্টটল বর্তমান পর্যন্ত বিশ্বের সর্বত্র সাহিত্য তাত্ত্বিকদের নিকট স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে গণ্য। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ অব্দে আত্মহত্যা করে ৬২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। (দ্র. The New Encyclopedia Britannica, Vol. I, p. 556; Aristotle: The New Encyclopedia Britanica, Chicago, 1973).

১২৯ অগাস্ট কোঁৎ (Auguste Comte)ঃ ফরাসি চিন্তাবিদ ১৭৯৮ সালের ১৯ জানুয়ারি ফ্রান্সের মন্টোপিলয়ার শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া অগাস্ট কোঁত-এর সমাজ সম্পর্কিত চিন্তা ও তত্ত্বকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। ফরাসী বিপ্লব সামন্তবাদের অবসান ঘটিয়ে শ্রেণিবৈষম্যজনিত সমাজব্যবস্থা কাঠামো ভেঙ্গে দেয়। সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা ও অসংগতি বিরাজ করতে থাকে। অগাস্ট কোঁৎ তৎকালীন ফ্রান্সের বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা পর্যবেক্ষণ করে সমাজ পুর্ণগঠনের চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তার সাথে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী সেইন্টমনের পরিচয় ঘটে এবং তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হন। কোঁৎ-এর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে Positive Philosophy এবং Positive Polity বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৯ সালে তিনি 'Sociology' প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন। তার প্রধান তত্ত্বগুলোর মধ্যে ত্রয়স্তর সূত্র, দৃষ্টবাদ এবং বিজ্ঞানের ক্রমসোপান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোঁৎ ১৮৫৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ

পাশ্চাত্য সমাজে সর্বপ্রথম গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করেন দার্শনিক প্লেটো তাঁর 'The Republic' গ্রন্থে এবং এরিস্টটল 'The Politics' গ্রন্থে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে বর্ণনা দেন। তারা সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে অধিকতর বাস্তববাদিতার পরিচয় দিয়েছেন। প্লেটোর Republic গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে এরিস্টটল যুক্তিতর্কের মাধ্যমে একটি আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থা রূপায়ণের চেষ্টা করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতের কৌটিল্য রচিত 'অর্থশাস্ত্র' নামক গ্রন্থ তৎকালীন সমাজ সম্পর্কের পর্যালোচনা দেখতে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সেময়ে ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও আইন-কানুন কি ছিল সে সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ফলিত ধ্যান-ধারণা রয়েছে। উল্লেখ্য, কৌটিল্যর আরও দুটি নাম রয়েছে, যথা- চাণক্য ও বিষ্ণুগুপ্ত। তবে খ্রি.পূর্ব ৪র্থ শতকে রচিত অর্থশাস্ত্রের লেখক হিসাবে কৌটিল্য নামটিই বিজ্ঞ সমাজে অধিকতর পরিচিত। কৌটিল্য ছিলেন প্রাচীন ভারতের প্রথম সম্রাট মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের[১৩০] প্রধানমন্ত্রী। তার অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থটি চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য শাসনের প্রেক্ষাপটে প্রণীত। ঐ গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের সমাজ কাঠামো। (যে 'সমাজ কাঠামো' সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়) অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে বিধৃত হয়েছে।[১৩১] এছাড়া তৎকালীন ধর্মীয় পুস্তকাবলি বিশেষতঃ উপনিষদ, সূত্র ও পুরান ভারতের প্রাচীনকালের সামাজিক চিন্তাধারার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এসকল গ্রন্থ পাঠ করে দর্শন, সামাজিক আইন, সামাজিক ইতিহাস, ধর্ম, রাজনীতি ও ন্যায়পরাণয়তায় প্রাচীন ভারতীয়দের অবদানের সাথে সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।[১৩২]

---

[১৩০] চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৩২৪-৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ভারতের সম্রাট ছিলেন। মন্ত্রী চাণক্যের আর্থিক সাহায্য ও সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল বাহিনী গড়ে তোলেন এবং নন্দবংশের শেষ দুর্বল রাজাকে ধ্বংস করে ৩২৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মগধ অধিকার করেন। পাঞ্জাব থেকে বিহার, উড়িষ্যা, বাংলাদেশ, অন্ধ্র কর্ণাটক পর্যন্ত বিরাট ভূভাগের একচ্ছত্র সম্রাট হন। ইতিপূর্বে ভারতে এত বড় সাম্রাজ্য আর ছিল না। মৌর্যযুগ সম্পর্কে অনেক তথ্য গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে পাওয়া যায়।

[১৩১] ড. মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান ও অন্যান্য, সম্পাদনায়: ড. রঙ্গলাল সেন, সমাজবিজ্ঞান, হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম, ওপেল স্কুল, গাজীপুর, পুনর্মুদ্রণ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৮-৯।

[১৩২] ফজলুর রশীদ খান, সমাজবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব (ঢাকা: শিরীন পাবলিকেশন্স, ১৯৭৩ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১২।

মধ্যযুগের সমাজতাত্ত্বিক ও মুসলিম দার্শনিক 'আল-ফারাবী'[১৩৩]র লেখায় সমাজ বিষয়ে মতামত পাওয়া যায়। ফারাবী মানুষের প্রকৃতি, মানবজীবনের উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিকাশ, মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ, কল্যাণকামী রাষ্ট্রের স্বরূপ, আদর্শচ্যুত রাষ্ট্রের শ্রেণিবিন্যাস, নেতা ও নাগরিকের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা সম্পর্কে তিনি বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তবসম্মত রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন।

আল-ফারাবী সমাজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন: "মানুষ এমনভাবে সৃষ্ট যে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে অনেক কিছুর দরকার হয়। কিন্তু সে একা সেই প্রয়োজন মেটাতে পারে না। তাই প্রয়োজনের খাতিরে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সমাজ। বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বিভিন্ন ধরনের সমাজ গঠিত হয়। সমাজ যত বড় হয়, মানুষ তত বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে। মানুষের সমাজ ঘরবাড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের ধারায় গড়ে ওঠে বস্তি, গ্রাম, শহর ও নগর। মানুষ সমাজের উন্নয়নকল্পে কাজ করে, যা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রে পরিণত হয়। রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে জাতি (উম্মাহ) বলে আখ্যায়িত করা হয়। ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ু, আচার-আচরণ এবং ভাষার ভিত্তিতে এক জাতিকে অন্য জাতি থেকে পৃথক করা যায়।[১৩৪] মানব সমাজকে তিনি প্রধানত দুই প্রকারে ভাগ করেন যথা, (ক) অপূর্ণ সমাজ ও (খ) পূর্ণ সমাজ। একটি পূর্ণ সমাজ রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে। পূর্ণসমাজ বা রাষ্ট্র আবার তিন ধরনের হতে পারে। যথাঃ বড়, মধ্যম ও ছোট। যখন সারা বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে মানব কল্যাণের জন্যে সুসংঘবদ্ধভাবে কাজ করে তখন গড়ে ওঠে বৃহত্তম বিশ্ব রাষ্ট্র। মাঝরি ধরনের সংগঠন বা রাষ্ট্র হচ্ছে সাম্রাজ্য ও খিলাফত, যা পৃথিবীর কোনো বৃহত্তর অংশে স্থাপিত হয়। আর নগরের জনসমষ্টি নিয়ে গঠিত হচ্ছে সবচেয়ে ছোট রাষ্ট্র। গ্রাম, বস্তি বা কোনো রাজপথভিত্তিক সংগঠনকে বলা যেতে পারে অপূর্ণ সমাজ।

---

১৩৩ আবু নসর মুহম্মদ বিন মুহম্মদ আল ফারাবী প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানী, মহাবিশ্বতত্ত্ববিদ, যুক্তিবিদ। পদার্থ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতিতে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। পদার্থ বিজ্ঞানে তিনিই 'শূন্যতা'-র অবস্থান প্রমাণ করেছিলেন। তিনি ৮৭২, মতান্তরে ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তুর্কিস্তানের অন্তর্গত 'ফারাব' নামক শহরের নিকটবর্তী 'আল ওয়াসিজ' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

১৩৪ Al-Farabi, Kitab al-Siyasah al-Madaniyyah, Op.Cit., p.39; Al-Farabi, Kitab are'ahl al-Madinah al-Fadilah, 3rd ed. Bir Nasir Nadir, (Beirut, 1973) p. 61.

ভারতে পাঠান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আগে, আবু রাইয়ান আল-বেরুনী (৯৭৩-১০৪৮ খ্রি.)[১৩৫] দশম-একাদশ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় সমাজের একটি অতি নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন। আধুনিক যুগের ভারতীয় লেখক নীরোদ চন্দ্র চৌধুরী আল-বেরুনী অংকিত চিত্রটিতে ভারতীয় সমাজের এক অতি নিঁখুত চিত্র পাওয়া যায় বলে দাবি করেছেন। তার লিখিত An Autobiography of An Unknown Indian গ্রন্থে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়ে বর্তমান ভারতীয় সমাজের সাথে তার আশ্চর্য মিল আছে তিনি তা দেখিয়েছেন।[১৩৬]

আল- বরুনীর পর ভারতীয় সমাজ বিশ্লেষণে আবুল ফজলের[১৩৭] 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে মোগল সম্রাট আকবর[১৩৮] প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের যে তথ্য নির্ভর আলোচনা আছে তাঁকে বর্তমান যুগের Statistical approach পরিসংখ্যান জাতীয় পদ্ধতির পূর্বাভাস বলা যেতে পারে।[১৩৯] এ গ্রন্থ রচনার মধ্যদিয়ে তিনি নিঃসন্দেহে সামাজিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের নজির রেখে গেছেন। তার এই অবদান পাকভারত উপমহাদেশের সমাজতত্ত্বের পদ্ধতিগত ক্রমবিকাশ আলোচনায় বিশেষভাবে সহায়ক।[১৪০]

ষোড়শ শতকের অন্যতম চিন্তাবিদ নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি (Niccolo Machiavelli) তাঁর 'The Prince' নামক গ্রন্থে একজন শাসকের গুণাবলী এবং রাষ্ট্রের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী শাসকের যে কার্যাবলির বাস্তবধর্মীয় সুপারিশ করেন।

---

১৩৫ আবু রায়হান মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আল-বেরুনী ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, গণিত, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, দিনপঞ্জির তালিকা ও ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্বের অধিকারী। তিনিই সর্বপ্রথম প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ করে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

১৩৬ নাজমুল করিম, সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৩ খ্রি.) ৫ম সংস্করণ, পৃ. ২৯।

১৩৭ আল্লামা আবুল ফজল ইবনে মোবারক ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আগ্রাতে জন্মগ্রহণ করেন। মোঘল সম্রাট আকবরের প্রধানমন্ত্রী। বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ 'আকবরনামা'র লেখক। তিনখণ্ডে রচিত এ গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ড 'আইন-ই-আকবরী' নামে পরিচিত। ১৬০২খ্রি. তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৩৮ মোগল বংশের তৃতীয় সম্রাট আকবর ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার দীর্ঘ শাসনামলে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) সর্ব ভারতব্যাপী এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলে ছিলেন যা ইতোপূর্বে তুর্কি, আফগান কোন আমলেই ছিল না। অবশেষে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

১৩৯ নাজমুল করিম, সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

১৪০ P. Gisbert, Fundamentals of Sociology (India: Orient Blackswan Pvt Ltd. 2010), p. 15.

ম্যাকিয়াভেলি যে দর্শন প্রচার করেছেন তার প্রধান ভিত্তি হলো মানব প্রকৃতি ও মানব মনোভাব। তার মতে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে খারাপ। মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তার থেকে সবলতর কোনো শক্তির দ্বারা বাধ্য না হলে সে ভালো কিছু করতে চায় না। মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা এবং কলহপ্রিয়তা বিদ্যমান। এক কথায় মানুষের লোভ-লালসা সীমাহীন, যে কারণে মানুষের মধ্যে সর্বদাই দ্বন্দ্ব-কলহ বিদ্যমান এবং আইন দ্বারা ব্যাহত না পর্যন্ত মানুষ গোটা সমাজজীবনকেই নৈরাজ্যজনক অবস্থায় পরিণত করতে চায়। ম্যাকিয়াভেলির পরে একই যুগে আরেকজন উল্লেখ্যযোগ্য চিন্তাবিদ হলেন টমাস মূর (Thomas Moore) তিনি তার 'Utopia' (1515) নামক গ্রন্থে মানুষের প্রাত্যহিক সামাজিক সমস্যার সমাধান করে একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। তার মতে, প্রকৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলাকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমাজব্যবস্থায় গড়ে তোলা সম্ভব।

ইতালির দার্শনিক জিয়ামবাতিস্তা ভিকো (Giambattista Vico) পাশ্চাত্যের প্রথম ইতিহাস দর্শনের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেন, যার নাম দিয়েছিলেন নববিজ্ঞান (The New Science)। তিনি নববিজ্ঞানে জাতিসমূহের সাধারণ প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। ভিকোর বিশ্বাস ছিল মানুষের উপযুক্ত গবেষণার ক্ষেত্র হবে মানুষ। তিনি এটাও মনে করতেন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলি বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার উপযুক্ত বিষয়। ভিকোর মতে, সমাজ কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। তিনি বিশ্বাস করতেন বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষন ও পাঠের মাধ্যমে সমাজ বিকাশের সূত্রাবলিকে আবিষ্কার করা যায়। জিয়ামবাস্তিকা ভিকো তাঁর The New Science নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সমাজ একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বিবর্তিত হয়। ভিকো সমাজকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা: ক) দেবতার যুগ (Age of Gods), (খ) বীর যোদ্ধাদের যুগ (Age of Heros), গ) মানুষের যুগ (Human age)।[১৪১]

পাশ্চাত্য জগতে বিশেষভাবে সমাজবিজ্ঞানের নামকরণের জন্য ফরাসি সমাজচিন্তাবিদ অগাস্ট কোঁতকে (Auguste Comte) সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক জনক বলে অভিহিত করা হয়। সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে কোঁত 'Social physics' বা সামাজিক পদার্থ বিদ্যা নামে আখ্যা দেন। পরবর্তীতে অবশ্য তিনি এই বিষয়টিকে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান বলে অভিহিত করেন। অগাস্ট কোঁৎ মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞান হবে এমন একটি বিজ্ঞান

[১৪১] নাজমুল করিম, সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ১০।

যেখানে এককভাবে সামাজিক সমস্যা, ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যাবে। ১৮৩০ থেকে ১৮৪২ সালের মধ্যে ছয় খণ্ডে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Positive philosophy প্রকাশিত হয়।[১৪২] এ-গ্রন্থে তিনি মানব চিন্তা ও সমাজ বিকাশের তিনটি পর্যায়ের (Three Stages) নাম উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে মানব জ্ঞান তথা সমাজের বিবর্তন ঘটে। সমাজবিকাশের কারণ সম্পর্কে কোঁত-এর অভিমত হলো সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন আসে জনসংখ্যা ঘনত্বের কারণে আর বস্তুজগতের পরিবর্তন আসে জ্ঞানের উন্নতি বা পরিবর্তনের মাধ্যমে। তাঁর মতে, মানুষের সকল চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণাসমূহ, জ্ঞানের সকল শাখা এবং পৃথিবীর সকল সমাজসমূহ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে তিনটি স্তর অতিক্রম করে এসেছে এবং বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় বিষয়েই তা প্রযোজ্য। এ তিনটি পর্যায় হলো: ধর্মতাত্ত্বিক স্তর (Theological State), অধিবিদ্যাগত পর্যায় (Metaphysical State); দৃষ্টবাদী পর্যায় (Positive State)।

কোঁৎ-এর দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা গ্রন্থিত হয়েছে যে সব গ্রন্থে তার অন্যতম হলো- Cours de Philosophic Positive বা Postitive Philosophy এবং Systeme de Politique বা Postitive Polity। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি সর্বমোট ৬ খণ্ডে ১৮৩০ থেকে ১৮৪২ সালের মধ্যে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটি সর্বমোট ৪ খণ্ডে ১৮৫১ থেকে ১৮৫৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

সমাজবিজ্ঞান তথা সমাজ সম্পর্কিত চিন্তাধারা যাদের হাতে অনেকখানি বিকশিত হয়েছে তাদের মধ্যে ব্রিটিশ সমাজ বিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) [১৪৩] অন্যতম।

---

১৪২ সেলিনা আহমেদ ও খ.ম. রেজাউল করিম, সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব: ধ্রুপদী ও আধুনিক (ঢাকা: মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৭০।

১৪৩ হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer): ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ডার্বি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন একজন গৃহশিক্ষক। শারীরিক দুর্বলতার কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারলেও বাড়িতে পিতা ও গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে যে শিক্ষা লাভ করেন তা তাকে কম শৃঙ্খলার মধ্যে মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে সহায়তা করেছিল। ১৭ বছর বয়সে তিনি রেলওয়ের চাকুরি শুরু করেন। ১৮৪১ সাথে নতুন রেলওয়ে স্থাপনের সময় কিছু ফসিলের (জীবদেহের দেহাবশেষ) সন্ধান পান যা তাকে ভূতত্ত্বের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। পরবর্তীতে তিনি মানব জাতির উদ্ভব ও বিবর্তন সম্পর্কে আগ্রহী হন। তিনি সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করেন। স্পেন্সার বিশ্বজনীন বিবর্তনের তত্ত্বের মাধ্যমে (The Theory of Universal Evolution) সমাজ বিবর্তনের বিভিনড়ব প্রক্রিয়া উপস্থাপন করেন। হার্বার্ট স্পেনসারের উল্লেযোগ্য রচনাবলি হলো: Social Statics, First Principles, Principles of Biology, Princeples of Psychology, The Study of Sociology, Principles of Sociology, Synthetic Philosophy.স্পেন্সার ১৯০৩ সালের ৮ ডিসেম্বর ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি ছিলেন বিবর্তনবাদী মতবাদের প্রবক্তা। তাকে ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানের জনক বলে আখ্যায়িত করা হয়। হার্বার্ট স্পেন্সার কোঁৎ-এর সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কীয় ধারণাকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন।

স্পেন্সার তার সমাজ সম্পর্কিত আলোচনায় ব্যক্তিকে সামাজিক একক হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ প্রসঙ্গে ভাইন (Vine) বলেন, 'স্পেনসারের সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক একক হিসেবে ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক হিসেবে বর্ণনা করেন এবং সমাজকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যকার অবশ্যম্ভাবী লড়াই হিসেবে চিহ্নিত করেন। ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এর মধ্যে যে বা যারা খাপ খাইয়ে নিতে পারে সেই টিকে থাকে।'[১৪৪]

স্পেনসারের সমাজবিজ্ঞান সামাজিক জীবন ও কার্যাবলি সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।[১৪৫] তাঁর সামাজিক বিবর্তন তত্ত্বের চারটি প্রধান ব্যাখ্যা রয়েছে। যথা- (১) আধুনিক সামাজিক অবস্থায় উত্তরণ; (২) সামাজিক ব্যবস্থার সম্মিলন থেকে একটি কার্যকর ব্যবস্থায় উত্তরণ; (৩) শ্রমবিভাজনের উত্তরোত্তর অগ্রগতি এবং (৪) সমাজের প্রজাতিগত উৎপত্তি। স্পেনসারই সর্বপ্রথম বিবর্তনের ধারণাকে পদ্ধতিগতভাবে ব্যবহার করেন।[১৪৬]

এমিল ডুর্খেইম (Emile Durkheim)[১৪৭] সমাজবিজ্ঞানের জগতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ডুর্খেইম তার 'The Rules of Sociological Method'-গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান এবং পদ্ধতি ও পরিধি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, সমাজবিজ্ঞান যেহেতু বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সামাজিক ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে

---

১৪৪ Margart Wilson Vine, An Introduction to Sociological Therory, 1959, p. 52.

১৪৫ নাজমুল করিম, সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

১৪৬ Percy S. Cohen, Modern Social Theory (London: Heinemann Educational Books, Ltd., 1975), p. 34.

১৪৭ ডুর্খেইম ফরাসি সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত। তিনি ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের এপিনালে এক ইহুদি পণ্ডিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁৎ ছিলেন তার শিক্ষাগুরু। এছাড়া তিনি হার্বার্ট স্পেন্সারের দ্বারা প্রভাবিত হন। প্যারিসের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দর্শন, সাহিত্যে শিক্ষা লাভের পর তিনি সমাজবিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তাঁর সমাজ সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তা বিভিন্ন গ্রন্থে মাধ্যমে প্রকাশ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ডুর্খেইমের প্রধান প্রকাশনাসমূহের মধ্যে রয়েছে: The Division of Labour in Society, The Rules of Sociological Method, The Suicide, The Elementary Forms of Religious Life প্রভৃতি।

ধারণা লাভের চেষ্টা করে, সেহেতু সমাজবিজ্ঞানে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ হবে।[১৪৮]

ডুর্খেইম সামাজিক বিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক জীবন হলো প্রাকৃতিক এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে যেহেতু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা অধ্যয়ন করা যায় সেহেতু সামাজিক জীবনকেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা অধ্যয়ন করা সম্ভব। তার মতে, অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেভাবে ঘটনাগুলোকে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়, সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুরও সেভাবে গবেষণা ও ব্যাখ্যা হওয়া উচিত।

ডুর্খেইম সাধারণ নৈতিকতায় তার আগ্রহকে বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন প্রত্যয়ের মাধ্যমে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে প্রাথমিক প্রচেষ্টায় তিনি যৌথ চেতনা ধারণা উদ্ভব ঘটান; যাকে তিনি তার The Division of Labour in Society-গ্রন্থে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। তার ভাষায়, 'সমাজের রীতিনীতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-আচরণ ইত্যাদি যা দ্বারা ব্যক্তি পরিচালিত ও অনুশাসিত হয় তাই একযোগে সমাজের যৌথপ্রতিরূপ বা যৌথ সচেতনতা।'[১৪৯]

ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)[১৫০] ছিলেন বিংশ শতাব্দীর পূর্বভাগের মনস্তত্ত্বভিত্তিক সমাজবিজ্ঞানের ধারার অন্যতম ধারক। ওয়েবার সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির অনুশীলন, গবেষণা, অনুসন্ধান ও রচনাবলি সমাজবিজ্ঞান বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ওয়েবারের আদর্শ নমুনা, আমলাতন্ত্র এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের সম্পদ। ওয়েবারের আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হলো সামাজিক ক্রিয়া। তার মতে, সামাজিক ক্রিয়া হলো সমাজবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু। তিনি সামাাজিক ক্রিয়া বলতে মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন। তিনি মানব ক্রিয়াকে তিনভাগে ভাগ করেছেন, যৌক্তিক

---

১৪৮ মুহাম্মদ মিনাজউদ্দিন, সমাজবিজ্ঞান: প্রত্যয় ও পদ্ধতি (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১০০।

১৪৯ Emile Durkheim, The Division of Labour in Society (New York: Free Press, 1839/1964), p. 79-80.

১৫০ ম্যাক্স ওয়েবার ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির ইরফুর্টে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আইন ও অর্থনীতি বিষয়ে লেখা পড়া করেন। প্রথম জীবনে তিনি অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা শুরু করলেও পরবর্তীতে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল ইতিহাস, অর্থনীতি, এবং সমাজবিজ্ঞান। চিন্তাধারায় সূক্ষ্মতা ও বিশ্লেষণাত্মক বাস্তবতার জন্য অপরাপর চিন্তাবিদদের তুলনায় তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। ওয়েবারের সমাজবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সামাজিক ক্রিয়া (Social Action)। ম্যাক্স ওয়েবারের রচনাবলির মধ্যে General Economic History, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism Ges Economy and Society উল্লেখযোগ্য। ১৯২০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ক্রিয়া, ভাবগত ক্রিয়া ও ঐতিহ্যগত ক্রিয়া। তাঁর যৌক্তিক ক্রিয়া মূল্যবোধের সাথে জড়িত একটি বিষয়, অন্যদিকে ভাবগত ক্রিয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্তির আবেগ দ্বারা নির্ধারিত হয়। আর ঐতিহ্যগত ক্রিয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উভয়ই সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান, রাজনীতি, লোকাচার, লোকরীতি ইত্যাদির দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ওয়েবার সমাজবিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করেছেন মূলত সামাজিক কর্মকাণ্ডের কার্যকারণ তত্ত্ব হিসেবে। তার মতে, সমাজবিজ্ঞান হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা সামাজিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে এবং তার মাধ্যমে এর অর্থাৎ সামাজিক কর্মকাণ্ডের স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি ও অনুবর্তী আচরণের একটি যুক্তিগ্রাহ্য ও বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করে।[১৫১]

এছাড়া নৃবিজ্ঞানী লুইস হেনরি মর্গান (Lewis Henry Morgan), ফরাসি সমাজ বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক লে প্লে (Frederich Le Play) এবং এডওয়ার্ড বার্নেট টেইলর (Edward B. Tylor) প্রমুখের সমাজ বিকাশের ব্যাখ্যা ও সমাজ বিজ্ঞানে অবদান রয়েছে। এছাড়াও তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সমাজবিজ্ঞানী না হওয়া সত্ত্বেও সমাজচিন্তায় প্রভাব রেখেছেন, তারা হলেন- কার্ল মার্কস (Karl Marx),[১৫২] চার্লস ডারউইন (Charles Darwin), সিগমান্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)।[১৫৩]

সমাজ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা প্রাচীন কাল থেকে থাকলেও ঊনবিংশ শতকে এসে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানের একটি আলাদা শাখা হিসেবে উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করে। মূলত ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে বিকাশ

---

১৫১ সামসুল ইসলাম খান, "মার্কস-ভেবারীয় প্রেক্ষিত থেকে ক্ষমতা, সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও আইনানুগ বৈধতার সজ্ঞা নিরূপণ: একটি ধারণাগত রূপরেখা", বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ৪০।

১৫২ জার্মান সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্স অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক এবং সমাজতাত্ত্বিক। তিনি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির প্রুশিয়ার ট্রিয়ার শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে দর্শন বিষয়ে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেন। এঙ্গেলস ছিলেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মার্কস এবং এঙ্গেলস উভয়েই মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের গবেষণা করেন। মার্কসের একটি আলোচিত বিষয় হল শ্রেণি। তিনি মানব ইতিহাসের বিবর্তনের যে ধারাটি দেখিয়েছেন, তাতে শ্রেণিতত্ত্ব বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। মার্কস ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলি হলো- The German Ideology, The Communist Manifesto, A Contribution to the Critique of Political Economy, Das Capital প্রভৃতি। তিনি হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করলেও ভাববাদের পরিবর্তেবস্তুবাদের চর্চা করেন। মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, উৎপাদন পদ্ধতি, শ্রেণি সংগ্রাম, বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রভৃতি তত্ত্ব প্রদানের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন।

১৫৩ নাজমুল করিম, সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১; লুই হেনরি মর্গান, আদিম সমাজ, বুলবন ওসমান (অনুবাদ) (ঢাকা: অবসর প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি., পৃ. ৭।

লাভ করে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, শিল্পবিপ্লবের সফলতা এবং ফরাসিবিপ্লবের ব্যর্থতাও পরবর্তীতে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে সমাজবিজ্ঞানের নবযাত্রার সূচনা হয়। ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁৎ সর্বপ্রথম সমাজবিজ্ঞান নামে আলাদা একটি বিজ্ঞানের অবতারণা করেন। সমাজবিজ্ঞানে সমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াবলির বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়। এজন্য সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু অনেক বিস্তৃত। বর্তমান পরিবর্তনশীল সমাজ কাঠামো সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হলে মানব জীবনের প্রতিটি স্তরেই সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন অপরিহার্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে দার্শনিকদের ধারণাসমূহ

সমাজবিজ্ঞানীরা প্রধানত সমাজের কার্য-কারণ সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করে। তাই সমাজের উৎপত্তি নিয়ে তারা এতটা মাথা ঘামান না। তাঁদের মতে এটা কল্পনাবিলাসী দার্শনিকদের কাজ। সুতরাং সমাজের উৎপত্তি কখন কিভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে তারা আজও স্পষ্ট করতে পারেননি। এজন্য সমাজবিজ্ঞানীদের মাঝে এ নিয়ে নানা-মুনির নানা মত অবস্থা দেখা যায়। এছাড়া তাঁদের মতবাদসমূহ শুধু ভিন্ন ভিন্নই নয়, এগুলো রীতিমত পরস্পর বিরোধীও বটে।
মানুষের সমাজের ইতিহাস আলোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, মানুষ সর্বদাই দলবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করেছে। কেননা দলবদ্ধ জীবন যাত্রা ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকে। তাই সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করা মানুষের স্বভাবধর্ম। সমাজবিজ্ঞানীদের মতানুসারে সমাজবিজ্ঞানে ব্যক্তির চেয়ে সমাজ ও সামাজিক গোষ্ঠীর উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়। কারণ মানুষ সামাজিক পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বড় হয়।[১৫৪]

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের চিন্তার ভেতর সামাজিক বিবর্তনের মোটামোটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। প্লেটো ও এরিস্টেটল, রোমান কবি লুক্রোসিয়ার সামাজিক জীবনের পরিবর্তনের কথা প্রকাশ করেছেন। এরপর মধ্যযুগের মুসলিম পণ্ডিতদের লেখার মাঝে সামাজিক বিবর্তনের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। তিউনিসিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত ইবনে খালদুনের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে সতের শতকের দার্শনিকদের চিন্তার মধ্যে সামাজিক বিবর্তন সংক্রান্ত ধারণা লক্ষ্য করা যায়। এসব পণ্ডিতদের মধ্যে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের পণ্ডিতদের মধ্যে ইংরেজ দার্শনিক হবসের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে মানবসমাজের শুরুতে মানুষ বর্বর ও স্বার্থপর ছিল। নিছক সহজাত প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে ঐ সময় মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করত। আদিম সমাজে মানুষ সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। কালক্রমে মানুষ বুঝতে পারল যে, দলবদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে জীবন যাপন করলে সামাজিক অস্তিত্ব অধিকতর নিশ্চিত ও সুখকর হয়। তখন তারা আগের জীবনধারা পরিত্যাগ করে সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবন শুরু করে। হবনের কনিষ্ঠ সহযোগী লক্ কিন্তু আদিম

---

১৫৪ স্যামুয়েল কোনিগ, সমাজবিজ্ঞান, অনুবাদ, রঙ্গলাল সেন (ঢাকা: বই বিতান, ১৯৯৭ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ২৪।

সমাজকে শান্তিপ্রিয় বলে ধারণা করেছেন। তাঁর মনে মানুষ শুরুতে বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছন্ন হয়ে বসবাস করত না, বরং সবাই মিলে একটা অভিন্ন গোষ্ঠী-জীবন যাপন করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মনীষী রুশোও প্রায় অনুরূপ ধারণা পোষণ করেছেন। তার মতে, মানুষ 'স্বাভাবিক' জীবন যাত্রা করত। [১৫৫]

সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিকোর (Vico)র মতবাদটি প্রধানত কল্পনাশ্রয়ী। তবু মানবিক সংগঠনের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তের তাৎপর্য রয়েছে। মানুষ শুরুতে যে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করত একথা ভিকোও বলেছেন। তবে তাঁর মতে কিছুদিন যে মানুষ অসামাজিক ও বন্য জীবন যাপন করতে হয়েছিল এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। মানুষের এহেন বন্য ও বর্বর দশা থেকে মুক্তি হয় যখন সে ঐশ্বরিক আশীর্বাদের জোরে নিজের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হতে পারল।

অপরদিকে বিজ্ঞানী মন্টেস্কু বিশ্বাস করতেন যে, সমাজ জীবনের শুরুতে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের মোকাবেলায় মানুষকে অসহায়ের মত জীবন-যাপন করত হতো। তাই প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ভয়েই মানুষ প্রথমে সামাজিক জীবন শুরু করে। হবস থেকে আরম্ভ করে মন্টেস্কু পর্যন্ত যে সমস্ত চিন্তাবিদদের কথা আলোচিত হল তাতে স্পষ্ট যে, এভাবে প্রত্যেকে নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত মতবাদ পেশ করেছেন।

মানবজ্ঞানের বিকাশের ধারাকে কোঁত (১৭৯৮-১৮৫৭) তিনভাগে ভাগ করেছেন।[১৫৬] মানব সমাজ সম্বন্ধে বলেন, মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই সুনির্দিষ্ট নিয়মানুসারে সমাজের জন্ম হয়েছে। প্রত্যেক সমাজই আদিম অবস্থা থেকে বিবর্তন ও সামাজিক প্রগতির মাধ্যমে আধুনিককালে উচ্চস্তরের সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, একই সমাজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সভ্যতার মানদণ্ডে একই সময়ে বিভিন্ন স্তরে থাকতে পারে। তবে সামাজিক প্রগতি সকল সমাজের ক্ষেত্রেই অবধারিত। সামাজিক উন্নতি ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। এছাড়া কোঁৎ-এর মতে একমাত্র সুদূরপ্রসারী সংস্কারের মাধ্যমে মানব সমাজে আশানুরূপ উন্নতি সাধন সম্ভব।

---

[১৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২।

[১৫৬] তিনিটি স্তর হলো, ধর্মতাত্ত্বিক স্তর (Theological State), অধিবিদ্যাগত পর্যায় (Metaphysical State); দৃষ্টবাদী পর্যায় (Positive State)।

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানব সমাজের জন্ম হয়েছে, আর সংগ্রামের মাধ্যমেই তা টিকে থাকবে– এটি ডারউইনপন্থী সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা। তাঁদের মতে গোষ্ঠীচেতনা (Syngenism) হলো সকল সমাজের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কারণ, গোষ্ঠীচেতনা ছাড়া সামাজিক জীবন অসম্ভব। সমাজে মানুষের ভেতর যত দিন গোষ্ঠী চেতনা জাগরূক থাকবে, ততদিন সামাজিক ঐক্য বজায় থাকবে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে বৃহৎ জনসমাজ গড়ে উঠেছে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক রীতিনীতির দিক থেকে প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্র। নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর বিকাশ হয়েছে। এক্ষত্রে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, সামাজিক সংঘাত হল সামাজিক বিবর্তনের একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া। গামপ্লোভিজের সহযোগী পণ্ডিত র‌্যাটজেন হপারও সমাজ বিকাশে সংগ্রামের তাৎপর্যকে স্বীকার করেন।[১৫৭]

---

[১৫৭] স্যামুয়েল কোনিগ, সমাজবিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজ বিবর্তনে ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা

১ম পরিচ্ছেদ
সমাজবিজ্ঞানের অনানুষ্ঠানিক জনক

২য় পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব

৩য় পরিচ্ছেদ
সমাজ বিবর্তন মতবাদ ও ইবনে খালদুন

৪র্থ পরিচ্ছেদ
সমাজ বিবর্তন সম্পর্কে ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা

৫ম পরিচ্ছেদ
'আসাবিয়াতত্ত্ব' বা সামাজিক সংহতি

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের দৃষ্টিতে সমাজ কাঠামো

১ম পরিচ্ছেদ
সমাজবিজ্ঞানের অনানুষ্ঠানিক জনক

বিজ্ঞানের আলাদা শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান বিকাশ লাভ করার পর থেকে বিভিন্ন চিন্তা ও তত্ত্ব নির্মাণ শুরু হয়। এ সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলো আকস্মিকভাবে তৈরি হয়নি বরং এর পেছনে লুকিয়ে ছিল শতাব্দী প্রাচীন সামাজিক চিন্তাধারা অথবা সামাজিক দর্শন। দার্শনিক বিষয় হিসেবে ইতিহাসের বিষয় হলো সমাজ জীবন, অর্থাৎ সমাজের যৌথ, বস্তুগত ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্য। জীবনদেহের মতো সমাজও গতিশীল সামাজিক রূপ ও কাঠামো বিবর্তিত হয়। জীবনের মতো এসব পরিবর্তন সংগঠিত হয় বিভিন্ন জাতি বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সাংস্কৃতিক প্রথা প্রতিষ্ঠানাদির বিনিময়ের ফলে।

আল-উমরান (Al-Umran)

মানুষ একটি সামাজিক জীব–এই সূত্র থেকেই যাত্রা শুরু খালদুনের সভ্যতা ও সংস্কৃতিবিষয়ক নতুন বিজ্ঞানের।[১৫৮] ইবনে খালদুন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাব আল-ইরাব' গ্রন্থে সমাজ ও সমাজ বিবর্তনের প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক নতুন বিজ্ঞান বা æThe Science of Culture" আবিষ্কার করেন। 'ইলম আল উমরান' (Ilm Al-umran) বা সংস্কৃতির বিজ্ঞান বা সায়েন্স অব কালচার আবিষ্কার করেন। খালদুনের এই নতুন বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হলো- মানব সমাজ। তিনি দেখিয়েছেন এই সমাজে সব সময়ই প্রকৃতিতেই নিবদ্ধ থাকে। আর সামাজিক বিবর্তনের বীজ সমাজের প্রকৃতিতেই বর্তমান থাকে।

ইবনে খালদুন যে মুকাদ্দিমা গ্রন্থ রচনা করেছেন তা কোনো ধর্মতত্ত্ব নয়, এটি সমগ্র মানব সভ্যতা, বিশেষ করে ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত একটি মূল্যবান প্রকাশনা। তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্ব ঐ সত্যতা অধ্যয়নেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যাকে তিনি এক বিশেষ অর্থে তথা 'উমরান' (Umran) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। খালদুন তাঁর ঐ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন অধ্যয়নকেই আরবি ভাষায় 'আল-উমরান' বলেছেন, যাকে ইংরেজিতে 'Sociology' or 'Political Sociology' রূপে অভিহিত করা যায়। তিনি এখানে মানবসমাজের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন। তিনি তার নিজের আবিস্কৃত বিজ্ঞানকে স্বাধীন বিজ্ঞান বলে বর্ণনা করেন।

---

[১৫৮] স্যামুয়েল কোনিগ, সমাজবিজ্ঞান, পৃ. ২৭৬-২৭৭।

ইবনে খালদুনের উদ্ভাবিত নয়াবিজ্ঞান 'আল-উমরান' (সমাজ-বিজ্ঞান) ইতিহাস পাঠ ও অনুধাবনের সেতুবন্ধন হিসেবেই তাঁর মুকাদ্দিমায় আলোচিত হয়েছে। ইবনে খালদুন বলেছেন, তাঁর বিজ্ঞানটি সম্পূর্ণ নতুন এবং তিনিই এ বিজ্ঞানটির উদ্ভাবক।[১৫৯] ইবনে খালদুন পূর্ববর্তী কারও রচনা থেকে সহায়তা কিংবা পূর্ববর্তী কারো উদ্ভাবিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়টিকে সাজিয়ে দেননি। ইবনে খালদুনের রচনাবলি নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করে গবেষণকগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ইবনে খালদুন তাঁর নিজের উদ্ভাবিত বিষয়টিতে একক ও অনন্য। তিনি যে-বিষয়কে সমাজতত্ত্ব বা মানব-সমাজের বিজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, সেটি একান্তভাবেই তাঁরই উদ্ভাবিত বিজ্ঞান।

ইবনে খালদুন মুকাদ্দিমায় উপস্থাপিত সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়াবলি ছয় অংশে ভাগ করে আলোচনা করেন। প্রথম ভাগে সমাজবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়। এখানে সামাজিক শ্রেণি ও ভৌগোলিকভাবে মানুষের বিভাজন সম্বন্ধে জানা যায়। দ্বিতীয় ভাগে তিনি যাযাবর সমাজ, গোত্র ও অনগ্রসর জাতিসমূহ সম্পর্কে জানা যায়। তৃতীয় ভাগের বিষয়বস্তু হিসেবে পাওয়া যায় রাষ্ট্র, আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রীয় পদবিসমূহ। চতুর্থ ভাগে স্থায়ী সমাজ, নগর ও প্রদেশের পর্যালোচনা এবং পঞ্চম ভাগে মানুষের কারুকাজ, জীবিকা উপার্জনের উপায় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। পরিশেষে ষষ্ঠ ভাগে পাওয়া যায় বিজ্ঞান এবং কী করে তা অর্জন করা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা।

ইবনে খালদুনের মতে, মানুষ যাযাবর জীবন (ওমরানে বদবী) থেকে নাগরিক সংস্কৃতিতে (ওমরানে হাদরী) বিকাশ লাভ করে। অন্য কথায়, মানুষ সামাজিক ক্রমবিবর্তনের ধারায় সুনির্দিষ্ট নিয়মে প্রয়োজনাত্মক সমাজ থেকে নাগরিক কৃষ্টির দিকে অগ্রসর হয়। সামাজিক ক্রমবিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়।[১৬০]

খালদুন তাঁর উক্ত গ্রন্থে যেমন একদিকে রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে সমাজ এবং সভ্যতার বিকাশ ধারাও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর আলোচনায় 'রাষ্ট্র', 'সমাজ', এবং 'সভ্যতা' প্রায় সমার্থক রূপে পরিগণিত হয়েছে। এ তিন প্রত্যয় কিংবা

---

১৫৯ ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

১৬০ Elmira Akhmetova, æDefining Civilisation and Religion," *IAIS Journal of Civilisation Studies*, vol.1, no.1 (October 2008), 47-48.

সত্তাকে যথাক্রমে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করা যায়।[১৬১]

খালদুন সভ্যতার সাথে রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সনাক্ত করেছেন, যাকে তিনি সরকার পরিচালনার একটি 'শিল্প' (art) বলেছেন। এটি আধুনিক অর্থে 'সুশাসন' (Good governance) ছাড়া অন্য কিছু নয়। তিনি শহুরে ও গ্রামীণ জীবনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। প্রাচীন গ্রিক নগরের মতাই খালদুন-কথিত শহর হচ্ছে 'তমদ্দুন' তথা সংস্কৃতি কেন্দ্র। "His realistic approach to man in the state made him recognize the will to power and domination as the principal driving force; but he was convinced that the higher aspirations of rational man could only develop in a society efficiently organized in an effective political organization, and only the state could provide it."[১৬২] অর্থাৎ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মানুষের প্রতি খালদুনের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিই মুখ্য চালিকাশক্তি হিসেবে ক্ষমতা ও আধিপত্যের ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিতে তাঁকে প্রণোদিত করে। এ বিষয়ে তাঁর প্রতীতি জন্মেছে যে, যুক্তিশীল মানুষের উচ্চভিলাষ শুধু এমন একটি সমাজে বিকশিত হয়, যা কার্যকর রাজনৈতিক সংগঠনেই সুবিন্যস্ত হতে পারে এবং সেটি রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কিছু নয়।

খালদুন মনে করতেন, "Human association is necessary. Man is a citizen by nature. This means that association is indispensable; it is civilization which is synonymous with 'Umran', otherwise habitable world would not be perfect."[১৬৩] অর্থাৎ, মানব সঙ্ঘ প্রয়োজনীয়। মানুষ চরিত্রগতভাবেই নাগরিক। সেজন্য সঙ্ঘ অপরিহার্য। এটি সভ্যতা, যার অন্য নাম 'উমরান'। অন্যথা বাসযোগ্য পৃথিবী পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

---

[১৬১] এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, স্কটিশ ঐতিহাসিক এডাম ফার্গুসন (১৭২৩-১৮১৬) তাঁর Essay on the History of Civil Society (1767) গ্রন্থে আজ থেকে প্রায় আড়াইশ বছর আগে 'সিভিল সোসাইটি'-র যে ধারণা সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যক্ত করেন তার বীজ খালদুনের উক্ত চিন্তায়ও বিদ্যমান ছিল। (দ্র. রংগলাল সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০)।

[১৬২] Franz Rosenthal, Polilitical Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline (Cambridge: At the University Press, 1968), p. 85

[১৬৩] Franz Rosenthal, ibid, p. 86.

ইবনে খালদুন বলেছেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে মানুষের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে হলে সমমনা লোকের কার্যকর সমর্থন অত্যাবশ্যক, যারা অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ। রক্তের সম্পর্ক এবং পারিবারিক ঐতিহ্য সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের মনে সংহতি, দায়িত্ববোধ এবং সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটায়, যা ঐক্যবদ্ধ কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়। আর এটিই রাষ্ট্র ও রাজবংশ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। অধিকন্তু, এটি সঙ্ঘের মতই অপরিহার্য; কারণ শুধু সঙ্ঘ এককভাবে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে না।

খালদুনের মতে, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সহযোগিতা এমন একটি জটিল প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়, যাকে তিনি 'নগরায়ণ' (urbanization) তথা 'তমদ্দুন' বলেছেন, যা প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্রে লক্ষণীয়। খালদুনের বিবেচনায় মানুষ যে মুহূর্তে কোন ধরনের সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলেছে তখনই সভ্যতার (civilization) বিকাশ ঘটেছে, যা তাঁর ভাষায় 'উমরান' (Umran)। তিনি 'জনসংখ্যা' (population) অর্থেও আরবি 'উমরান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যখনই কোন সামাজিক সংগঠন জনবহুল হয় তখনই বৃহত্তর ও অধিকতর উন্নত সভ্যতা বিকাশ লাভ করে। তিনি প্রশ্ন করেছেনঃ "What causes differences in the size, quality, and influence of different human social organizations? Ibn Khaldun replies that there must be some factor, some incitement, for the desire for corporation to exits on a large scale among some human beings than among others. Only thus can large and powerful states have originated. This factor he calls 'asabiyah', 'solidarity', 'group feeling', 'group consciousness', a word which he borrowed from classical usage and to which he gave a new, positive meaning."

অর্থাৎ কি কারণে মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের ভেতর আকৃতিগত, প্রকৃতিগত এবং প্রভাবগত পার্থক্য ঘটে? এ প্রশ্নের উত্তরে খালদুন বলেন, নিশ্চয়ই এমন কোনো উপাদান ও প্রবর্তনা রয়েছে যেজন্য অন্যদের চেয়ে কতক মানুষের মধ্যে বৃহত্তর মাত্রায় নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সহযোগিতার প্রবল ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে। আর কেবল এভাবেই বৃহৎ এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। খালদুন এ উপাদানকেই বলেছেন 'আসাবিয়া' যা 'সংহতি', 'গোষ্ঠী অনুভূতি', 'গোষ্ঠী-চেতনা'-র সমার্থক। তিনি শব্দটি প্রচলিত প্রাচীন প্রথা থেকে গ্রহণ

করলেও একে নতুন ইতিবাচক অর্থে ব্যবহার করেন। একজন ব্যক্তি নিজেকে যে গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে ঘনিষ্ঠ বিবেচনা করে সে এর বংশধারার অংশীদার। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থে 'আসাবিয়া, রক্তের বন্ধন-নির্ভর নয়, এটি গোষ্ঠী-সদস্যদের সুদীর্ঘ ও আন্তরিক যোগাযোগের ফল। ইবনে খালদুন শেষোক্ত অর্থেই 'আসাবিয়া'-কে বুঝেছেন। সেজন্য তাঁর কাছে 'রাষ্ট্র' (state) এবং 'রাজবংশ' (dynasity) অভিন্ন। একটি রাষ্ট্র ততদিন টিকে থাকে যতদিন রাজবংশের সংহতি স্থিতিশীল। একটি রাষ্ট্র তথা রাজবংশের রয়েছে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, যে কারণে সদস্যরা বাইরের সামরিক হস্তক্ষেপ কামনা করতে বাধ্য হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত উক্তি করেন: "Since the founding of a dynasty or state involves large numbers of people, this process can take place only where there is civilization. A dynasty requires large cities and towns, and makes the development of luxury possible by channelling a certain amount of labour into the production of things and the provision of services that are not strictly necessities. Thus, man is able to develop the craft, the arts, and the sciences. This bias towards luxury, however, carries with it the seeds of the dynansty's eventual decay and disintegration. The desire of the ruling group to gain exclusive control over all the sources of power and wealth brings about a conflict between the dynasty and the men whose 'asabiyah' sustains it. Its members thus resort to military support from outside sources..."[১৬৪]

অর্থাৎ রাষ্ট্র কিংবা রাজবংশ প্রতিষ্ঠার শুরুতেই যখন ব্যাপক সংখ্যক লোক সংযুক্ত হয়ে পড়ে তখন এমন একটি প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়, যাকে 'সভ্যতা' বলে। বড় বড় শহর ও নগর হল রাষ্ট্র তথা রাজবংশের অপরিহার্য অংশ, যেখানে বিলাসবহুল জীবনযাত্রার বিকাশ ঘটে। সেখানে শ্রমজীবী মানুষ এমন সব জিনিসের উৎপাদন ও সেবাকার্যে নিয়োজিত হয় যেসব তেমন আবশ্যকীয় নয়। তবে মানুষ এভাবে কারুশিল্প, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটায়। সে যা হোক, বিলাসবহুল জীবনযাত্রার প্রতি মোহের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে রাজবংশের

---

[১৬৪] Rosenthal and Dawood, 1967, ibid, p. XI

অবক্ষয় ও ধ্বংস, যার বীজ এর মধ্যেই উপ্ত থাকে। ক্ষমতা ও সম্পদের সকল সূত্রের উপর শাসকগোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অদম্য ইচ্ছাই রাজবংশ এবং 'আসাবিয়া'-র ধারক-বাহক জনসমষ্টির ভেতর সংঘাটত সৃষ্টি করে। এ কারণে শোষিত-বঞ্চিত মানুষ মুক্তির জন্য বহিঃশক্তির সামরিক সাহায্যের শরণাপন্ন হয়। খালদুনের উপরি-উক্ত দ্বান্দ্বিক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরা দুটি মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক ধারণার সন্ধান পাই। একটি হচ্ছে এক ধরনের 'উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব' (theory of surplus value), এবং অন্যটি অসংগঠিত 'সর্বহারা শ্রেণি' (proletariat)- সংগ্রাম-ইচ্ছা। খালদুন কেবল রাষ্ট্র কিংবা রাজবংশ এবং সমাজ ও সভ্যতার অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টির উপাদান-সূত্রের আবিষ্কার করতেই সমর্থ হননি, তিনি কতক উপাদানের ভিত্তিতে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্যও নির্ণয় করেছেন। এসব হল: (ক) বিজ্ঞান ও শিল্পকলা; (খ) যৌক্তিক কর্তৃত্বের অস্তিত্ব; (গ) জীবন ও জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান; (ঘ) সামাজিকতাবোধ এবং (ঙ) সভ্যতা ও সংস্কৃতি।[১৬৫]

অধ্যাপক রংগলাল বলেন, 'আসাবিয়া' হচ্ছে ইবনে খালদুন প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়। অর্থাৎ, 'আসাবিয়া' তথা সামাজিক সংহতি প্রত্যয়টি খালদুনের সাধারণ এবং রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। সে-কারণে খালদুনের সভ্যতা অধ্যয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে যে বিষয়টি অবস্থান করছে তা হল 'ক্ষমতা-রাষ্ট্র তত্ত্ব' (Theory of the power-state)।[১৬৬] তাঁর মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় মানবিক প্রতিষ্ঠান, যার শুধু লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই নেই, একটি কার্যকারণ সূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ইবনে খালদুন সমাজতত্ত্বের জনক। বস্তুতঃ তিনিই সমাজতত্ত্বের বিষয়টিকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিজ্ঞান হিসেবে আবিষ্কার করেছেন এবং মানব সমাজের বিভিন্ন বিষয় ও বিশেষ সমস্যার প্রেক্ষিতে ও আলোকে তা বর্ণনা করেছেন। এই বিশেষ বিষয় ও সমস্যা তাঁর ভাষায়, "মানব সমাজের সকল বৈশিষ্ট্য ও পরিস্থিতির ব্যাখ্যায় অপরিহার্য।" তিনি আরও বলেছেন যে, "এই সমাজ বিজ্ঞান 'নতুন'। এতে নতুন ভিত্তির খোঁজ পাওয়া যাবে এবং এই বিষয়বস্তুও আগ্রহোদ্দীপক।" ব্যক্তি গবেষণার মাধ্যমেই ইবনে খালদুন এই সমাজ বিজ্ঞানের পরিচয় লাভ করেন। তাঁর পূর্ববর্তী কোনো লেখকের লেখা থেকে তিনি সাহায্য গ্রহণ করেছেন বলে কেউ তা বলতে পারেননি। এ কারণেই এ যাবত ইবনে খালদুনই ইতিহাসের এই নতুন দিগন্তের

---

[১৬৫] রংগলাল সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২।

[১৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১।

আবরণ উন্মোচনকারী হয়ে রয়েছেন। তিনি রেখে গেছেন ইতিহাসের নবতর ব্যাখ্যা ও সমাজ বিজ্ঞানের তত্ত্বাবলি।[১৬৭]

ইবনে খালদুন ইতিহাসে সমাজবিজ্ঞানের মূল সূত্র প্রয়োগ করে ঘটনাপ্রবাহকে বিচার করার যে পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেন তা আরনল্ড জোসেফ টয়েনবির মতে, 'এ পর্যন্ত যে কোনো দেশের ও যে কোনো কালের মানবীয় মননশক্তির বড় পরিচয়।[১৬৮]

ইতিহাস অনুধাবনের ও গবেষণার জন্য ইবনে খালদুন যে নয়া-বিজ্ঞান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর মতে, এ বিশ্বের ইতিহাসের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক এবং সম্ভব ও অসম্ভবকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে অত্যন্ত কার্যকর।

এ নতুন বিজ্ঞানের প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি বলেন: "এজন্য মানব সমাজের দিকে তাকাতে হবে, অর্থাৎ সমাজতত্ত্বের উপর নির্ভর করতে হবে। কোন সমাজকে বিশ্লেষণ করতে হলে তার যে অবস্থাসমূহ বৈশিষ্ট্যসহ চিহ্নিত, সময়ে সময়ে যেসব ঘটনা বা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং যেসব অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, এই তিনটি অবস্থাকে পৃথক করতে হবে। এরপর একটি বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করে নিতে পারব এবং এভাবেই সুব্যবস্থিত পদ্ধতিতে আমরা নিঃসন্দেহে উপনীত হব সঠিক প্রমাণের দ্বারা।" বলাবাহুল্য বিষয়টা ইতিহাস-উপলব্ধির একটা প্রচেষ্টা। আর এই প্রচেষ্টার সাফল্য লাভের জন্যই ইবনে খালদুন এই নতুন বিষয়টি সম্পর্কে অধ্যয়নে ও গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। এই বিষয়টি হচ্ছে 'আল-উমরান' বা 'আল-ইজতিমা আল-বাশারী', অর্থাৎ এক কথায় সমাজতত্ত্ব বা সমাজবিজ্ঞান, যা মানব সমাজের প্রকৃত অবস্থার তত্ত্ব ও তথ্যাবলিতে সমৃদ্ধ।[১৬৯]

মূলত সমাজ বিজ্ঞানের উদ্ভাবক ইবনে খালদুন অবশ্য সমাজ বিজ্ঞানকে এক অভিনব ও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি সামাজিক অগ্রগতির আলোচনাকে ইতিহাসের বিষয়বস্তু বলে চিহ্নিত করেন এবং সামাজিক পরিবর্তনকে মানুষের দলবদ্ধ জীবন যাপন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যকার সমীক্ষা বা মিথস্ক্রিয়ার ফল বলে ধরে

---

১৬৭ আখ্‌তার-উল্‌-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮।

১৬৮ Arnold Joseph Toynbee, A Study of History, Vol. III (Oup. London, 1962) Reprint, p. 352.

১৬৯ আখ্‌তার-উল্‌-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

নেন। তদুপরি তিনি একটি গোষ্ঠীর সমন্বিত মানসের অবিব্যক্তি জ্ঞাপনকল্পে 'আসাবিয়া' শব্দটি ব্যবহার করেন। আসাবিয়ার মাধ্যমে গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীর অধিপতি রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াসের ক্ষেত্রে তাঁর ঐক্যবদ্ধ মানসের প্রতিফলন ঘটাতে এবং তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পতন ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়।[১৭০]

অধ্যাপক রংগলাল সেনের মতে, ইবনে খালদুনের মুকাদ্দিমা নিঃসন্দেহে সমাজবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং প্রত্যয়সমৃদ্ধ একটি ধ্রুপদী রচনা। যদিও তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল সভ্যতার বিজ্ঞান, তবু 'বিজ্ঞান' বলতে এখানে তিনি যা বুঝিয়েছেন তা আধুনিক অর্থে 'সমাজবিজ্ঞান' ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে খালদুন ছিলেন সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একজন ঐতিহাসিক ও দার্শনিক। কেননা, তাঁর প্রবর্তিত ইতিহাসের সংজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে সমাজতাত্ত্বিক। খালদুনের মতে, "ইতিহাসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সম্যক উপলব্ধি। সমাজে প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি, পরিবার ও গোষ্ঠীর মূল্যবোধ, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মধ্যে বিদ্যমান অসমতা ও স্তরবিন্যাস এবং সর্বোপরি, সমাজ তথা সমাজ কাঠামো হচ্ছে ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান (Historical Sociology)-এর প্রধান আলোচ্য বিষয়।"

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী টিটকানো ক্লসিও ইবনে খালদুনের অর্থনীতি সম্বন্ধীয় মতবাদ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই মহান বার্বার ঐতিহাসিক কনসিভারেন্ট[১৭১], মার্কস[১৭২] ও বাকুনিনের[১৭৩] বহু পূর্বে মধ্যযুগেই সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা ও রাজনৈতিক অর্থনীতি তত্ত্ব ও মতবাদ আবিষ্কার করেছিলেন।[১৭৪]

প্রখ্যাত অধ্যাপক রংগলাল সেন বলেন, ইবনে খালদুন 'সমাজবিজ্ঞান' নামেই একটি 'নতুন বিজ্ঞান' (New Science) প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলেন, যা ভিকো (১৬৬৮-১৭৭৪খ্রি.)

---

১৭০ মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দীন, রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি (ঢাকা: আইডিয়াল প্রকাশনী, ১৯৯০খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৮১।

১৭১ কনসিভারেন্ট (১৮০৮-১৮৯৩ খ্রি.) ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ। তিনি সমাজতন্ত্রের উপর অনেক পুস্তক রচনা করেন।

১৭২ কাল মার্কস (১৮১৮-৬৩): প্রখ্যাত জার্মান অর্থনীতিবিদ ও সমাজতন্ত্রী। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বৃহত্তমগ্রন্থ 'ডাস ক্যাপিটাল -এর রচয়িতা।

১৭৩ বাকুনিন (১৩১৪-৭৬খ্রি.): রুশ সমাজতত্ত্ববিদ ও অর্থনীতিবিদ। তিনি নৈরাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

১৭৪ Colosio: Contribution a Ieluded Ibn Khaldun (Revue du Monde Musulman XXVI, 1914).

কর্তৃক প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পরে আত্মপ্রকাশ করে। নিম্নের উক্তিটিই এর সাক্ষ্য বহন করেঃ "Ibn Khaldun did not only lay foundations on which the science of sociology must rest; he also used many of the methods and brught to light many of the factors which from the working tools of medern Sociologists"[১৭৫]

অর্থাৎ ইবনে খালদুন শুধু সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তিই রচনা করেননি; তিনি আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের দ্বারা ব্যবহৃত গবেষণার কার্যকরী পদ্ধতি ও কলা-কৌশলের বিকাশ সাধন করেছেন। আর এখানেই তাঁর মুকাদ্দিমা গ্রন্থের মূল সার্থকতা নিহিত।[১৭৬]

আমেরিকান কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ন্যাথানিয়েল স্মিডট (Nathaniel schmidt)- তাঁর Ibn Khaldun: Historian, Sociologist and Philosopher (1930) নামক গ্রন্থে ইবনে খালদুনকে সমাববিজ্ঞানের অগ্রপথিক হিসেবে গণ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি "Sociology existed long before Auguste Comte, that Ibn Khaldun went beyond him in certain conclusions."[১৭৭] অর্থাৎ, সমাজবিজ্ঞানের আনুষ্ঠানিক জনক অগাস্ট কোঁতের অনেক আগেই এর অস্তিত্ব ছিল। খালদুন সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্তে অগাস্ট কোঁতকে অতিক্রম করে গেছেন। তা সত্ত্বেও সিম্ডট মনে করেন খালদুনের একজন সমালোচক হিসেবে বিশেষ করে, ক্রেমারের পূর্বোক্ত মূল্যায়ন সর্বজনগ্রাহ্য নয়।[১৭৮]

---

১৭৫ Charles Issawi, An Arab Philosophy of History (London: Gohn Muray, 1969), p. 9.

১৭৬ রংগলাল সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

১৭৭ N. Schmidt, Ibn Khaldun: Historian, Sociology and Philosoher (New Yourk Pantheon, 1930), p. 26.

১৭৮ অধ্যাপক রংগলাল সেন, ইবনে খালদুন, সমাজবিজ্ঞানের অনানুষ্ঠানিক জনক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব

ইবনে খালদুন এমন অনেক বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছেন বা গবেষণা করেছেন, যা নিয়ে তাঁর পূর্বে অনেকে ভেবেছেন। তবে, ইবনে খালদুনের গবেষণা ছিল তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গবেষকগণ বলেছেন যে, ইবনে খালদুন সুসংবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কায়দায় যুক্তিযুক্ত উপায়ে তাঁর বিষয়টির ভিত্তিতে কয়েকটি দিকে গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁর পূর্ববর্তী ইতিহাসবেত্তা বা সমাজ-দার্শনিকদের রচনায় বিক্ষিপ্তভাবে এ-সব বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা থাকলেও, ইবনে খালদুন নিঃসন্দেহে এই বিজ্ঞানটির প্রতিষ্ঠার সম্মান পাবেন। ইবনে খালদুন এই সমাজতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মৌলিক ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী ছিলেন।

ইবনে খালদুনের পূর্বে কোন মুসলিম ইতিহাসবিদ সমাজ, সমাজের বৈশিষ্ট্য ও গঠনকে গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন বলে এখনও জানা যায়নি। তবে দেখা যায় যে, হিজরি তৃতীয় দশক থেকে কতিপয় মুসলিম চিন্তাবিদ রাষ্ট্রনীতি ও রাজ্য-পরিচালনাকে বিশেষ-বিজ্ঞান বা সাহিত্যের শাখা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সে যুগে রাজনীতির অর্থ ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। এ বিষয়ে ইবনে কুতাইবা আল-দীনাওয়ারীর (মৃ. ২৭৬হি./৮৮৯ খ্রি.)-ই ছিলেন প্রথম। তাঁর "উয়ুন আল-আসবার" নামক গ্রন্থের 'কিতাবুস সুলতান' শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি সুলতানদের যোগ্যতা, সঙ্গীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ও আলাপ-আলোচনা, সরকারি কর্মচারী ও প্রশাকদের প্রতি তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১৭৯]

হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অপর মুসলিম দার্শনিক আবু নসর আল-ফারাবী তাঁর আলোচনায় সমাজ সংক্রান্ত বিষয়কে দার্শনিকদের দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর পুস্তকের নাম 'মাদামী আরা আহল আল-মাদীনা আল-ফাদীলা' অর্থাৎ আদর্শ শহরের আদর্শ সমাজের নমুনা। শহরের মানুষের প্রয়োজন ও সহযোগিতা, শহর ও গাঁয়ের উৎপত্তি, শহর প্রশাসক (সুলতান)-এর গুণাবলি ত্রুটিসমূহ, আদর্শ শহর ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত শহরের পার্থক্য, পেশা, পেশার শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে তাঁর পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে।[১৮০] ফারাবী তাঁর গ্রন্থে এর সব কয়টি দিকই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করেছেন।

---

[১৭৯] কুতাইবা আল-দিনাওয়ারী, উয়ুন আল-আসবার (কায়রো: লাইব্রেরি সংস্করণ), খ. ১, পৃ. ১-১০৭।

[১৮০] কুতাইবা আল-দিনাওয়ারী, কিতাব আল-মদীনা আল-ফাদীলা (লীডেন), পৃ. ৫৩-৬৭।

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি "রাসাইল ইখওয়ানুস-সাফা"[১৮১] (সততার ভ্রাতৃসংঘ সম্পর্কিত আলোচনা) নামে একটি দার্শনিক পুস্তক প্রকাশ পায়। এতে কতিপয় রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ-গ্রন্থের বক্তব্য হচ্ছে, রাজকীয়-রাজনীতি জাতির শরীয়ত (আইন) সংরক্ষণ করবে; সুকর্মের জন্য মানুষকে আল্লাহান্বিতকরণ ও কুকর্ম পরিহারের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে সুন্নাহর (রাসূল (সা)-এর আদর্শ) পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব পালন করবে। তাছাড়া, অপরাধ, প্রবণতা দূর করবে, অবিচার পরিহার করবে; শত্রু ও দুস্কৃতিকারী দমন করবে এবং ন্যায়-নীতির অনুসারীর জন্য পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।" সমাজের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার, নগরীর শাসক বা যুবরাজ ও সেনাপতির দায়িত্ব সম্পর্কেও এ-গ্রন্থে আলোচনা স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ এতে পবিত্র নীতি ও কানুন প্রতিষ্ঠা এবং দুষ্ট মতবাদ হতে আত্মরক্ষা করার বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং পুস্তকে রাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য ও সার্বভৌমত্বের প্রকারভেদ সম্বন্ধে, ইমামের পদমর্যাদা, রাজতন্ত্রের অবস্থা ও আইন-কানুন সম্বন্ধে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এছাড়াও এ-গ্রন্থে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।[১৮২]

উপরোল্লিখিত ফারাবী ও ইখওয়ানুস সাফার আলোচনায় মানুষের সমাজের প্রয়োজনীয়তা, গ্রাম ও শহরের উৎপত্তি, ও বিজ্ঞান ও পেশার শ্রেণিবিভাগ এবং চরিত্রের উপর ভৌগলিক ও পরিবেশগত অবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। ইবনে খালদুনও তাঁর আলোচনায় এসব বিষয়ের সূত্রপাত করেছেন এবং সকল দিককে তাঁর বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মুকাদ্দিমায় মানব সমাজের প্রয়োজনীতা, শহর ও নগরীর উৎপত্তি, বিজ্ঞানের বিভাগ, পেশার শ্রেণিবিভাগ, মানব চরিত্রে পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। তবে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করে গবেষকগণ বলেন, "শুধুমাত্র শিরোনাম ছাড়া আর সবকিছুতেই এসব লেখকের লেখার সাথে ইবনে খালদুনের রচনার কোন সাদৃশ্য নেই। পূর্ববর্তীদের রচনায় এ সকল প্রশ্নকে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় যাচাই করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ইবনে খালদুন এ এসবের পর্যালোচনায় একটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন।

---

১৮১ ইখওয়ান আল-সাফা ছিল ১০ম শতকে ইরাকের বসরায় মুসলিম দার্শনিকদের একটি গুপ্ত সংগঠন। এই রহস্যময় সংগঠনের কাঠামো এবং এর সদস্যদের পরিচয় বিস্তারিত জানা সম্ভব জানা যায় না। "রাসাইল, ইখওয়ান আল সাফা" বা "The Encyclopedia of Brethren of Purity" নামে তাদের একটি এনসাইক্লোপিডিয়া ছিল। তাদের শিক্ষা এবং দর্শন এ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

১৮২ রাসাইল ইখওয়ানুস সাফা (কায়রো), খ. ১, পৃ. ২৩; খ. ২, পৃ. ২০৮-১; খ. ৪, পৃ. ৩০; ১৮১; ২০২ ইত্যাদি।

তিনি এসব বিষয়কে সম্পূর্ণ ব্যবহারিক পদ্ধতিতে প্রখর যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এখানেই তাঁর স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব।[১৮৩]

গবেষকগণ ইবনে খালদুন ও অন্যান্যদের মধ্যে রাজনীতি (Politics) বিষয় নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। রাজনীতি বিষয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, রাজনীতির বিষয়কে এক সময় যারা সম্পূর্ণ আইনানুগ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করেছেন, তাঁরাই অন্যসময় আবার সেই বিষয়টিকে নীতি-দর্শনের দৃষ্টিকোণে যাচাই করেন। রাজনীতিকে আইনানুগ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করার যে সকল পুস্তক বা গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী[১৮৪] রচিত 'কিতাবুল আহকামুস সুলতানিয়া" এ বিষয়ে এটি একটা উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ। এই পুস্তকে গ্রন্থকার বিস্তারিতভাবে ইমামত্বের পদমর্যাদা ও অবস্থা, ইমামের প্রয়োজনীয় গুণাবলি, দোষাবলি, তাঁর প্রতি জাতির কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তারপর তিনি ওজারতি (মন্ত্রিত্ব) ও তার প্রকারভেদ, আমীরত্ব ও তার প্রকারভেদ, বিচার বিভাগ, জিজিয়া, খারাজ (ভূমিসর)-এর নিয়মাবলি, সামন্ততন্ত্র, দিওয়ান (সরকারি বিভাগ) এবং ফৌজদারি আইন ইত্যাদি অনেক কিছুই শাফেয়ী মাযহাবের আইনানুগ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করেছেন।

আবু বকর তুরতুশি তাঁর "সিরাজুল মূলক" নামক গ্রন্থে এই পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আরও একধাপ এগিয়েছেন। তিনি নীতি-আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টিকে যাচাই-বাছাই করেছেন। এছাড়াও তিনি এমন কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা ইতোপূর্বে তাঁর পূর্ববর্তী কেউ আলোচনা করেননি। সুলতানের আলোচনার সাথে সাথে তিনিই সুলতানের পতনের কারণসমূহও উল্লেখ করেছেন। এছাড়া প্রজাসাধারণের প্রতি সুলতানের কর্তব্য, সরকারি তহবিলের দায়িত্ব ও ব্যয়ের পন্থা, যুদ্ধের অবিচার ও অশুভ প্রতিক্রিয়া এবং যুদ্ধ ব্যবস্থাপনা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

---

১৮৩ আখ্‌তার-উল্‌-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১।

১৮৪ আল-মাওয়ার্দীর পুরো নাম হচ্ছে– আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন হাবিব আল মাওয়ার্দী। তিনি ৩৬৩ হি./৯৭৩খ্রি. বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং অল্প সময়েই আরবী সাহিত্য, আইনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পরবর্তীতে আইন চর্চাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবন শেষে তিনি বিচার বিভাগের কাযী নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে রাজধানী বাগদাদের কাযীর পদ ও বিচারপতির অলংকৃত করেছিলেন। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের আইন গ্রন্থ- কিতাব আল-ইকনা রচনা করেন। এছাড়াও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য হল- কিতাব আল-হাবী, আদাব আল-দুনয়া ও দ্বীন, সিয়াসত আল-মুলক, কাওয়ানিন আল-ওয়ারা এবং আল-আহকাম আল-সুলতানিয়া প্রভৃতি। ৪৫০হি./১০৫৮খ্রি. ইন্তিকাল করেন। (দ্র. ড. মঈনুদ্দীন খান ও জনাব শামসুদ্দীন, আল-মাওয়ার্দীর আহকাম আল-সুলতানিয়ার দৃষ্টিতে খিলাফতের রাজনীতি, ১৯৮৯ খ্রি., পৃ. ২।)

ইবনে খালদুন এ বিষয়ে প্রামাণ্য-গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে 'আল-তুরতুশির (৪৫১-৫২০হি./১০৫৯-১১২৬ খ্রি..) রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এরিস্টটল লিখিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Politics) গ্রন্থে আলোচ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে মনোজ্ঞ অধ্যায় রয়েছে বটে, তবে তা অসম্পূর্ণ এবং যুক্তির দিক থেকে দুর্বল। একইভাবে ইবনে আল-মুকাফ্ফার[১৮৫] (মৃ. ১৪২হি./৭৫৯ খ্রি.) রচনায় এবং রাজনৈতিক আলোচনায় বহুবার এ বিষয়টির বিভিন্নদিকের উল্লেখ রয়েছে; তবে সেখানেও বিষয়টি গৌণ ও বাগড়ম্বরযুক্ত। অবশ্য, ইবনে খালদুন স্বীকার করেছেন যে, আল-তুরতুশি তাঁর গ্রন্থ 'সিরাজুল মুলক' স্বকীয় ভঙ্গিতে এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন এবং বিষয়টিকে তাঁর মতই (অধ্যায় ও পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু তুরতুশি এ বিষয়টির প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি। আল-তুরতুশি সন্তোষজনক যুক্তির অবতারণা না করেই বিষয়টি শুধু বর্ণনা করে গেছেন। মূলত তিনি সমস্যাটি উত্থাপন করে হাদীসের উদ্ধৃতি টেনে তার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। অর্থাৎ আগাগোড়া তাঁর আলোচনাকে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তবে, এটাকে সম্পূর্ণ নিজের উদ্ভাবিত বিজ্ঞান বা বিষয়ের রূপদান করতে সক্ষম হননি।[১৮৬] ইমাম গাযালী (মৃ. ৫০৫ হি./১১১২ খ্রি.)-এর 'আল-তিব্র আল-মাসবুক ফী নাসাই আল-মুলক" গ্রন্থটি সুলতান মুহাম্মদ ইবনে মালিক শাহের জন্য ফারসী ভাষায় রচনা করা হয়েছে। এছাড়া হিজরি সপ্তম শতাব্দীর শেষ ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পর আল-তিকতিকা নামে পরিচিত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে তাবাতিবা রচিত 'আল-ফখরী ফিল আদব আল-সুলতানিয়া ওয়াল দুয়াল আল-ইসলামিয়া' গ্রন্থটি ইরাকের মুসেল শহরের আমীর ঈসা ইবনে ইবরাহিমের জন্য গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে তিনি সুলতানীয় ও রাজবংশীয় রাজনীতির আলোচনায় একটি সুদীর্ঘ অধ্যায় সংযোজিত করেছেন। এছাড়া তিনি

---

১৮৫ **ইবনুল মুকাফফা:** তিনি আব্বাসীয় খলীফা সাফফাহ ও মানসুরের চাচা ঈসা বিন আলী বিন আব্বাসের কাতিব ছিলেন। আরবী সাহিত্য জগতে তিনি ছিলেন বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক বিরল প্রতিভা। খলীফা আবু জাফর আল-মানসুর আব্দুল্লাহ বিন আলীর 'নিরাপত্তা' সম্পর্কিত চুক্তির মুসাবিদা তৈরি করে অনুমোদনের জন্য তিনি আবূ জাফর আল-মানসুরের বরাবরে পেশ করে ছিলেন। মুসাবিদার শব্দ চয়ন এমনি নিশ্ছিদ্র ছিলো যে পরবর্তীতে মানসূরের পক্ষে 'প্রতিশ্রুতি' প্রত্যাহার করার উপায় ছিল না। ইবনুল মুকাফ্ফার এই লেখনী চাতুর্যে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আল-মানসুর তাকে হত্যার ব্যবস্থা করেন। তার অনুদিত গ্রন্থাবলীর অন্যতম হল- ১) আল-আদাবুস্-সগীর ২) আল-আদাবুল কবীর ওয়াল ইয়াতিমা ৩) রিসালাতুস সাহাবাহ ৪) কালীলা ওয়া দিমনা ইত্যাদি। (দ্র. ইবনে খাল্লিকান : খ.১, পৃ. ২১১; ড. আহমদ আমীন, দুহাল ইসলাম (অনুবাদ), (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৮১-৮৫)

১৮৬ ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

নতুনভঙ্গিতে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করেছেন।[১৮৭] এদিক থেকে বলা যায়, তাঁর রচিত মুসলিম শাসনের ইতিহাসের সূচনা' অধ্যায়, ইতিহাস সমালোচনায় এক নবতর অবদান এবং রাষ্ট্রের অবস্থান পর্যালোচনার পদ্ধতিও বেশ সুন্দর। বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজকে পর্যালোচনার যে বিষয় থেকে ইবনে খালদুনের নতুন সমাজ বিজ্ঞানটির উদ্ভব, তিকতিকার ইতিহাসও সে শ্রেণির মতো। কিন্তু তিকতিকা সম্পর্কে ইবনে খালদুনের জানা ছিল না। এ-গ্রন্থটির প্রকাশ ও প্রচার ছিল সীমিত। অধিকন্ত, ইবনে তিকতিকার রচনা ইবনে খালদুনের তুলনায় অত্যন্ত সংকীর্ণ। এদিক থেকে ইবনে খালদুন পূর্বসূরীকে ছাড়িয়ে গেছেন। তাছাড়া ইবনে খালদুনের পর্যবেক্ষণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এতে তাঁর মৌলিকত্ব ও ক্ষমতা দুটোই সম্পূর্ণ লাভ করেছে।

মোটকথা, ইবনে খালদুনের পূর্বে যে সকল মুসলিম চিন্তাবিদ, রাষ্ট্রীয়, রাজবংশীয় ও সামরিক ও সামাজিক রাজনীতি নিয়ে যা কিছু লিখেছেন, গবেষকগণ তা গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এঁদের কারও রচনার দ্বারা ইবনে খালদুন প্রভাবান্বিত হননি বা সে সকল গ্রন্থ করে সাহায্য গ্রহণ করে নতুন বিজ্ঞানটিকে প্রতিষ্ঠিতও করেননি। যদিও অন্যান্যদের রচনায় এর অতি ক্ষুদ্র আলোচনা পাওয়া যায়। তথাপি ইবনে খালদুন যে বিষয়টিকে 'আল-উমরান' তথা সমাজতত্ত্ব বা মানব সমাজের বিজ্ঞান বলে পরিচয় দিয়েছেন, তা ইবনে খালদুনের পূর্বে কোনো মুসলিম চিন্তাবিদদের আবিস্কৃত নয়।

ইতোপূর্বে রাষ্ট্র ও সমাজের কাঠামোগত অবস্থা সম্বন্ধে গ্রিক দার্শনিকগণ ব্যাখ্যা করেছেন, এর মধ্যে এরিস্টটলের নাম উল্লেখযোগ্য। সেজন্য অনেক গবেষক মনে করেন যে, খালদুন যদি সাহায্য গ্রহণ করেই থাকেন, তবে তিনি প্রাচীনকালের দার্শনিক এরিস্টটলের ভাবধারা থেকে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। কেননা, ইবনে খালদুন এরিস্টটলের দর্শনের সাথে কতিপয় ক্ষেত্রে পরিচিত ছিলেন। তিনি এরিস্টটলের 'পলিটিক্স'-এর যে প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, তাতে এ বক্তব্যের সমর্থন কিছুটা পাওয়া যায়। তবে এটা নিঃসন্দেহ যে, এই সুযোগটুকু তাঁকে তাঁর ইতিহাস-পর্যালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে বা তাঁর সমাজ-দর্শন গঠনে তেমন কোন সহায়তা করেনি।[১৮৮]

---

[১৮৭] ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রাচ্যবাদী আহল ওয়ার্দত প্রকাশিত গ্রিফসওয়াল্ড সংস্করণ এবং জার্মান ভাষায় এটি প্রকাশিত হয়েছে; ইবনে আল-তিকতাকা, আল-ফখরী ফিল আদব আল-সুলতানিয়াহ ওয়া দুওয়াল আল-ইসলামিয়াহ (গ্রেইফ ওয়াল্ড, ১৮৫৮ খ্রি.), পৃ. ১৯-৮৮।

[১৮৮] আখ্‌তার-উল্‌-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৬।

খালদুন সম্পর্কে বোয়ার-বলেন: "His (Ibn Khaldun) Scientific theories were not influenced by religion, as much as they were by Aristotle and Plato. Ibn Khaldun tried to find a new philosophical system, which did not even occur to Aristotle and to create from history a philosophical system. he says that this system is nothing but Social life, all that Society contains, as well as its intellectual culture".

অর্থাৎ, ইবনে খালদুনের বৈজ্ঞানিকতত্ত্বসমূহ ধর্মের দ্বারা কখনো প্রভাবিত হয়নি; বরং এরিস্টটল এবং প্লেটোর যুক্তিশীল ভাবাদর্শের দ্বারাই তাঁর ধ্যান-ধারণা অধিকতর রূপায়িত হয়েছিল। কিন্তু ইবনে খালদুন এমন একটি নতুন দার্শনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলেন, যা এরিস্টটলের চিন্তায় কখনো আসেনি। এর কারণ, খালদুন তাঁর ইতিহাসতত্ত্ব থেকে ঐ দার্শিনিক ব্যবস্থার বিকাশ সাধন করতে চেয়েছিলেন, যা সামাজিক জীবন ভিন্ন অন্য কিছু নয়। অধিকন্তু, সমাজের অভ্যন্তরেই মানুষের বৌদ্ধিক সংস্কৃতিরও উন্মেষ ঘটে। বোয়ার-এর ভাবনায় খালদুনই হচ্ছেন প্রথম চিন্তাশীল ব্যক্তি, যিনি সমাজের বিবর্তন ও প্রগতিকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছেন। খালদুন সামাজিক পরিবর্তনের কারণও অনুসন্ধান করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ভৌগোলিক ও পরিবেশগত উপাদান, উৎপাদনের উপায় এবং বংশগতি ইত্যাদির ভূমিকা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কারণ এসব উপাদান শুধু সমাজ গঠনেই কার্যকর ভূমিকা পালন করে না, মানুষের মনোজগৎ এবং অনুভূতিও এসবের দ্বারা প্রভাবিত হয়।[১৮৯]

ইবনে খালদুন ছিলেন তাঁর অধীত বিষয়ে সর্বেসর্বা এবং তিনি নিজেই এ বিজ্ঞানটির উদ্ভাবক। তিনি নিজেই বলেছেন যে, তাঁর বিজ্ঞানটি সম্পূণ নতুন এবং পূর্ববর্তী চিন্তাবিদগণ যে সকল বিষয়ে আলোচনা করেছেন তা থেকে তাঁর বিজ্ঞানটি পৃথক। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, এটি সম্পূর্ণ নতুন বিজ্ঞান এবং পূর্ববর্তী কোন চিন্তাবিদ এ বিষয়টিকে এতটা বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করে মৌলিক চিন্তাসহ তার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

---

[১৮৯] Mohammad Abdullah Enan, Ibn Khaldun: His Life and Works (New Delhi: Kitab Bhaban, 1997), p. 156.

গবেষকগণের মতে, ইবনে খালদুন আবিস্কৃত এই নতুন বিজ্ঞান তথা সমাজতত্ত্ব বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস, দর্শন, সংগঠন, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির মতই আধুনিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। এজন্যই আধুনিক সমালোচকগণ ইবনে খালদুনকে সমাজতত্ত্বের জনক বলে আখ্যায়িত করেছেন ও স্বীকৃতি দিয়েছেন।

রবার্ট ফ্লিন্ট বলেন, "Plato, Aristotle and Augustine are not his (Ibn Khaldun) peers and all others were unworthy of being even mentioned along with him. He was admirale alike by his originality and Sagacity, his profundity and his comprehensiveness," [১৯০] অর্থাৎ, প্রাচীন গ্রিক ও রোমান দার্শনিক প্লেটো, এরিস্টটল এবং অগাস্টিন-এর কেউই খালদুনের সমকালীন ছিলেন না এবং অন্যরা এমন কি তাঁর সাথে উল্লিখিত হওয়ারও অযোগ্য।"

---

[১৯০] Robert Flint, History the Philosophy of History (London: Gohn Murray, 1969); Issawi, 1969, p.x

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সমাজ বিবর্তন মতবাদ ও ইবনে খালদুন

সামাজিক বিবর্তন

সামাজিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের সমগ্র জীবনধারায় পরিবর্তন আসে। সকল সমাজ ও সংস্কৃতিক পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের মাত্রা কিন্তু সকল সমাজের এরকরূপ নয়। আধুনিক উন্নত সমাজের চেয়ে প্রাচীন ও গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তনের গতি অধিকতর মন্থর। পরিবর্তনের শক্তি সমূহের উপর তার গতি নির্ভর করে।

সমাজ বিবর্তন সম্পর্কে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪)[১৯১] বলেন: "ব্যক্তির ন্যায় সমাজেরও জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু আছে এবং সমাজ দেহের জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয় ও লয় ব্যক্তি দেহের মতই জীব-বিজ্ঞানের নিয়মাধীন। জীব বিজ্ঞানের যে সমস্ত নিয়ম বিশেষভাবে সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাই সমাজবিজ্ঞান। সুতরাং সমাজজীবনের উত্থান ও পতনের প্রাকৃতিক রহস্যই সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।"[১৯২]

প্রাচীনকালে সামাজিক পরিবর্তন বলতে নিম্নস্তর থেকে সমাজের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করা বুঝাতো। গ্রিক ও রোমানদের নিকট এ মতবাদ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে।[১৯৩] তবে প্রাচীনকালের সামাজিক পরিবর্তনের ধারণাকে সমাজবিজ্ঞানীগণ গৌণ হিসেবে অভিহিত

---

[১৯১] আবুল হাশিম এর জন্ম ১৯০৫ সালে বর্ধমান জেলার জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে ঢাকায়। প্রাথমিক জীবনে আইন পেশায় জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে রাজনীতিতে পদার্পণ করেন ১৯৪০-এর দশকে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সেক্রেটারি ছিলেন। শরৎচন্দ্র বসু এবং হোসেন সোহরাওয়ার্দির সঙ্গে তিনিও ১৯৪৭ সনে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অন্যতম সক্রিয় নেতা ছিলেন। ১৯৬৯ সনের গণঅভ্যুত্থানের সময় থেকে তিনি পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও বাঙালি সংস্কৃতির একজন প্রবল প্রবক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। বাংলার রাজনীতিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বিভিন্ন আধুনিক মতোবাদবিজ্ঞান, ইতিহাস দর্শন, ভারতীয় সংস্কৃতি, বাঙালি সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। সমাজ, দশ্ন, আরবী ভাষা, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রয়েছে। ইংরেজি ভাষায় রচিত The Creed of Islam (ইসলামের মর্মবাণী) তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম। ১৯৫০ সালে ঢাকায় প্রকাশিত এ গ্রন্থটি ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আবুল হাশিম ১৯৭৪ খ্রি. সনে মৃত্যুবরণ করেন। (দ্র. ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৭)

[১৯২] আবুল হাশিম, সমাজের জন্ম ও জীবন, ইসলামী ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬১ খ্রি,; সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২০০৮ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৪২।

[১৯৩] গ্রিক কবি হেসিওডের লেখায় এবং রোমান কবি ও দার্শনিক লুকেসিয়াসের গ্রন্থে এ মতবাদ পাওয়া যায়। (দ্র. স্যামুয়েল কোনিগ, সমাজবিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১০)

করেছেন। কারণ, প্রাচীন পণ্ডিতেরা সামাজিক পরিবর্তনকে নৈরাশ্যবাদীর (Perssimist) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করেছেন।

মধ্যযুগে পাশ্চাত্যের লোকেরা সামাজিক পরিবর্তনের সমস্যা নিয়ে এতটা বিব্রত ছিল না। মানুষের প্রধান ঝোঁক ছিল ধর্ম-কর্মে, পার্থিব বিষয়ে নয়। কারণ তখন বিশ্বজগতকে অতিপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করা হত। মানুষ আপন চেষ্টায় তার ভাগ্যের পরিবর্তনে অক্ষম এরূপ একটা ধারণা পোষণ করা হত। সমাজকে অপরিবর্তনীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধকে সনাতন বলে মনে করা হত। বিভিন্ন মতবাদের যখন চরম নৈরাশ্যবাদ ও আত্মসমর্পণ প্রকাশ পেয়েছিল।

স্যামুয়েল কোনিগ এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্পর্কে বলেন, "পরবর্তীকালে চরম নৈরাশ্যবাদিতা ও অসহায় অবস্থা থেকে মানুষের মুক্তি লাভ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ অবস্থার অবসানের জন্য অনেকগুলো কারণ দায়ী। তবে সবচেয়ে বেশি সুসভ্য আরব জাতির অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সভ্যতার আলোকে পাশ্চাত্য জগতে চরম অজ্ঞানতার অবসান ঘটে। মুক্তমন ও বুদ্ধি নিয়ে মানুষকে নির্ভীকভাবে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করার সাহস ও শক্তি যোগায় এই সভ্যতা। মোটকথা, এর ফলে মানুষ তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী হয়ে ওঠে।"[১৯৪]

মধ্যযুগে ইবনে খালদুন সর্বপ্রথম মানব ইতিহাসের ধারাকে স্বাভাবিক (Natural) বিবর্তনশীল (Evolutionary) বলে গণ্য করেছেন। তিনি সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ বিকাশের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। একদিক থেকে তাঁকে সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদের জনক বলা হয়।

দ্য বোয়ার-এর ভাবনায় খালদুনই হচ্ছেন প্রথম চিন্তাশীল ব্যক্তি, যিনি সমাজের বিবর্তন ও প্রগতিকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছেন। খালদুন সামাজিক পরিবর্তনের কারণও অনুসন্ধান করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ভৌগোলিক ও পরিবেশগত উপাদান, উৎপাদনের উপায় এবং বংশগতি ইত্যাদির ভূমিকা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কারণ এসব উপাদান

---

[১৯৪] স্যামুয়েল কোনিগ, সমাজবিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১১।

শুধু সমাজ গঠনেই কার্যকর ভূমিকা পালন করে না, মানুষের মনোজগৎ এবং অনুভূতিও এসবের দ্বারা প্রভাবিত হয়।[১৯৫]

ইবনে খালদুনের মতে, কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির বহু পরিবর্তন হয়। এসব পরিবর্তন এত অদৃশ্যভাবে চলতে থাকে এবং এত বিলম্বে এটি ধরা পড়ে যে, অনেকের পক্ষে এর সুস্পষ্ট ধারণা করা অসম্ভব। ইবনে খালদুন উল্লেখ করেন যে, "পৃথিবীর অবস্থা এবং জাতিসমূহের রীতিনীতি এবং জীবনযাত্রা পরিবর্তনশীল। কালে সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তন চলতে থাকে। এরূপ মানব সমাজের বা জাতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের, নগরের, রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় এবং এটি সদা ক্রিয়াশীল। পরিবর্তন লীলার ঘূর্ণিচক্রের প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের আঞ্চলিক আবহাওয়ায়ও পরিবর্তন হয়। "আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে।"[১৯৬]

অতীতে প্রাচীন ইরানে আর্কিমিনিয়ান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে ঐ এশেরীয় ও নাবাতিয়া, তুব্বায়িত এবং পরে ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়; এই প্রত্যেক জাতির রাষ্ট্র গঠন পদ্ধতি ও শাসননীতি ছিল ভিন্ন। শিল্পকলায়, সাহিত্যে, আচার-ব্যবহারে এবং সামাজিকতায় প্রত্যেক জাতির মধ্যে এক একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সভ্যতায় ও কৃষ্টিতে একে অন্য হতে স্বতন্ত্র ছিল। পরবর্তী যুগে নতুন ইরানে সাসানিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর রোমান জাতি, আরব ও ফ্রাংক জাতির উত্থান ইতিহাসে যুগান্তর আনে।[১৯৭]

ঐতিহাসিক এ পরিবর্তনের কারণ হল- লোকেরা শাসক শ্রেণির রীতিনীতি অনুসরণ করে। প্রবাদ আছে যে, লোকে রাজধর্ম[১৯৮] অনুকরণ করে। বর্তমানে কোন কোন বংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্বপুরুষগণের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির বাহন হলেই আধুনিক প্রথার অভাবমুক্ত হতে পারে না। এদের মধ্যে অতীত ও বর্তমানের সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। এ প্রকারের কোন শাসক গোষ্ঠীর স্থলে অন্য শাসক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হলে লুপ্ত শাসক গোষ্ঠীর রীতিনীতি ও সংস্কার নতুন শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান থেকে সংমিশ্রণ ক্রিয়ার ফলে এক অভিনবত্ব

---

১৯৫ T.J. de Boer, Society and Philosophy in Islam, English Translation, ibid, p. 177-84; Abdullah Enan, Ibn Khaldun, ibid, p. 156-57.

১৯৬ সূরা মু'মিন, আয়াত: ৮৫।

১৯৭ ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, অনুবাদ, গোলাম সামদানী কোরায়শী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫।

১৯৮ ইবনে খালদুন এখানে 'দ্বীন' শব্দ ব্যবহার করেছেন। দ্বীন শব্দের অর্থ হল- জীবনবিধান। এখানে ইবনে খালদুনের দ্বীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল-জীবন ধারণ পদ্ধতি। (দ্র. ইবনে খালদুন মুকাদ্দিমা, (ঢাকা. ইসলামিক ফাউন্ডেশন), প্রাগুক্ত, টীকা, পৃ. ৬৮)

সৃষ্টি করে। শেষে অভিনবত্বের অভাবে প্রাচীনতত্বের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়। এরূপকালে এভাবে নতুন নতুন জাতি জন্ম লাভ করে।[১৯৯]

ইবনে খালদুনের মতে, সমাজ প্রাণশীল এবং সমাজ সংহতিই সমাজের প্রাণ। যতদিন এই সমাজ বেঁচে থাকে এবং সমাজ-সংহতি বিনষ্ট না হয়, ততদিন, সমাজ বেঁচে থাকে এবং সমাজ সংহতি বিনষ্ট হলে সমাজের মৃত্যু ঘটে। তাঁর মতে, সমাজ সংহতির সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ইতিহাসই সমাজ জীবনের জন্ম-মৃত্যুর ইতিহাস। ইবনে খালদুনের মতে, সাধারণ সমাজের আয়ুষ্কাল ছয় পুরুষ। প্রথম দুই পুরুষ জন্ম ও প্রতিষ্ঠার আর দ্বিতীয় দুই পুরুষ বৃদ্ধি ও প্রসারের যুগ এবং শেষ দুই পুরুষ সমাজ জীবনের ক্ষয় ও লয়ের মূল।

ইসলামিক সভ্যতার পতনের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ইবনে খালদুন বলেছেন, আসাবিয়া বা গোষ্ঠী-সংহতির দুর্বলতা ও তিরোভাব সেই সভ্যতার পতনের কারণ। মরুভূমির আবহাওয়ায় যে গোষ্ঠী-সংহতি বিরাজ করে তা প্রতিষ্ঠাতাদের জীবনাদর্শকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে। যখন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর প্রশাসকরা সেই গোষ্ঠী-সংহতি বিসর্জন দিয়ে স্বীয় অভিমানকে বড় করে দেখে তখন পতনের সূত্রপাত ঘটে। ইবনে খালদুনের মতে, এ পতনের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে– অন্যায়-অবিচার। তাঁর মতে, দীপ্তিময় মহানায়কের আবির্ভাব এবং পরিবর্তিত নবন্যায়ে গোষ্ঠী-সংহতির পুনরুজ্জীবন পতনোন্মুখ সভ্যতার স্খলন রোধ করতে পারে।

ইবনে খালদুনের সমাজ পরিবর্তনের চিন্তার সাথে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের চিন্তার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আধুনিক যুগের শুরু থেকে মানুষ নিরবচ্ছিন্ন প্রগতির কথা বিশেষভাবে ভাবতে থাকে। একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে মানুষ সক্ষম, কখনও এরূপ একটা ধারণার বিকাশ হয়। সতেরো শতকের দার্শনিক বেকন সামাজিক পরিবর্তন ও নিরবচ্ছিন্ন প্রগতিকে একার্থবোধক বলে দাবি করেছেন। বিশেষ করে ফরাসি চিন্তাবিদ তুর্গো ও কঁদরসেরের দ্বারা অষ্টাদশ শতকে এ মতবাদটি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। তেমনি ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী কোঁত ও অন্যান্যরাও সমাজ বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করে উচ্চতর স্তরে উপনীত হয়েছে, একথা স্বীকার করেছেন।

---

[১৯৯] ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫; সৈয়দ মোকাররম আলী, ইতিহাসের আরব দর্শন (খুলনা, ১৯৫৮ খ্রি.), পৃ. ১-১৩।

ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী হার্বাট স্পেনসার সামাজিক সোপানের (Stage) দিক থেকে সামাজিক পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, সমাজ ও জীবন উভয়ই বিবর্তনশীল। তিনি প্রগতিকে (Progress) বিবর্তন (Evolution) বলে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ সামাজিক বিবর্তন সর্বদাই উর্ধ্বগামী। সমাজ সবসময়ই নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উপনীত হয়।[২০০]
ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরও অনেক সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক পরিবর্তনের সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা পোরণ করেছেন। এদের মধ্যে রুশ সমাজবিজ্ঞানী মিখাইলভস্কি এবং সলোভিভ অন্যতম। তবে সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিসমূহ সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানীদের ভেতর মতভেদ রয়েছে, কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রণমূলক প্রক্রিয়া সম্পর্কে মোটামোটি একমত বলে ধারণা করা যায়।
আবুল হাশিম বলেন, ভারতের মুঘল সমাজ ইবনে খালদুনের এই অভিমতের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। বাবর ও হুমায়ুন মুঘল সমাজের স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা, আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে হয় এর বৃদ্ধি ও প্রসার এবং এ ইতিহাসবিখ্যাত ভারতীয় মুঘল সমাজের পতন হয় শাহজাহান ও আলমগীরের জীবনকালে। ব্যক্তির ন্যায় কোনো সমাজ স্বল্পায়ু ও কোন কোনো সমাজ দীর্ঘায়ু হয় এবং ব্যক্তির ন্যায় কোনো কোনো বলিষ্ঠ সমাজেরও আকস্মিক মৃত্যু ঘটে; সমাজ-দেহের আকস্মিক ও অপঘাত মৃত্যুর আধুনিক দৃষ্টান্ত হিটলারের ফ্যাসিবাদী জার্মান সমাজ।
আবুল হাশিমের মতে, ইবনে খালদুনের আরেকটি মৌলিক তত্ত্ব এই যে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এবং বাস্তব সম্পদে প্রবল, কিন্তু সমাজ-সংহতিতে বলিষ্ঠ সমাজ তুলনাতীতভাবে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বাস্তব সম্পদে ধনী, কিন্তু সমাজ-সংহতিতে দুর্বল সমাজকে পরাভূত করে থাকে। মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পার[২০১] মতো প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, সে যুগে ভারতবিজয়ী আর্যসমাজ পশুপালক পর্যায়ে ছিল, সেই যুগে বিজিত অনার্য-ভারত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পার্থিব সম্পদ ও জনসংখ্যায় কল্পনাতীতভাবে ঐশ্বর্যবান ছিল; কিন্তু তাদের সমাজ-সংহতি ছিল সে যুগে অত্যন্ত দুর্বল।

---

২০০ স্যামুয়েল কোনিগ, সমাজবিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪।

২০১ প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা এর সময়ে গড়ে উঠেছিল মহেঞ্জোদারো শহর বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে ছিল এর অবস্থান। হরপ্পা ছিল সিন্ধু সভ্যতার প্রধান রাজধানী। ইরাবতী (রাভি) নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল সে সময়ের সমৃদ্ধ এই নগরী। ২৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ নির্মিত এই শহরগুলো ছিল বিশ্বের প্রাচীনতম শহরগুলির অন্যতম এবং প্রাচীন মিসর, মেসোপটেমিয়া ও ক্রিটের সভ্যতার সমসাময়িক। সুবিশাল হরপ্পা সংস্কৃতির আয়তন সব মিলিয়ে ১২,৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার।

একই কারণে মুসলিম বেদুঈন আরবের নিকটে পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল সুসভ্য পারস্য ও পূর্ব-রোমক সামাজ্য। সমাজ-বিজ্ঞানের এই গুঢ় রহস্যকে ইঙ্গিত করে আল-কুরআন ঘোষণা করেছেন যে,

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

"আল্লাহর অনুমতিক্রমে বহুবার সংখ্যার দিক হতে ক্ষুদ্র বাহিনী বড় বড় বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেছে।"[২০২] তালুত ও জালূতের[২০৩] উপাখ্যানে আল-কুরআনের সূরা বাকারার মাঝে এই তত্ত্বের আলোচনা পাওয়া যায়।[২০৪]

---

২০২ আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াতঃ ২৫০।

২০৩ জালুত, তালুত ও দাউদ (আ.)-এর আলোচ্য ঘটনাটি আল্লাহপাক কোরআনের সূরা বাকারার ২৪৯, ২৫০ ও ২৫১নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন। (দ্র. মুফতী মোহাম্মদ শফী, তাফসীরে মারেফুল কুরআন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ১৬৫।)

২০৪ আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪৫।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সমাজ বিবর্তন সম্পর্কে ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা

ইবনে খালদুন একটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজ সংক্রান্ত এ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকেই তিনি মানব সমাজ এবং তার সমূহ বৈশিষ্ট্যকে একটি বিষয়ে রূপান্তরিত করেন। সমাজকে তিনি মানুষের যাযাবর জীবনযাত্রা থেকে রাষ্ট্র ও দেশের পতনের মাধ্যমে স্থায়ী বসবাসের অবস্থা পর্যন্ত সকল পর্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণার মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা চালান। এই গবেষণায় তিনি মানব সমাজের দৃঢ়তা ও দুর্বলতা, নব্য ও পুরাতন যুগ, উত্থান ও পতনের সকল অবস্থার দিকে সমান নজর দিয়েছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইবনে খালদুন সমাজের সুপরিসর ভিত্তির ওপরে ইতিহাসকে দাঁড় করে গেছেন; তাঁর পূর্ববর্তী আর কেউ ইতিহাসকে এভাবে গ্রহণ করেননি।[২০৫]

ইবনে খালদুন বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ বিবর্তনের সারবত্তা বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, জীবনযাত্রা, বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা পর্যালোচনা করেছেন। এর ফলে ইতিহাস ও সমাজের সত্য ঘটনাবলি উদ্‌ঘাটিত ও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হওয়ার যথাযথ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে।[২০৬]

ইবনে খালদুন তাঁর আলোচিত সমাজতত্ত্ব বা সমাজ বিজ্ঞানের গোটা বিষয়টিকে ছয়টি দীর্ঘ অধ্যায়ে বিভক্ত করে বর্ণনা করেছেন। অধ্যায়গুলো আবার বিভিন্ন পরিসর ও পরিমাপের অনুচ্ছেদে উপবিভক্ত এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গাণিতিক বিন্যাসে বিন্যস্ত। অধ্যায়গুলো হল:

১। সাধারণভাবে মানব সমাজ, তার প্রকারভেদ এবং বিশ্বে তার ভূমিকা। অর্থাৎ মানব সমাজ সম্পর্কিত সাধারণ সন্দর্ভ।

২। যাযাবর সমাজ, উপজাতি ও জাতির উদ্ভব।

৩। রাষ্ট্র, খিলাফত, সার্বভৌমত্ব ও শাসকের কার্যাবলি

৪। সভ্যসমাজ, দেশ, শহর ও নগরী

৫। ব্যবসায় ও বাণিজ্য, জীবন যাত্রার পদ্ধতি ও জীবিকা অর্জনের উপায়;

---

[২০৫] আখ্‌তার-উল্‌-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

[২০৬] আল-মুকাদ্দিমা, পৃ. ৩৩।

৬। বিভিন্ন বিজ্ঞান এবং সেসব আয়ত্তের পদ্ধতি।[২০৭]

সাধারণ বিষয়গত এই অধ্যায়-ভাগ থেকেই সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত ইবনে খালদুনের ধারণা সম্বন্ধে জানা যায়। মুকাদ্দিমার আলোচিত বিষয়াদি এবং সে সবের শ্রেণিবিন্যাস পর্যালোচনা করলেই ফুটে উঠে ইবনে খালদুন কিভাবে তাঁর গবেষণাকে সুবিন্যস্ত ও প্রকাশ করেছেন। এছাড়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর চিন্তাধারার উৎকর্ষ, মৌলিকত্ব ও যুক্তির প্রখরতা।

সমাজের উৎপত্তিগত কারণ

আল-মুকাদ্দিমায় ইবনে খালদুন সমাজের উৎপত্তিগত কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথমে মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে মানব ও অন্যান্য জীবনের মধ্যে প্রভেদ হল– মানব প্রথমত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, দ্বিতীয়ত এক সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন শাসনের নিয়ন্ত্রণাধীনে সুষ্ঠু সমাজ জীবন যাপনের অভিলাষী এবং তৃতীয়ত জীবন ধারণের প্রয়োজনে সংঘবদ্ধভাবে বসবাসে আগ্রহী।[২০৮] তিনি বলেন, মানুষের জন্য 'সমাজ' অত্যাবশ্যক। পণ্ডিতগণের ভাষায়– মানুষ স্বভাবগতভাবে শহরে বা নগরবান্ধব।[২০৯]

খালদুন বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক মানুষের জীবনে প্রয়োজনের অন্ত নেই, কিন্তু প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। চার্লস ইসাভি মুকাদ্দিমার সূত্র ধরে বলেন যে, নিদেনপক্ষে একদিনের জীবন যাত্রার কথা যদি ধরা হয়, তাহলেই দেখা যায় যে, এক দিনের জন্য গম সরবরাহ, গম ভাঙ্গানো, আটা মাখানো ও রুটি প্রস্তুতের প্রয়োজন। আবার এসব প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার বাসন-কোসন ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। তার অর্থ এ একদিনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য শ্রমিক, পাচক, ছুতার, কামার, কুমার, কারিগর প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের লোক প্রয়োজন। কিন্তু কোন একজন লোকের পক্ষে এ বহুমুখী প্রয়োজন এককভাবে মেটানো সম্ভবপর নয়। সুতরাং এর জন্য প্রত্যেকের প্রয়োজন তার জ্ঞাতি ভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ করা। তারা যদি এরূপ যৌথ

---

২০৭ Encyclopedia of Islam, Vol. II, p. 632

২০৮ ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, (বৈরুত: ১৮৪৬ খ্রি.), পৃ. ১৩৪।

২০৯ এখানে নগর বলতে এখানে সমাজ বুঝানো হয়েছে। ইবনে খালদুনের মতে:

"الإنسان مدنى بالطبع أى لابد م الإجتماع، إن الإجتماع ضرورى ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم اللذى هو المدينة فى اصطلاحهم وهو معنى العمران

(দ্র. আবদুর রহমান ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা (কায়রো: দার আত্-তাওফিকিয়্যাহ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৪৯।

সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে তবে সার্বিক প্রয়োজনের চেয়ে তারা অনেক বেশি উৎপাদনে সক্ষম হবে।[২১০]

ইবনে খালদুনের মতে, পরিপূর্ণ সহযোগিতা এক জটিল সামাজিক বিবর্তনের সৃষ্টি করে থাকে, যাকে তিনি 'নগরায়ণ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আরবী 'তমুদ্দন' (تمدن) ও গ্রিক 'Town'-থেকে এ শব্দের উৎপত্তি হয়। তিনি মনে করেন, `Man is political by nature' তার মতে, অনুশাসন বাক্যটি এ জন্যই প্রচলিত হয়। আবার মানুষের মধ্যে যেহেতু পশুত্বও বর্তমান, তাই আইন ও ন্যায়বিচারের মাধ্যকে তারা সেখানে নিয়ন্ত্রিত এবং পরস্পরকে গ্রাস করা থেকে বিরত। একমাত্র সে ক্ষেত্রেই সহযোগিতা ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠা সম্ভব। অনুরূপ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হন, ইবনে খালদুন তাঁকে 'ওয়াজী' নাম দেন।[২১১]

ইবনে খালদুন যথার্থভাবে বলেন যে, মানুষের এ পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মনোভাব থেকে সমাজের সৃষ্টি হয়। অতঃপর তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে, সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে এবং অন্যায়ভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের দমনকল্পে অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন দেখা যায় এবং এ প্রয়োজনের ফল হিসেবেই রাষ্ট্রের জন্ম হয়।[২১২]

ইবনে খালদুনের মতে, জীবন ধারণের জন্য মানুষকে যেমন বাধ্য হয়ে জনশক্তির সম্মিলন ঘটাতে হয় এবং তার মাধ্যমে নিজের ও অন্যান্যের আহার্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।[২১৩] ঠিক তেমনি পরস্পরের এরূপ সহযোগিতায় শুধু তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় আহার্যই উৎপাদন

---

২১০ ইবনে খালদুন বলেন:

أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغداء وبما ركب فيه من القدرة على تحصيلية إلا ان قدرة الواحدة من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذالك الغداء غير موفية له بمادة حياته منه ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة منثلا، فلا يحصل إلا بعلاج كثيرة من الطحن والعجن والطبخ وكل واحد من هذه الاعمال لاثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخورى.

(দ্র. আবদুর রহমান ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা (কায়রো, ২০১০ খ্রি.), প্রাগুক্ত, ৫০; Charles Issawi, An Arab Philosophy of History, John Murry (London: 1963), p. 99)

২১১ ড. এম দেলোয়ার হোসেন, ইতিহাসতত্ত্ব (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুন-১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২১৪।

২১২ মো: শরিফুল ইসলাম, সমাজ বিজ্ঞান ও ইবনে খালদুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ খ্রি. পৃ.৮৪।

২১৩ ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

করবে না বরং প্রাচুর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। অনুরূপভাবে প্রতিটি মানুষ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ও স্বজাতির সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। আল্লাহ প্রাণিকুলকে মানুষ অপেক্ষা অনেক গুণ বেশি শক্তি প্রধান করেছেন। যেমন– একটি অশ্বের শক্তি মানুষের শক্তি অপেক্ষা অনেক গুণ বেশি। জীবের মধ্যে আক্রমণ করর স্বভাব যেহেতু প্রকৃতি প্রদত্ত, সেই জন্য আল্লাহ প্রত্যেককে এমন একটি অঙ্গ দিয়েছেন যা দ্বারা সে অপর জীবের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। এর পরিবর্তে মানুষকে দিয়েছেন চিন্তা করার শক্তি ও হাত। চিন্তার নির্দেশে হাত বিচিত্র শিল্প সম্ভব গড়ে তুলতে সক্ষম। আর সেই শিল্পই তাকে দিয়েছে অজস্র হাতিয়ার যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রাণিদের আঘাতকারী অঙ্গ-প্রতঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। তবে এ প্রতিরোধের হাতিয়ারও সে একা লাভ করতে পারে না। কারণ, তার সংখ্যা অনেক এবং তা প্রস্তুত করতে বিচিত্র সব শিল্পকর্মের সাহায্যের প্রয়োজন। এ কারণে বাধ্য হয়ে তাকে স্বজাতির সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। অনুরূপভাবে তার আহায্যের জন্যও পরস্পরের সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু পরস্পরের সহযোগিতা সম্ভব হলে তার আহার্য ও শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের অস্ত্রও হাতে আসবে এবং মানব সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষা ও সমৃদ্ধ সাধনের মধ্য দিয়ে আল্লাহর মহান উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করবে। এ কারণেই মানুষের জন্য এই সমাজবদ্ধ জীবন অত্যন্ত আবশ্যকীয়। এ ছাড়াও মানব জাতির জন্য সমাজ প্রয়োজনের অন্য কারণ হলো, সমাজ না থাকলে সৃষ্টি ও বিশ্বপ্রভুর খিলাফতের প্রতিনিধিত্বের কাজ সম্পাদন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো না। এটাই সমাজবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।[২১৪]

সমাজের ক্রমবিবর্তন

মানব সমাজের উপত্তি ও ক্রমবিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইবনে খালদুন বলেন:

ক) উদ্ভিদ জগতের সমপর্যায়ে মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় এবং অতি সরল চাহিদা হলো খাদ্য ও প্রজননের। এই চাহিদা দুটি পূর্ণ করার জন্য মানুষ সংঘবদ্ধ হয়, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহে ও খাদ্য উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়; প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে সমর্থ হয় এবং অন্যান্য উপসর্গজনিত কাজ কর্ম সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারে। সংঘবদ্ধভাবে উক্ত কাজকর্মে বিশেষজ্ঞতা অর্জন ও শ্রমবিভক্তিকরণের মাধ্যকে তারা জীবন ধারণের

---

[২১৪] মোঃ রমজান আলী, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক (ঢাকা: প্রগতি পাবলিশার্স, ২০১০ খ্রি.), তৃতীয় প্রকাশ, পৃ. ২৬৪-২৬৫।

সমষ্টিগত চাহিদাগুলি পূর্ণ করতে সমর্থ হয়, যা কারো দ্বারা একা একা সম্ভব হয় না।[২১৫]

খ) অধিকন্তু, বন্যজন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষের আত্মরক্ষামূলক বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে মানুষ একমাত্র সমষ্টিগত বা সাম্প্রদায়িক আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। যেহেতু অনেক বন্যজন্তু থেকে মানুষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল, বন্যজন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাকে চিন্তাশক্তি ও ব্যবহারিক যুক্তির আশ্রয় নিতে হয়। কারণ, চিন্তা ও যুক্তিবলে সে অন্যান্য প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী এবং চিন্তা ও যুক্তি তাকে হাতিয়ার ও সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করার ক্ষমতা ও নিপুণতা যোগায় এবং সাম্প্রদায়িক জোট গঠন করার জন্য বুদ্ধি, কর্মোদ্যম ও প্রেরণা দান করে।[২১৬]

প্রয়োজনাত্মক সমাজ

আদিম স্তরের সমাজকে ইবনে খালদুন জরুরিয়া বা 'প্রয়োজনাত্মক সমাজ' নামে অভিহিত করেছেন। ইবনে খালদুন বলেন: "মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজগুলি মিটাবার জন্য এতটুকু সমাজ ব্যবস্থা অপরিহার্য, কারণ এ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব।"[২১৭]

প্রয়োজনাত্মক সমাজের মাধ্যমে মানুষ 'ভাল জীবন' বা আরামের জীবন প্রত্যাশা করে না। বরং এরূপ সরল সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে সে তার নিছক অস্তিত্ব বজায় রাখার আশা পোষণ করে। এরূপ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কৃত্রিমতা নেই। এটা প্রাকৃতিক সমাজ, কারণ খাদ্য সংগ্রহ ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজন মানুষের প্রকৃতিগত।

সমাজ ব্যবস্থার এই আদিম প্রয়োজনাত্মক স্তরে পরস্পর ইতিবাচক সূত্রের মুখোমুখি, ইবনে খালদুন একটি নেতিবাচক সূত্রের আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন যে, প্রয়োজনাত্মক সমাজ ব্যবস্থা যা মানুষকে খাদ্য ও নিরাপত্তা প্রদান করে, একেবারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে, তা থেকে একটি বিপরীতমুখী শক্তির উৎপত্তি হয়। এই বিপরীতমুখী শক্তির মধ্যে উক্ত সমাজ

---

২১৫ ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, বাংলা অনুবাদ, গোলাম সামদানী কোরায়শী (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১১৫: প্রথম প্রস্তাবনা দ্রষ্টব্য; Muhsin Mahdi, Ibn Khaldun's Philosophy of History (USA: University of Chicago Press, 1964), p. 204; E. I. J. Rosenthal, Political Thoght in Medieval Islam: An Tntroductory Outline (U.S.A.: Cambridge University press, 1962), p, 260-62.

২১৬ Muhsin Mahdi, ibid, p. 28.

২১৭ Muhsin Mahdi, ibid, p. 28; E. I. J. Rosenthal, p. 260.

ব্যবস্থার ধ্বংসের বীজ লুকায়িত থাকে। এবং এটা উক্ত সমাজ ব্যবস্থাকে ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এই ইতিবাচক-নেতিবাচক সূত্র তার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। অনুরূপ তার্কিক ভিত্তিতে আঠারো শতকের শেষার্ধে এবং ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে কান্ট, ফিক্‌টে, শেলিং ও হেগেল প্রসিদ্ধ ডাইলেকটিক্যাল মেথড্-এর উদ্ভাবন করেন।[২১৮] আর হেগেলের এই ইতিবাচক-নেতিবাচক সমন্বয় বাচক ডাইলেকটিক্যাল পদ্ধতিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে কার্ল মার্কস মার্কসবাদের গোড়াপত্তন করেন।[২১৯]

ইবনে খালদুনের মতে, ইতিবাচক প্রয়োজনাত্মক সমাজের 'নেতিবাচক' প্রতিবিম্ব হিসেবে প্রয়োজনাত্মক সমাজ থেকে আয়াসী সমাজের উৎপত্তি হয়।

আয়াসী সমাজ

মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের ধারায় প্রয়োজনাত্মক সমাজ যখন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এটা (ক) পরস্পর সহযোগিতা; ও (খ) শ্রম বিভক্তিকরণের মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করে। ফলে যে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার উদ্ভব হয় তা ক্রমশ প্রয়োজনাত্মক সমাজকে সামাজিক ক্রমবিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ে 'আয়াসী সমাজে' রূপান্তরিত করে।

'আয়াসী সমাজ' মানুষ নিছক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য লালায়িত নয়। এই স্তরে সে আরাম আয়াসের সন্ধানে ব্যাপৃত হয়। অন্যের সম্পত্তির উপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং অন্যের সম্পত্তি জবর দখল করতে সচেষ্ট হয়। ফলে সমাজে রেষারেষি, দ্বন্দ্ব রক্তারক্তি এবং সর্বময় অনিশ্চয়তার উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ এ অবস্থায় মানুষ সীমালংঘন করতে আরম্ভ করে।[২২০]

জবর দখলের দাপটে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে ক্ষতিকারকের মতই উষ্মা, গর্ব ও প্রতিহিংসা পরায়ণতার পাশবিক প্রবৃত্তিগুলোর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় এবং নিজ নিজ সম্পত্তি পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করে। সে সীমালংঘনকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, যুদ্ধ করে ও তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে। এরূপ অবস্থা সমাজে অরাজকতার জন্ম দেয় ও যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করে। মানুষ বন্য পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনাত্মক সমাজে পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে যে হাতিয়ার ও সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছিল, 'আয়াসী সমাজে'র

---

[২১৮] Muhsin Mahdi, ibid, p. 28.

[২১৯] ibid, p. 39-40.

[২২০] ibid, p. 42-43.

অরাজকতার মুখে সেগুলি মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার শুরু করে এবং তারই সাহায্যে সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে।[২২১]

সুতরাং সবার বিরুদ্ধে সবার যুদ্ধ মানুষকে এক মহা অরাজকতাপূর্ণ নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করে। অন্য কথায়, আয়াসী সমাজে মানব প্রকৃতির ইতিবাচক-নেতিবাচক সূত্র তার সৃজন শক্তির সাতে একজোট হয়ে মানুষকে পুনরায় এমন একটি সন্ধিক্ষণে উপনীত করে যেখানে তার অস্তিত্ব পুনরায় বিপন্ন হয়। অতএব, পুনরায় নিরাপত্তা বিধানের জন্য নেতিবাচক-ইতিবাচক সূত্রে মানুষ তৃতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্র গঠন করে, যা পরবর্তী যুগের হব্‌সের কমনওয়েলথ-এর সাথে তুনলীয় ও পথ প্রদর্শক।[২২২]

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

সামাজিক ক্রমবিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ে 'আয়াসী সমাজের' অরাজকতার হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য ইবনে খালদুনের মতে, এমন একটি 'প্রতিরোধক' শক্তির প্রয়োজন হয় যার মাধ্যমে মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তির উন্মত্ততাকে দমন করা যায় এবং মানুষের মধ্যে পরস্পর সুসম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। তিনি বলেন: "মানব সমাজ সংগঠিত হয়ে দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়ার পর একটি প্রতিরোধকারী শক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়, যার মাধ্যমে মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তিপ্রসূত পরস্পরের আক্রমণাত্মক ও অত্যাচারজনিত কার্যকলাপ থেকে মানুষকে বিরত রাখা যায়। বন্যপশুদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য (মওজুত) অস্ত্র-শস্ত্র, মানুষ থেকে মানুষের আত্মরক্ষার জন্য 'প্রতিরোধক' হয় না। কেননা প্রত্যেক মানুষই এগুলো সমভাবে ব্যবহার করতে পারে। মানুষের নিজেদের মধ্যে ছাড়া অন্য কোন দিক থেকেও এরূপ 'প্রতিরোধকের' আবির্ভাব হতে পারে না। কারণ, চিন্তাশক্তির দিক থেকে অন্যান্য প্রাণি মানুষের চেয়ে পশ্চাৎপদ। অতএব, এমন মানুষকেই এরূপ প্রতিরোধ অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে যে সুদৃঢ় শক্তি ও ক্ষমতা ধারণ করে, প্রত্যেককে প্রত্যেকের উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম। অর্থাৎ সে সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং সার্বিক ক্ষমতা মানবিক বিশেষত্ব, মানব প্রকৃতির অনুকূলে এবং মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য।"[২২৩]

---

[২২১] Muhsin Mahdi, p. 44-45.

[২২২] ibid, p. 46-47.

[২২৩] ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ খ্রি.), প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৭; ১১৬-১৭।

সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

সমাজ বিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইবনে খালদুন সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন, বস্তুর সঙ্গে আকারের যে সম্পর্ক সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের সে সম্পর্ক। আকার যেমন প্রকৃতিগতভাবে বস্তুকে সংরক্ষণ করে এবং একটি থেকে আরেকটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, দার্শনিক মতে রাষ্ট্রও তদ্রুপ সমাজকে সংরক্ষণ করে এবং সমাজের সঙ্গে তারও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সমাজ ছাড়া রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না এবং মানুষের আগ্রাসী প্রবৃত্তির কারণে রাষ্ট্র ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব অসম্ভব। কারণ সমাজের জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। ধর্মভিত্তিক বা রাজতান্ত্রিক যাই হোক না কেন; এভাবেই একটি 'পলিটি'র উদ্ভব হয় এবং একেই আমরা রাষ্ট্র বলে অভিহিত করি।[২২৪]

মানবপ্রবৃত্তির শ্রেণিবিভাজন

মানব সংগঠনগুলোর মধ্যে আকার, গুণ ও প্রভাবের ক্ষেত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় কেন- এ প্রশ্নের উত্তরে ইবনে খালদুনের অভিমত, মানুষের মনে সহযোগিতার অভিপ্রায় জাগ্রত করানোর জন্য প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা এবং অনুপ্রেরণা থাকা অপরিহার্য। এ অনুপ্রেরণাকে তিনি 'আসাবিয়া' বলে অভিহিত করেন। ইবনে খালদুন মানবপ্রবৃত্তিগুলোর যে পর্যায়ক্রমিক শ্রেণি বিভাজনের উদ্ভাবন করেন, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

প্রথম স্তরের প্রবৃত্তি: প্রথম স্তরের মৌলিক ও দৈহিক চাহিদাজনিত নিম্নস্তরের প্রবৃত্তিগুলো যেমন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানাহারের প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা, দৈহিক আরামের জন্য বস্ত্র, আশ্রয় ও বাসস্থানের সংস্থান করার বাসনা ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বংশবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা। এ প্রবৃত্তিগুলোর অস্তিত্ব মানুষের জীবনের প্রাথমিক ধাপ থেকেই পরিলক্ষিত হয় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টির প্রধান কারণস্বরূপ কাজ করে। মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নির্ঘাত প্রয়োজন হওয়ায় প্রবৃত্তিগুলো অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় প্রবৃত্তিগুলোর মত তত পরিবর্তনশীল বা বৈচিত্র্যময় হয় না। এগুলোর তারতম্য শুধু স্থান, কাল ও পাত্রভেদে পরিতৃপ্তির 'আপেক্ষিক' চাহিদা ও মাত্রা অনুযায়ী হয়ে থাকে।[২২৫] উল্লেখ্য, প্রথম স্তরের প্রবৃত্তিগুলো তিনভাবে জাগরিত হতে পারে:

---

[২২৪] মো: শরিফুল ইসলাম, সমাজ বিজ্ঞান ও ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

[২২৫] Muhsin Mahdi, p. 176-177.

ক। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে।

খ। পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার ক্ষতিকর প্রক্রিয়া হতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে।

গ। মানুষের দৈহিক চাহিদার তাকিদে।

দ্বিতীয় স্তরের প্রবৃত্তি: এগুলোর মৌলিক প্রবৃত্তিগুলো উপরোক্ত প্রাথমিক প্রবৃত্তিগুলোর নিকটতম, যথা: উষ্মা ও প্রতিহিংসা চরিতার্থকল্পে বাসনা। এগুলোর বিপরীত হল প্রশান্তি যা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর অর্জনের পথ উন্মুক্ত হওয়ার দ্বারা লাভ হয়। অতএব, বিজয়ের মাধ্যমে 'প্রশান্তি' লাভ করাই উষ্মার লক্ষ্য।

তৃতীয় স্তরের প্রবৃত্তি: তৃতীয় স্তরের মৌলিক প্রবৃত্তি, যেমন ভয়। ভয়ের লক্ষ্য নিরাপত্তা ও আশা অর্জন করা অর্থাৎ ভরসা লাভ করা। অতএব, ভয়ের লক্ষ্যে নিরাপত্তা, উন্নতি ও প্রশান্তি আয়ত্ব করা এবং কোন গভীর আকাঙ্ক্ষার কারণ হতে মুক্ত হওয়া।

চতুর্থ স্তরের প্রবৃত্তি: এ স্তরের মৌলিক প্রবৃত্তি হল সাহচর্যের ইচ্ছা। অর্থাৎ এমন লোকের সাহচর্য কামনা করা যার সঙ্গে 'আত্মীয়তার বন্ধন' বা বিশেষ দিক দিয়ে সাদৃশ্য বিদ্যমান। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতকগুলো বাসনা এর আওতায় পড়ে। যেমন:

ক। পরস্পর সহযোগিতার বাসনা;

খ। জীবনের সাথী হিসেবে বা বন্ধুস্বরূপ এক সাথে বসবাস করার বাসনা,

গ। আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য ও রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য মরণপণ বাসনা এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে এরূপ জীবন-মরণ অভিজ্ঞতাসুলভ সাহায্য ও সহযোগিতা 'প্রতিদান' স্বরূপ লাভ করার বাসনা।[২২৬]

সমাজ গঠন

এ স্তরেই ইবনে খালদুন সমাজ গঠনের তাকিদজনিত কতকগুলো ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উৎপত্তি লক্ষ করেন এবং বলেন যে, সাহচর্যের মৌলিক প্রবৃত্তি মানুষকে সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং সমাজ গঠন করে সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে এ সাহচর্যের প্রবৃত্তি অত্যন্ত শক্তিশালী 'কার্যকারক' হিসেবে কাজ করে। উপজাতীয় ও গোত্রীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এটা শক্তিশালী 'সামাজিক সংহতি'র উৎস বা 'সংসক্তি' স্বরূপ কাজ করে, যা আরবী ভাষায় 'আসাবিয়া' নামে পরিচিত।

---

[২২৬] প্রাগুক্ত।

এ সাহচর্যের প্রবৃত্তির বিপরীত হল 'প্রতিহিংসা', যা শক্রুতার স্বাভাবিক উৎস এবং অন্যদের ধ্বংস কামনার সূত্র।

পঞ্চম স্তরের প্রবৃত্তিঃ পঞ্চম স্তরে মৌলিক প্রবৃত্তিগুলো 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া' জনিত কামনা। এগুলো উপরোক্ত প্রবৃত্তিগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মৌলিক ও মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয়। এগুলো সমাজ গঠনের পর সমাজের অভ্যন্তরীণ পরস্পর সম্পর্কে আত্মপ্রকাশ করে।

যেমন, (ক) তগল্লব– আধিপত্য বিস্তার করা, পদানত করা, বশীভূত করা বা জবর দখলের ইচ্ছা অর্থাৎ আগ্রাসনের ইচ্ছা।

(খ) রিয়াসত– ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা বা নেতৃত্ব কায়েম করার ইচ্ছা।

(গ) কাহার- জবরদস্তি করা, বিধ্বংসী শক্তির ব্যবহার করা, সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার বাসনা, সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অভিলাষ। এক কথায় নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা।

আত্ম-প্রতিষ্ঠা

উল্লিখিত ত্রিবিধ আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিগুলো স্বভাবত বিজয়াকাঙ্ক্ষীদের মতে 'ক্ষমতা' অর্জনের অভিলাষ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যোগায়, যার মাধ্যমে তারা অন্যদের উপর নেতৃত্ব কায়েম করার প্রয়াসী হয়। বিজয়াকাঙ্ক্ষীদের মুখোমুখি যারা সংগ্রাম থেকে বিরত থাকে বা সংগ্রামে হেরে যায় ও বিজিত হয়, তারা বিলীন হয়ে যায়। কারণ, 'স্বাধীনতা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি' এবং 'দাসত্ব মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ'। স্বাধীনতা মানুষকে আশান্বিত করে আর দাসত্ব মানুষকে নিরাশ ও হতাশ করে।

ষষ্ঠ স্তরের প্রবৃত্তিঃ উপরোক্ত বিজয় ও ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা মানুষের অন্য কতকগুলো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জনিত প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত হয়। যথা, সুনাম ও গৌরব অর্জন করার বাসনা এবং আভিজাত্য ও সম্ভ্রান্ততা প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা। আরো লক্ষণীয় যে উপরোক্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীল ইচ্ছাগুলো অন্য কতকগুলো ইচ্ছার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, অন্যদের (ক) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, খ) দেশে অনুশাসন কায়েম করে, প্রতিরক্ষার বন্দোবস্ত করে, জনকল্যাণমূলক-যেমন রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ করে, (গ) জনগণের ভালোবাসা, সম্মান ও প্রশংসার পাত্র হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, (ঘ) যা বিজয় ও ক্ষমতালোভের ইচ্ছার জন্ম দেয়।

ইচ্ছাচক্র: এ স্তরে ইবনে খালদুন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সামাজিক প্রক্রিয়া লক্ষ করেন। তিনি বলেন যে, (ক) অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছার সঙ্গে একদিকে (খ) জনগণের ভালোবাসা, সম্মান, প্রশংসা অর্জন করার অভিলাষ যেমন জড়িত, তেমনি অন্যদিকে (গ) ধন-উপার্জনের বাসনাও সম্পর্কযুক্ত। এককথায়, সম্মান লাভ করা ও সম্পদ বা ধন উপার্জন করা– এ দুয়ের মধ্যে একটা গভীর সংযোগ বিদ্যমান।[২২৭]

মানব-প্রকৃতি

মানব-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ইবনে খালদুন বলেন যে[২২৮], মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ এই দুই প্রকার গুণই বিরাজমান। এ প্রসঙ্গে কুরআন থেকে তিনি উদ্ধৃত করেন যে, আল্লাহ বলেন–

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

"আমি তাকে দু'টি পথ দেখিয়েছি।"[২২৯] আল্লাহ আরও বলেন,

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

"আত্মাকে অনুপ্রাণিত করেছি দুষ্ট বুদ্ধি এবং আল্লাহভীতি দ্বারা।"[২৩০] মানুষ যেমন ভালো কাজ করে তেমনিভাবে সে দুষ্ট বুদ্ধি দ্বারাও তাড়িত হয়, এ দ্বারা অপরের ক্ষতি করার জন্য লিপ্ত হয়। এ হলো মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট বৈরী অবস্থা। আবার দেখা যায়, প্রকৃতিও কিছু কিছু বৈরী অবস্থা সৃষ্টি করে যা মানুষের নিরাপদ বসবাসের অন্তরায়। মানুষ ও প্রকৃতি উভয় কর্তৃক সৃষ্ট বৈরী অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মানুষ সমাজ গঠন করে। তারা কিছু নিয়মনীতি তৈরি করে এবং এসব নিয়মনীতি মানার মধ্য দিয়ে সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে। সুতরাং প্রকৃতি ও মানুষ উভয় কর্তৃক সৃষ্ট বৈরী অবস্থায় নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই মানুষ সমাজ গঠন করে এবং এর মাধ্যমে একটি নিরাপদ জীবনযাপনের চেষ্টা করে। কেননা কোনো অবস্থাতেই মানুষ একা তার সকল প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। এ অতি প্রয়োজনীয় সমাজ গঠনের উপাদানের ব্যাখ্যায় ইবনে খালদুন যে বিষয়টির উপস্থিতি অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন তা হল-আসাবিয়া। এই আসাবিয়া প্রত্যয় তাঁর সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের মূল প্রত্যয়। এই উপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে আরব বেদুঈনদের জীবন প্রণালী, বিকশিত হয় তাদের

---

[২২৭] Muhsin Mahdi, p. 176-179; মো: শরিফুল ইসলাম, সমাজ বিজ্ঞান ও ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬।

[২২৮] মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, অনুবাদ, এডভোকেট মো: মোস্তফা জামাল ভূঞা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ২২৮।

[২২৯] আল-কুরআনুল কারীম, সূরা বালাদ, আয়াত: ১০।

[২৩০] আল-কুরআনুল কারীম, সূরা শামস, আয়াত: ০৮।

সামাজিক জীবন এবং দৃঢ়তর হয় তাদের সামাজিক বন্ধন। আবার কোনো সমাজ, সাম্রাজ্য ও রাজবংশের পতনের মূলেও রয়েছে আসাবিয়া।[২৩১]

সামাজিক বন্ধন

আসাবিয়ার স্বরূপ বর্ণনায় ইবনে খালদুন একে 'সামাজিক বন্ধন' হিসেবে উল্লেখ করেন। এটি হচ্ছে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের গভীর 'আমরা অনুভূতি'। এই বন্ধনে আবদ্ধ থাকা ব্যক্তিবর্গ নিজেদেরকে কখনো নিজ গোত্র থেকে ভিন্ন কোনো সত্তা হিসেবে কল্পনা করে না। এরূপ একটি সমাজে গোত্রের সদস্যবৃন্দ গোত্র কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন যথাযথ পালন করে এবং গোত্রের বিধিনিষেধ পুরোপুরি মেনে চলে। আসাবিয়া বা কৌম-চেতনা নির্ভর সমাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে অনুপম সেন বলেন: "কৌম সমাজের বৈশিষ্ট্য হল, সেখানে সামাজিক সংহতি থাকে প্রবল। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দিষ্ট স্থান থাকে, যা তাকে সামাজিক নিরাপত্তা দেয়। কৌম সমাজে সুনির্দিষ্ট বাধানিষেধ বা taboo কাজ করে যেগুলো সমাজের দৃষ্টিতে অলঙ্ঘনীয় বলেই মনে হয়।"[২৩২]

আবহাওয়া ও জলবায়ু (Weather and Climate)

ইবনে খালদুন সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সূত্র ধরে সমাজের মানুষের চরিত্র, নৈতিক গঠন, রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ওপর আবহাওয়া ও ভৌগলিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে এক মৌলিক ও তথ্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেন। তার মতে, যে কোনো দেশের সমাজ ও সরকারের উপর সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগলিক অবস্থা এবং আবহাওয়ার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব লক্ষ করা যায়। অষ্টাদশ শতকে মন্টেস্কু তার বিখ্যাত গ্রন্ত 'The Sprit of the Laws'-এর উল্লেখ করেছেন অথচ তার কয়েক শতাব্দী আগেই মুকাদ্দিমায় খালদুন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

ইবনে খালদুনের মতে, পৃথিবীর যে সকল দেশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত সেখান প্রধান প্রধান বিজ্ঞান ও কলার উদ্ভব হয় এবং খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানীরা জন্মগ্রহণ করেন। পাশাপাশি যে সকল দেশের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন সে সকল দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টি নিম্নমানের হয়ে থাকে। বিষুব রেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারীগণ অত্যধিক গরমের

---

[২৩১] আখ্তার-উল্-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

[২৩২] অনুপম সেন, ব্যক্তি ও রাষ্ট্র: সমাজ বিন্যাস ও সমাজ-দর্শনের আলোকে (ঢাকা: অবসর প্রকাশনী, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৫-১৬।

কারণে প্রগতি অর্জনের পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তার মতে, চরম উষ্ণ অঞ্চলে জনবসতি কম হওয়ার কারণে সেখানে জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠোর। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জনবসতি বেশি। আবার এ এলাকার লোকজন সংযমী, মিতব্যয়ী ও কৃষ্টিবান হয়। এজন্য সেখানে নতুন নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে এবং তাদের সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ স্বাভাবিকভাবেই উন্নত হয়। গ্রিক, রোমান, পারসিয়ান, আরব প্রভৃতি জাতির বসবাস নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে। আধুনিককালের পাশ্চাত্য দার্শনিক জিন বোডিন, মন্টেস্কু প্রমুখ ইবনে খালদুনের এ তত্ত্ব দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। মধ্যযুগে প্রণীত ইবনে খালদুনের মতবাদ এ সমস্ত আধুনিক যুগের বহু সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদকে প্রভাবিত করেছে। যাদের মধ্যে স্পেঙ্গালার (Spengler), টয়েনবি (Toynbe), প্যারেটো (Pareto), সরোকিন (Sorokin) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। [২৩৩]

---

[২৩৩] ড. সেলিনা আহমেদ ও ড. খ ম রেজাউল করিম, সমাজবিজ্ঞান (ঢাকা: অক্ষরপত্র প্রকাশনী, ২০১৩ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪৩।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
'আসাবিয়াতত্ত্ব' বা সামাজিক সংহতি

ইবনে খালদুনের মতে রাষ্ট্রীয় শক্তির মূল অনুপ্রেরণা আসে 'গোষ্ঠী-সংহতি' থেকে। এ গোষ্ঠী-সংহতিকে তিনি 'আসাবিয়া' (Asabia) বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি 'আসাবিয়া' প্রত্যয়টির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ এবং অবক্ষয়ও আলোচনা করেছেন।

আবাবিয়ার আভিধানিক অর্থ- 'জ্ঞাতি সম্পর্ক' অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা। আরবদের সাধারণ ব্যবহারে এটা উপজাতীয় গোত্রগুলির 'আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক' নির্দেশ করে।[২৩৪] ইবনে খালদুন এই শব্দটি রাজনৈতিক পরিভাষায় 'কারণতাত্ত্বিক' অর্থে ব্যবহার করেন, যার অর্থ দাঁড়াবে- 'সামাজিক সংহতি, একমনা ভাবধারা ও একজোটিয় কর্মোদ্যম।' অতএব, ইবনে খালদুনের পরিভাষায় 'আসাবিয়া' হল সংশ্লিষ্ট সমাজের রূপরেখায় মুখোমুখি আপেক্ষিক মান অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিকভাবে 'পারিবারিক সংহতি', 'গোত্রীয় সংহতি', 'সামাজিক সংহতি', 'ধর্মীয় সংহতি', 'দলীয় সংহতি' এবং 'জাতীয় সংহতি' ইত্যাদি বুঝায়। ইবনে খালদুনের মতে, এ গোষ্ঠ সংহতি যেমন ধর্মীয় ভিত্তিতে হতে পারে, তেমনি তা ধর্মভিত্তিক নাও হতে পারে।[২৩৫]

আসাবিয়ার উৎপত্তি

ক। রক্তের সম্পর্ক : রক্ত সম্পর্কের মধ্যে একটা চলচ্ছক্তি বিদ্যমান যা প্রায় লোকের ক্ষেত্রে কার্যকর। আত্মীয়-স্বজনের উপর কোনোরূপ আঘাত আসলে তা স্বাভাবিক কারণে আপনজনদের বিব্রত করে। ফলে তারা এর প্রতিরোধের জন্য একত্রিত হয়। এ প্রতিরোধ করার আবেগ মানুষের প্রকৃতিগত এবং তার সত্তার মধ্যে এ অনুভূতি গভীরভাগে প্রোথিত। অধ্যাপক এরউইন রোজেন্থাল বলেন: 'ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ কতকগুলো সমভাবাপন্ন মানুষের সক্রিয় সমর্থন প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্বে রক্ত ও পারিবারিক

---

২৩৪ 'আসাবিয়া' বা গোত্রপ্রীতি শব্দটি 'আসাবা' শব্দের ক্রিয়া বিশেষ্য। এর মূল অর্থ- ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন যারা তার পিতৃবংশীয় জনগোষ্ঠীকে শত্রুর হাত থেকে সুরক্ষিত রাখে। এ অর্থে এটি প্রশংসীয় তবে হাদিসে

ليس منا من دعا عصبية وليس منا من قاتل على عصبية

বলে যে নিন্দনীয় আসাবিয়ার কথা বলা হয়েছে তাহল- ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা না করে পক্ষপাতমূলক গোত্রপ্রীতি।

২৩৫ মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দীন, রাষ্ট্রচিন্তা (রাজশাহী: মৌসুমী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২৮১।

ঐতিহ্যের বন্ধন, সংহতি ও পারস্পরিক দায়িত্বশীল বা অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির যে অনভূতির সূচনা করে, তা ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে এবং একেই 'আসাবিয়া' বলে অভিহিত করেন এবং 'মুল্ক' বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এর মূল লক্ষ্য। খোদ সংঘের প্রয়োজনের মতই এ শক্তির প্রয়োজন। কারণ এ শক্তি দ্বারা মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে সংঘ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।[২৩৬]

ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমায় বলেন: "আসাবিয়া কেবল রক্ত বন্ধনে সম্পর্কিত দলের মধ্যে পাওয়া যায় অথবা অন্যান্য দলের এরূপ বন্ধনের কাজ সম্পাদন করে। কারণ, রক্তের বন্ধনের মধ্যে একটি চলৎশক্তি বিদ্যমান থাকে যা প্রায় লোকের মধ্যে কার্যকর হয় এবং আত্মীয়-স্বজনের উপর কোন প্রকার আঘাত এলে তাদেরকে বিব্রত করে। মানুষ আত্মীয়-স্বজনের উপর অত্যাচার অপছন্দ করে ও এর বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করে। এদের বিরুদ্ধে যে কোনরূপ আঘাতের প্রতিরোধ করার আবেগ, মানুষের প্রকৃতিগত ও তার সত্ত্বার মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত।"[২৩৭]

(খ) পারস্পরিক সাহচর্য: পারস্পরিক সাহচর্য আসাবিয়ার উৎপত্তির অন্যতম কারণ। কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহযোগীরাও প্রায়শ তাঁর সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনের মতই সম্পর্কিত হয়। দীর্ঘদিন সহাবস্থানের ফলে তাদের মধ্যে গভীর সম্পর্কে সৃষ্টি হয় এবং পরস্পরের প্রতি আস্থাবান ও সহানুভূতিশীল মনোভাবাপন্ন হয়, যা 'গোত্রীয় সংহতি' বা 'আসাবিয়া'র উদ্ভব ঘটায়।

(গ) বিবিধ কারণ: উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও আরও কতিপয় কারণে 'আসাবিয়ার'র উৎপত্তি ঘটতে পারে। যেমন, এক সঙ্গে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক, পারস্পরিক সাহচর্য, সুদীর্ঘদিনের পরিচয় বা একই সাথে প্রতিপালিত হওয়া দু' ভাই-বোন এবং অনুরূপ জীবন মৃত্যুর সম্পর্কযুক্ত কারণে দলীয় বন্ধন বা সংগতি গড়ে ওঠে। ইবনে খালদুন বলেন, 'গোষ্ঠী-মানসের (আসাবিয়া) প্রথম উন্মেষ সূচিত হয় পরিবার এবং গোত্রীয় জাতিবোধের মাধ্যমে। অতঃপর গোত্রীয় এলাকা সম্প্রসারিত হয়ে যখন রাষ্ট্রের আবির্ভাব আসন্ন হয়ে দাঁড়ায় তখন দেখা যায় যে, গোত্রের মধ্যে অভিন্ন অনুভূতির একটিমাত্র সাফল্যের জায়গায় একাধিক সাফল্যের (বা গোষ্ঠী-মানসের) উদ্ভব হয়েছে। এসব গোষ্ঠী-মানসের মধ্যে অনিবার্য সংঘাত

---

[২৩৬] E.I.J. Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline, Cambridge, U.K. 1958, p. 87.

[২৩৭] Muqaddimah, Franz Rosenthal, translation, p. 43-93; James Krizeck ed., Anthology of Islamic Literature, 1964, pp.292..

দেখা দেয়। একটি মাত্র মানস যখন অন্য সকল মানসের উপর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে তখন যথার্থই রাষ্ট্রের আবির্ভাব দেখা দেয়। এ সময় যা ঘটে তা হল এই যে, বল প্রয়োগের বিশেষ ক্ষমতা অন্য সকল ক্ষমতাকে পরাভূত করে এবং এভাবে তার আওতাধীন সকল ক্ষমতার উপর চূড়ান্ত প্রাধান্য লাভ করে।'[২৩৮]

আসাবিয়্যার উৎস

আসাবিয়্যার উৎস দু'টি– একটি হল জৈবিক এবং অপরটি হল সামাজিক। একই রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই আসাবিয়া বা গোত্রবন্ধন দৃঢ়তর হয়। তারা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে, পরস্পর গভীর মমতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। একে অপরের বিপদ-আপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। একই রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তিবর্গ একে অন্যের সমস্যাকে নিজের সমস্যা বলে বিবেচনা করে এবং তা সমাধানে এগিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুন বলেন, "বিভক্ত ব্যতিক্রম ব্যতীত, রক্তের সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন খুবই প্রাকৃতিক। এ রক্ত সম্পর্কীয় ধারা নিকটাত্মীয় ও ঘনিষ্ঠজনের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করে, যাতে তাদের উপর কোনো জুলুম এবং বিপদ আপতিত না হতে পারে। যে কোন ব্যক্তি তার নিকটাত্মীয়ের উপর অবিচার কিংবা উৎপীড়ন হলে বিক্ষুব্ধ হয় এবং বিপদ ও ধ্বংসের সময় আত্মীয়-স্বজনের পাশে দাঁড়িয়ে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। মানব সৃষ্টির প্রারম্ভ হতেই এটা মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ।"[২৩৯]

মানুষের এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্যই তারা প্রকৃতির বিরূপ পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে, তাদের জীবনযাপন প্রণালি সহজতর করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সমকালীন বিজ্ঞান বিশেষ করে বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞান মানুষের সমাজবদ্ধভাবে বাস করা, একে অপরের প্রতি মতত্ববোধ প্রদর্শন অথবা একে অপরের বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া- এসব গুণাবলির স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করছে। মানুষের এসব গুণাবলিকে সমকালীন জীববিজ্ঞানীরা জৈবিক বলে দাবি করেন এবং তাঁদের এই দাবির সাথে ইবনে খালদুনের রক্ত

---

২৩৮ H.K. Sherwani, Studies in Muslim Political Thought and Administration, (Lahore, Review, 1963), p. 191.

২৩৯ মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, (ঢাকা: ই.ফা.বা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০; Ibn Khaldun, The Muquaddimah: An Introduction to History, Translated fro the Arabic by Franz rosenthal, Vol. 1, Routledge & Kegan Paul, London, 1967, p. 264.

সম্পর্কের ব্যাখ্যা সাদৃশ্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।[২৪০] এ প্রসঙ্গে আলফ্রেড গিয়েরার (Alfred Gierer) বলেন, "সাধারণত আধুনিক বিজ্ঞান এবং বিশেষত: বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল মানুষের সহযোগিতার মৌলিক শর্তাবলিকে গভীরভাবে বোঝা এবং ব্যাখ্যা করা; যা ইবনে খালদুনের অবভাসিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে বিশ্লেষণ করেছেন।"[২৪১]

ইবনে খালদুনের মতে মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই পরস্পরের সান্নিধ্যে আসার প্রণবতা নিহিত রয়েছে। আবার এর একটি প্রায়োগিক দিকও রয়েছে। বেঁচে থকার জন্যই মানুষকে একে অপরের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। একে অপরের প্রয়োজন মিটানোর মধ্যদিয়ে তারা একটি সহজ-সরল জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলে। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন ভিন্ন রকম সমাজে এই সহযোগিতার মাত্রাগত পার্থক্য থাকতে পারে, তবে সকল সমাজেই এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। একই রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই সহযোগিতার মনোভাব অধিকতর প্রবল বলে একে জৈবিক বলে মনে করা হয়।

আসাবিয়া বা গোত্রপ্রীতির উৎস রক্ত-সম্পর্ক ছাড়াও সামাজিক সম্পর্কও এর অন্যতম একটি উৎস। কেননা দীর্ঘ সময় একই অঞ্চলে বসবাস করলে এই ব্যক্তিবর্গের মধে এক প্রকার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।[২৪২] বংশ বা গোত্রের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও একই শাসকের অধীনে দীর্ঘদিন বসবাস করার ফলে কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে এরূপ একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরূপ সামাজিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা আসাবিয়া বা গোত্রপ্রীতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার উপর। এই পারস্পরিক মাত্রা বা পরিমাণ যতবেশি হবে আসাবিয়া বা গোত্রপ্রীতির মাত্রা বা পরিমাণও ততবেশি হবে। একই সাথে এর বিপরীত অবস্থাটাও প্রযোজ্য। মিথস্ক্রিয়ার অভাবে এ বন্ধন শিথিল হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে এর বিলুপ্তি ঘটে।

এছাড়াও আসাবিয়ার উৎস হিসেবে প্রধানত রক্ত-সম্পর্ক ও সামাজিক বন্ধনকে বিবেচনা করলে পরিবেশও এই বন্ধনে অনেক প্রভাব ফেলে। পরিবেশের ভিন্নতার সাথে আসাবিয়ার

---

২৪০ আখ্‌তার-উল্‌-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

২৪১ Alfred Gierer, æIbn Khaldun on Solidarity (Asagbiyah)-Modern Science on Cooperativeness and Empathy: a Comparison," Philosophia Naturalis, Vol. 38, pp. 6.

২৪২ ibid.

বন্ধনের দৃঢ়তার বিষয়টি জড়িত। উর্বর অঞ্চলের তুলনায় মরু ও প্রান্তরে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে এই বন্ধনের দৃঢ়তা অনেক বেশি থাকে, নগরবাসীর তুলনায় প্রান্তরবাসীর মধ্যে এই বন্ধন বেশি শক্তিশালী হয়। আসাবিয়ার উৎসের আলোচনায় সামাজিক সম্পর্কের ব্যাখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়, একই ভৌগলিক পরিবেশে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে এ বন্ধন গড়ে ওঠে। তবে অনেক সমাজ-দার্শনিক মনে করেন এরূপ সামাজিক সংহতির জন্য একই অঞ্চলের অধিবাসী হওয়া অত্যাবশ্যক নয়, বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করা জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ ও শ্রেণির পেশার মানুষের মধ্যে সংহতিবোধের জন্ম দিতে পারে। এ ব্যাপারে হ্যালমুট রিটার বলেন, "একই আবাসভূমি সংহতিবোধের জন্য অপরিহার্য শর্ত নয়। বিস্তৃতভাবে বিচ্ছিন্ন জাতিগোষ্ঠী, জনগণ, সামাজিক শ্রেণির সদস্যরা একে অন্যের সাথে এই সংহতির বন্ধন অনুভব করতে পারে।"[২৪৩] তবে সচরাচর এসব ক্ষেত্রে বন্ধনের গভীরতা একই গোত্র বা একই বংশের মানুষের মতো হয় না।

আসাবিয়্যার উদ্দেশ্য

ইবনে খালদুনের মতে, 'আসাবিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য মুল্ক অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। মুলকের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে, এর অর্থ রিয়াসত অর্থাৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, আধিপত্য বিস্তার করা ও প্রশাসন কায়েম করা। তাঁর মতে, আসাবিয়া ও রিয়াসতের সংযোগে নগর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় এবং নগর রাষ্ট্রের মাধ্যমে আসাবিয়ার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, যথা- ক্ষমতা অর্জন করা, ধন-সম্পদ উপাজর্ন করা ও অবসর আয়ত্ব করার লক্ষ্যের বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়। অতএব, তত্ত্বগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এরূপ বলা যায় যে, (ক) ক্ষমতা অর্জনের ইচ্ছার বাস্তবায়ন প্রচেষ্টা; (খ) আসাবিয়ার জন্ম দেয় এবং আসাবিয়ার ফলশ্রুতি স্বরূপ (গ) রিয়াসত কায়েম হয় বা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। সুতরাং 'ক্ষমতা অর্জনের ইচ্ছা" নেতৃত্বের বা রাজনীতির ভিত্তি এবং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হচ্ছে রাষ্ট্রের ভিত্তি।[২৪৪]

আসাবিয়া ও সমিতি

ইবনে খালদুনের মতে সমাজের সঙ্গে সমিতির যে সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সঙ্গে আসাবিয়ারও সে সম্পর্ক। কেননা সমিতি ও আসাবিয়া যথাক্রমে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সংহতি প্রদান করে থাকে। তাই মানুষের জীবন ধারণের জন্য সমিতির যেমন প্রয়োজন, আসাবিয়ার প্রয়োজনও ঠিক

---

২৪৩ Hellmut Ritter, æIrrational Solidarity Groups: A Sociophyshological Study in connection with Ibn Khaldun", Oriens, Vol. 1, 1948, pp. 1-44.

২৪৪ James Krizeck ed., Anthology of Islamic Literature, p. 295.

তেমনি। তিনি আরও বলেন, মানব জাতির জন্য সমিতি বা সংঘের প্রয়োজন অবশ্য আরেক কারণে; সমিতি না থাকলে সৃষ্টি ও বিশ্বপ্রভুর খিলাফতের (প্রতিনিধিত্বের) কাজ সম্পাদন মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো না।[২৪৫]

খালদুনের মতে, রাজনৈতিক জীবন-চক্রের অভ্যন্তরে রয়েছে মানবিক সঙ্ঘের বিভিন্ন উপাদান। এসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনানুগ (ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ) এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য পরস্পরকে প্রভাবিত করে রাষ্ট্র পরিচালনাকে সহজতর কিংবা অসুবিধাজনক করে তোলে। ইবনে খালদুন সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। তিনি সরকারের রূপ ও তার উদ্দেশ্য অনুসারে রাষ্ট্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা-'আদর্শ ইসলামিক ধর্মতন্ত্র', যা আধ্যাত্মিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র', যা মানব-যুক্তির দ্বারা প্রণীত আইনের উপর আস্থাশীল; এবং 'আদর্শ রাষ্ট্র', যা প্লেটোর 'দি-রিপাবলিক' গ্রন্থে বর্ণিত দার্শনিকের দ্বারা পরিচালিত। প্রথমটি ঐতিহ্যবাহী খলিফার সমার্থক, দ্বিতীয়টি 'আকলিমা' (Aqliya) তথা ক্ষমতারাষ্ট্র (Power-state), এবং তৃতীয়টি 'ফালাসিফা' (Falasifa), যা কল্পিত ও তাত্ত্বিক। রাষ্ট্র হচ্ছে মানব জীবনের স্বাভাবিক ফলাফল, যার জন্য সঙ্ঘ ও সংগঠন আবশ্যক।

আসাবিয়া ও ধর্ম

দূর-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার অধিকতর গভীরে দৃষ্টিপাত করে ইবনে খালদুন আরও একটি কার্যকারক শক্তি নিরীক্ষণ করেন, যা আসাবিয়ার সমমাত্রিক বা সমগামী বলে প্রতীয়মান হয়। এই কার্যকারক শক্তিটি হচ্ছে ধর্ম। ইবনে খালদুন রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় আসাবিয়া ও ধর্মের একটা গভীর সম্পর্ক নিরীক্ষা করেন। তাঁর মতে ধর্ম রাষ্ট্রকে সুসংহত করে থাকে। পক্ষান্তরে আসাবিয়া ছাড়া ধর্ম জনগণের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে আকর্ষণ করতে পারে না। আসাবিয়া যেমন ক্ষমতাকে সুসংহত করে ও সার্বভৌমত্বের নিয়ন্ত্রণ করে, ধর্মও তেমনি আসাবিয়াকে সুসংহত করে ও ধর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণ করে। ইবনে খালদুন বলেন, ধর্ম যে আসাবিয়াকে শক্তিশালী করে, প্রাথমিক যুগের মুসলিম সাফল্য এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

E.I.J. Rosenthal বলেন যে, ইবনে খালদুনের মতে, "ধর্ম রাষ্ট্রকে সুসংহত করে।" পক্ষান্তরে "আসাবিয়া ছাড়া ধর্ম জনগণের চিত্তাকর্ষণ করতে পারে না, তাদের উপর আইন

[২৪৫] ড. মোহাম্মদ গোলাম রসূল, মুসলিম ইতিহাস চর্চা, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, রাজশাহী, মার্চ-১৯১৪ খ্রি., পৃ. ৯৩।

প্রয়োগ করতে সামর্থ হয় না ও তাদের আনুগত্য লাভ করতে পারে না।"[২৪৬] Rosenthal ইবনে খালদুনের প্রশংসা করে আরও বলেন যে, রাষ্ট্রের জীবনে ধর্মের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনি উপলব্ধি করেন, বিশেষত যখন ধর্ম আসাবিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ, সংহত আধ্যাত্মিক চলৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে।[২৪৭]

হারুন খান শেরওয়ানি বলেন, Religion is only one of the bending forces which help in the formation of states. [২৪৮]

ধর্মীয় উদ্দীপনা ও নবীর আবির্ভাবের ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। যদিও রাজনৈতিক সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয় না। ইতিহাসে এ নযীর আছে। বিশেষ করে ইসলামের অলৌকিক সাফল্যই এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।[২৪৯]

ইবনে খালদুন ধর্মের সামাজিক মূল্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি মুসলিম শাসনাধীন স্পেনে কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে সেখানকার খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা অধিকতর উৎপাদনশীল কৃষিজমি ক্রমাগত কুক্ষিগত করেছে। এর পেছনে যতটা না তাদের ধর্মীয় প্রণোদনা কাজ করেছে তার চেয়ে বেশি কার্যকর ছিল তাদের শ্রমশক্তি নিয়োজিত করার প্রবল ইচ্ছা। খালদুনের রাজনৈতিক চিন্তায়ও এ দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট, যদিও তাঁর অনুসন্ধানী মনের মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাবাদ এবং ঐতিহ্যবাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এ সম্পর্কে Rosenthal লিখেন: æIbn Khaldun maintains again and again that dominion is as necessary as the will to power and domination is natural, and that power can be gained and dominion established without the call of religion, so long as 'Asabiy' unites a large enough group of like-minded enthusiasts to supply the man aspiring to political

---

[২৪৬] E.I.J. Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam, ibid, p. 104.

[২৪৭] ibid, p. 106.

[২৪৮] H.K. Sherwani, ibid, p. 190.

[২৪৯] F. Rosental, Indroduction to Hisoty of Muslim Historigraphy (London: 1968), p. cxxii.

leadership with sufficient backing."[২৫০] অর্থাৎ, খালদুন বার বার এ ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, রাষ্ট্র যেমন আবশ্যক, তেমনি ক্ষমতা ও আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, যা ধর্মের প্রণোদনা ছাড়াই জন্ম নিতে পারে। যতক্ষণ 'আসাবিয়া' সমমনা উৎসাহী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে এমন এক ব্যক্তিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বদানে আগ্রহী করে তুলবে, যার পেছনে থাকবে প্রচুর জনসমর্থন, ততক্ষণ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিশ্চিত। খালদুন 'আসাবিয়া' শব্দটি একটি গোষ্ঠীর সম্মিলিত সাধারণ ইচ্ছা বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। এখানে ফরাসি দার্শনিক রুশো (১৭১২-১৭৭৮)-র 'সাধারণ ইচ্ছা' (General will) নামক রাজনৈতিক ধারণার কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। 'আসাবিয়া' একটি গোষ্ঠীকে শক্তি যোগায়; বিশেষ করে, একজন ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দানে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের সম্মিলিত আশা-আশাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটাতে সমর্থন হন। এভাবেই একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় ও সংরক্ষিত থাকে।

ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায়ও আসাবিয়ার ভূমিকা রয়েছে। গোত্রপ্রীতি বা আসাবিয়া হল কোনো একটি কাজ সম্পাদনের প্রাণশক্তি, এই শক্তি এর সদস্যদের অনুপ্রেরণা জোগায় যৌথভাবে একটি অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে। এই অনুপ্রেরণাই কোনো একটি কঠিন কাজকে গোত্রের সদস্যদের জন্য সহজ করে দেয়। ইবনে খালদুন দাবি করেন কোনো ধর্ম প্রচার এবং প্রতিষ্ঠায় গোত্রপ্রীতি একটি অপরিহার্য উপাদান। তিনি বলেন, "গোত্রপ্রীতি ছাড়া ধর্মীয় প্রচারণা বাস্তবায়ন করা যায় না।" [২৫১]

ধর্মীয় প্রচারণা সফল করার জন্য কোনো ধর্মপ্রচারককে অবশ্যই তাঁর গোত্রের লোকজনের সমর্থন নিতে হয়। তাদের সমর্থন ব্যতীত সর্বসাধারণকে কোনো মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয় না। ধর্মীয় প্রচারণায় অপরিহার্যতাকে বিচার করে ইবনে খালদুন উল্লেখ করেন, "আল্লাহ এমন কোনো নবীকে পাঠাননি যিনি তাঁর গোত্রের লোকজনের নিরাপত্তা পাননি।"[২৫২] গোত্রপ্রীতির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তিনি মুকাদ্দিমায় একটি উদাহরণ তুলে ধরেন। বাগদাদের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে একদা এক ব্যক্তি হাজির হন যার নাম আবু হাতিম সহল বিন সালাম আল-আনসারী। তিনি গলায় কুরআনের কপি ঝুলিয়ে মানুষদের উপদেশ দিতেন

---

[২৫০] Rosenthal, 1968, ibdi, p.96

[২৫১] Ibn Khaldun, The Muquaddimah: An Introduction to History, ibid, p. 322.

[২৫২] ibid, p. 322.

আইন মেনে চলার জন্য এবং কুরআন ও নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করার জন্য। উচ্চ-নীচ হাশেমী এবং অন্যান্যরা তাঁকে অনুসরণ করে। তিনি তাহের প্রাসাদে উপনীত হন এবং সরকারি অফিসের দায়িত্ব নেন। এই ব্যক্তি বাগদাদে ঘুরে বেড়ান, রাস্তাঘাটে ভীতি সৃষ্টিকারীদের বের করে দেন। তিনি বলেন যে, কুরআন, সুন্নাহ বিরুদ্ধাচারণকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম চলবে। কিছুদিন পর ইব্রাহিম বিন আল মাহদি তাঁর বিরুদ্ধে সেনাদল পাঠান। তিনি পরাজিত হন এবং তাঁর ক্ষমতা দ্রুত শেষ হয়ে যায়। কোনো রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান।" এই উদাহরণ ছাড়াও এমন অনেক ব্যক্তির আবির্ভাব ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় যারা সত্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে গোত্রপ্রীতির অপরিহার্যতা রয়েছে সেই বিষয়টি তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি এবং তাদের পকেষ কোনো গোত্র কাজ করেনি। ফলে তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়েছে। নবীদের প্রচারের পেছনে গোত্রশক্তি কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুন বলেন, "নবীগণ গোত্র ও পরিবারের শক্তির উপর নির্ভর করেই ধর্মীয় প্রচারণা চালান।"[২৫৩] আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ইচ্ছা করলে কোনো ব্যক্তি দিয়েই তাঁর বাণী প্রচার করতে পারতেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে সর্বময় ক্ষমতা দিতে পারতেন। কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় নবীগণ ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে গোত্রের সদস্যদের সমর্থন পেয়েছেন এবং এক্ষেত্রে গোত্রপ্রীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যে কোনো ধর্মের প্রতিষ্ঠায় আসাবিয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে আবার একই ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যেও গভীর আসাবিয়ার বন্ধন গড়ে ওঠে।[২৫৪]

আসাবিয়া ও রাষ্ট্র

ইবনে খালদুনের মতে, রাষ্ট্র স্থাপন ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠা একমাত্র জনসমর্থন ও আসাবিয়ার উপর নির্ভরশীল। এর কারণ বিশ্লেষেণ করে তিনি বলেন, "রাষ্ট্র একটি লোভনীয় বস্তু। সুতরাং এটা ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার বস্তুও বটে। রাষ্ট্রের উত্থান-পতন আসাবিয়া ছাড়া হতে পারে না। অতএব, ইবনে খালদুনের মতানুযায়ী নগর বিজয়ের মাধ্যমে তখনই রাষ্ট্র স্থাপিত হয়, যখন কোন আদিম মানবগোষ্ঠী আসাবিয়া ও ধর্মের বন্ধন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের স্বাভাবিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের সংহতি অনুভব করে।

---

[২৫৩] ibid, p. 324.

[২৫৪] S. Nicholas Hopkins, æEngels and Ibn Khaldun", Journal of Comparative Poetics, No. 10, pp. 9-18.

আসাবিয়া ও সার্বভৌমত্ব

আল-মুকাদ্দিমায় ইবনে খালদুন রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্ব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আসলে 'আসাবিয়া'-র মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণঃ æThe object of Asabia is Sovereignty."[২৫৫] এ প্রসঙ্গে খালদুন সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য, ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করেছেন। অধিকন্তু, খালদুন 'আসাবিয়া-কে যাযাবর জীবনের কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা দেশপ্রেমের সাথে তুলনীয়। তিনি আবার মাত্রাতিরিক্ত 'আসাবিয়া'-র অস্তিত্বকে সমাজ জীবনের ক্ষতিকর উপাদান হিসেবেও বিবেচনা করেছেন। তিনি এক 'পাশব সংহতি' (animal solidarity) বলেছেন, যা সাধারণত কোন উচ্ছৃঙ্খল জনগোষ্ঠী কিংবা দস্যু-দুর্বত্তদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।[২৫৬]

ইবনে খালদুন বলেন, সার্বভৌমত্বের ভিত্তি ও ধারক হলো ক্ষমতা, ক্ষমতার ভিত্তি ও ধারক সামাজিক সংহতি বা একতা, আর সামাজিক সংহতির ভিত্তি ও ধারক হলো 'আসাবিয়া'। অন্য কথায়, সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার উপর ক্ষমতা সামাজিক একতার উপর এবং সামাজিক একতা আসাবিয়ার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ আসাবিয়া দূর-নিয়ন্ত্রক হিসেবে সার্বভৌমত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং রাজকীয় সার্বভৌমত্বই আসাবিয়ার শেষ লক্ষ্য।[২৫৭]

সমাজ ও রাষ্ট্রে আসাবিয়ার প্রভাব

সামাজিক জীবনে আসাবিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। ইবনে খালদুন মুকাদ্দিমায় দেখিয়েছেন কিভাবে কোনো গোত্রের সদস্যকে একটি সহজ ও নিরাপদ জীবনে সহায়তা করে। প্রকৃতির বিরূপ পরিবেশে মানুষ যখন একান্ত অসহায় ছিল তখন মানুষের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে

---

[২৫৫] The prolegomena, pp. 108-117.

[২৫৬] অনেকে বৃহত্তর অর্থে 'আসাবিয়া'-কে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) এর সাথে তুলনা করেন। কিন্তু এটি সঠিক নয়। এর কারণ খালদুন-কথিত 'আসাবিয়া' প্রত্যয়টি উপজাতীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত, আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের (Nation-state) ক্ষেত্রে টি প্রযোজ্য নয়। খালদুন-প্রবর্তিত 'আসাবিয়া' প্রত্যয়টি ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। অর্থাৎ, এর রয়েছে সামাজিক সংহতি সবচেয়ে শক্তিশালী। খালদুন রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংহতির চেয়ে রাজনৈতিক সমঝোতাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সংহতির প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ হ্রাস পায়। সমাজের যেকোন প্রতিষ্ঠানের মতই রাষ্ট্র পরিবর্তনশীল। রাষ্ট্রীয় জীবনে অবক্ষয়ও ঘটে। প্রথমে রাষ্ট্র উপজাতীয় সংহতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। কিন্তু কালক্রমে যখন স্থায়ী সমাজ ব্যবস্থায় ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং মানুষ বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অতিশয় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তখন শাসকবর্গ তাদের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করতে চায়। এজন্য বলা যায়, æThe natural end of solidarity is sovereignth." অর্থাৎ সংহতির স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে সার্বভৌমত্ব। এখানে একথাটি উল্লেখ করা মোটেই অযৌক্তিক হবে না যে, খালদুন, 'আসাবিয়া' প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে উপজাতীয় এলিটবর্গের চক্রাকার আবর্তনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন। (দ্র. Issawi, 1969, ibid, p.1)

[২৫৭] James Kritzeck ed., Anthology of Islamic Literature, ibid, p. 192; 295.

জ্ঞআতি, তারই স্বজাতি মানুষ। তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মধ্যদিয়েই তারা প্রকৃতির বৈরী পরিবেশে প্রকৃতির সাথে অবিরত সংগ্রাম করে এক সহজ ও নিরাপদ জীবনযাপন প্রণালি তারা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, প্রকৃতির রাজত্বে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে পেরেছে।

ইবনে খালদুন মুকাদ্দিমায় আরব বেদুইনদের এক কঠোর সংগ্রামী জীবনের বর্ণনা প্রদান করেছেন। সেখানে দুই ধরনের প্রতিকূলতা লক্ষ করা যায়। প্রথমত তারা সংগ্রাম করে প্রকৃতির বৈরী পরিবেশের সাথে এবং দ্বিতীয়ত তারা সংগ্রাম করে মানব সৃষ্ট প্রতিকূলতার সাথে। ঊষর মরুভূমিতে নিত্য সংগ্রাম করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। এই জীবিকা অর্জনের পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। কৃষি কাজ করার মতো উর্বর জমি অথবা পশুচারণ ভূমির পরিমাণ ছিল কম। ফলে অল্প পরিমাণ উর্বর জমি ও পশুচারণ ভূমির প্রতি বিভিন্ন গোত্রের দৃষ্টি পড়ত। আর এদের দখল নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে অবিরাম কলহ বিবাদ লেগে থাকত। প্রকৃতির সৃষ্ট প্রতিকূলতা এবং মানবসৃষ্ট প্রতিকূলতা মোকাবিলায় একমাত্র হাতিয়ার হল আসাবিয়া।[২৫৮] এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুন বলেন, "কেবল গোত্রপ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ গোত্রগুলিই মরুভূমিতে বসবাস করতে পারে।"[২৫৯] গভীর আসাবিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ কোনো গোত্রের সদস্যরা যৌথভাবে এসব প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে নিরাপদ জীবন যাপন করে। বিপরীতভাবে কোনো গোত্রের মধ্যে এ বন্ধনের শিথিলতা বিরাজ করলে অথবা এরূপ কোনো বন্ধনে আবদ্ধ না থাকলে মরুভূমিতে তারা নিতান্তই অসহায়, অন্য কোনো গোত্রের আক্রমণের শিকার হলে তা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় তাদের থাকে না। ইবনে খালদুন বলেন, "যাদের কোনো লোকজন থাকে না তারা তাদের সাথীদের প্রতি খুব অল্পই ভালোবাসা অনুভব করে। যদি যুদ্ধের সময়ে বিপদকে অনুধাবন করতে পারে তবে এরকম ব্যক্তি সটকে পড়ে এবং নিজেকে রক্ষা করার পথ খুঁজে, সমর্থনবিহীন এক ভীতিকর অবস্থায় ভয়ে সে আতঙ্কিত থাকে। এন্য এরকম লোক মরুভূতিতে বসবাস করতে পারে না।; তারা অন্য কোনো জাতির শিকারে পরিণত হয়, তারা তাদেরকে গ্রাস করতে চায়।"[২৬০]

---

[২৫৮] অধ্যাপক নূরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১-২২।

[২৫৯] Ibn Khaldun, The Muquaddimah: An Introduction to History, Translated fro the Arabic by Franz rosenthal, Vol. 1, Routledge & Kegan Paul, London, 1967, p. 261.

[২৬০] ibid, p. 263.

ইবনে খালদুন উপলব্ধি করেন যে সমাজ উন্নয়নে ক্রমবিবর্তনের ধারায় রাষ্ট্রের উন্নয়নের প্রাক্কালে যদিও একটা ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পার্শ্বোৎপন্নরূপে সার্বভৌমত্বের বিকাশ হয়, তথাপি এ অস্তিত্বে আসায়, পরবর্তী পর্যায়ে আসাবিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কারণ আসাবিয়া সমাজ এবং সমাজের সংহতি ও সার্বভৌমত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। আসাবিয়া ও ক্ষমতা দুটি বাস্তব শক্তি যা সমাজের মাঝে বিরাজমান এবং বংশানুক্রমিক রাজাদের রাজত্ব স্থায়ী রাখে। এরূপ ক্ষেত্রে আসাবিয়া যদি বিলুপ্ত হয় তবে শাসক শ্রেণি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। আসাবিয়ার রাজনৈতিক দিকের ব্যাখ্যা ইবনে খালদুনের দর্শনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। লিন্ডা টি. ডার্লি (Linda T. Darling) বলেন, "সাধারণত 'আসাবিয়া, সামাজিক সংহতি বা গোত্রপ্রীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ তাঁর (ইবনে খালদুনের) একটি বড় অবদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।"[২৬১]

প্রকৃতির বৈরী পরিবেশে শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মানুষ যখন বিভিন্ন চাহিদা মিটিয়েছে, একে অপরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অথবা সম্মিলিতভাবে শত্রুর মোকাবেলা করেছে- এটি একটি সম্মিলিত শক্তি। আর এই অফুরন্ত সম্মিলিত শক্তি মানুষকে কেবল সমাজবদ্ধ শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনেই সহায়তা করে তা নয়। বরং এই শক্তিতে বলীয়ান হয়েই মানুষ তার ক্ষমতার বিস্তার ঘটাতে চায়, এক গোত্রের লোক অন্য গোত্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়, একে একে অনেকগুলি গোত্রকে করায়ত্ব অথবা পরাজিত করে তারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুন বলেন, "গোত্রপ্রীতির লক্ষ হল রাজকীয় রাজত্ব।" [২৬২]

মানুষ তাদের জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি যেমন গোত্রপ্রীতির শক্তিতে মিটায়, তদ্রূপ বড় কোনো দাবি অথবা উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে এই শক্তি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। একটি গোত্রের মধ্যে যদি পারস্পরিক বোঝাপড়া ভালো থাকে, তারা যদি সুশৃঙ্খলভাবে কোনো নেতার নেতৃত্ব মেনে চলে তবে এই গোত্রের দ্বারা রাজ্য বা সামাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

---

[২৬১] Linda T. Darling, Social Cohesion (Asabiyya) and Justice in the Late Medieval Middle East", Coimparative Studies in Society and History, Vol. 49, No. 2, 2007, p. 329-342.

[২৬২] Ibn Khaldun, The Muquaddimah: An Introduction to History (1967), ibid, p. 23.

ইবনে খালদুন বলেন, "গোত্রপ্রীতির দ্বারা কোনো ব্যক্তি নিজ গোত্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি অন্যান্য গোত্রের উপর প্রাধান্য বিস্তারে অগ্রসর হয়। যদি ঐ গোত্রও ক্ষমতাসম্পন্ন হয় তবে তারা বাধা প্রদান করে এবং যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় যে গোত্রের গোত্রপ্রীতি অধিকতর প্রবল তারাই জয়ী হয়। পৃথিবীব্যাপী এটা কোনো গোত্র বা জাতির স্বাভাবিক পরিণতি। এভাবে পরাজিত দল জয়ী দলের অনুগত হবে। দুই দলের গোত্রপ্রীতি জয়ী দলের গোত্রপ্রীতিতে ক্ষমতার সংযোজন ঘটাবে। এভাবে তারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বেশি জনগোষ্ঠীর উপর তাদের প্রাধান্য ও শাসন প্রতিষ্ঠা করবে।"[২৬৩]

ইবনে খালদুন বলেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রে যেহেতু অন্য সকল রাষ্ট্রের উপর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কাজেই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং তার ফলে সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়। অতঃপর কালক্রমে গোষ্ঠী-সংহতির মূল ধারণা সাধারণ শাসকের প্রতি স্বাভাবিক আনুগত্যে রূপান্তরিত হয় এবং জনগণ গোষ্ঠী সংহতি হারিয়ে ফেলে। এ অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে রাজবংশের পত্তন হয়।[২৬৪]

প্রকৃতপক্ষে 'আসাবিয়া'-ই হচ্ছে ইবনে খালদুনের কেন্দ্রীয় সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়, যার রয়েছে একটি সামাজিক প্রেক্ষাপট। এ সম্পর্কে C. Issawi বলেন, "The core of Ibn Khaldun's general and political sociology is his concept of 'asabia' or 'Social Solidarity". [২৬৫] অর্থাৎ, 'আসাবিয়া' তথা সামাজিক সংহতি প্রত্যয়টি খালদুনের সাধারণ এবং রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত।

মার্কস এবং এঙ্গেলস যখন খ্রিস্টপূর্ব ও ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন তখন ঘটনাক্রমে খালদুন প্রস্তাবিত উপজাতীয় এলিটবর্গের চক্রাকার আবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্যঃ "More concretely, Englis in an article on the history of early christianity ... grasped one of the fundamental processes of Islamic Social Structure, namely the political oscillation between nomadic and Sedentarized cultures.

---

[২৬৩] ibid, p. 285.

[২৬৪] মোঃ আয়েশ উদ্দিন, রাষ্ট্র চিন্তা পরিচিতি (ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৯০ খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৮০।

[২৬৫] Charles Issawi, ibid, p. 10.

In a commentary on Islam which reproduced Ibn Khaldun's theory of the circulation of tribal elites, Engels observed that Islam is a religion adapted to Arab townsmen and nomadic Bedouin. Therein lies, however, the embryo of a periodically occurring collistion. The townspeople grow rich, luxurious and lax in the observation of the æLaw". The Bedouins, poor and hence of strict morals, contemplate with envy and convetousness these riches and pleasures".[২৬৬] অর্থাৎ এঙ্গেলস অধিকতর স্পষ্টভাবে আদি খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস সম্পর্কিত তাঁর এক প্রবন্ধে মুসলিম সমাজ কাঠামোর একটি মৌলিক প্রক্রিয়া অনুধাবন করতে সমর্থ হন। সেটি হচ্ছে যাযাবর ও স্থায়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক দোলাচল। এঙ্গেলস ইসলাম সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় খালদুন প্রবর্তিত উপজাতীয় এলিটবর্গের চক্রাকার আবর্তন সংক্রান্ত তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এঙ্গেলস লক্ষ করেন যে, ইসলাম হচ্ছে এমন একটি ধর্ম, যা আরবের শহুরে জনগোষ্ঠী এবং যাযাবর বেদুইনদের সমাজে যুগপৎ অভিযোজিত; আর এখানেই নিহিত রয়েছে মাঝে মাঝে সংঘটিত সংঘাতের বীজ। শহরবাসী মানুষ ক্রমশ ধনী হয়ে বিলাসবহুল জীবন যাত্রায় গা ভাসিয়ে দেয়; তারা সামাজিক রীতিনীতি ও রাষ্ট্রীয় আইন কানুন মেনে চলতে চরম শৈথিল্য প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে, বেদুইনরা গরিব হলেও নৈতিকতায় কঠোর হওয়ার কারণে তারা শহরবাসীদের সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে অন্তরে অতৃপ্ত বাসনা পোষণ করে।

গোত্রপ্রীতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে ইবনে খালদুন মানব প্রকৃতির এক অনন্য বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেন। তাঁর পরেও অনেক দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী মানব প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তাঁর মানব প্রকৃতি সংক্রান্ত ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ এবং বাস্তবসম্মত। জন্মের মাধ্যমেই মানুষ কিছু গুণাবলি আল্লাহ প্রদত্ত বলে মনে করেন। কোনো মানুষই এর বাইরে নয়। ইবনে খালদুন বলেন: "মানব প্রকৃতির মধ্যেই রক্ত সম্পর্কীয় এবং আত্মীয়দের প্রতি সমবেদনা ও ভালোবাসা নিহিত রয়েছে যা আল্লাহই মানুষকে দিয়েছেন।"[২৬৭]

---

২৬৬ Engles, on Religion, 'On the history of early Christianity, quoted in Bottomore etal, 1985, p. 238.

২৬৭ Ibn Khaldun, The Muquaddimah: An Introduction to History (1967), ibid, p. 263.

আদর্শভিত্তিক সমাজ

আল্লামা আবুল হাশিম ইবনে খালদুন কথিত 'সমাজ সংহতি'র বিভক্তিসমূহকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি রক্তভিত্তিক, স্বার্থভিত্তিক ও আদর্শভিত্তিক 'সমাজ-সংহতি'র আধুনিক ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, "যে সমাজের সংহতি রক্তভিত্তিক- সে সমাজ রক্তভিত্তিক। স্বার্থভিত্তিক সমাজ-সংহতিসম্পন্ন সমাজ স্বার্থভিত্তিক এবং আদর্শ যে সমাজের প্রমাণ, সে সমাজ আদর্শভিত্তিক। এক্ষেত্রে তিনি ভারতের সনাতন আর্য-সমাজ, প্রাচীন গ্রিক ও রোমক সমাজ এবং বর্তমান যুগে ইংরেজ ফরাসি প্রভৃতি সমাজ রক্তভিত্তিক সমাজের দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেন। তিনি বলেন, কলম্বাস[২৬৮] আমেরিকা আবিষ্কারের করার পর আমেরিকার স্বর্ণখনির আকর্ষণে পৃথিবীর বহু দেশ হতে দলে দলে মানুষ এসে আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে। বিশ্বের বহু জাতিসম্বলিত ভাগ্যান্বেষী এই মার্কিন সমাজ স্বার্থভিত্তিক সমাজের একটি চমকৎকার দৃষ্টান্ত। আরবের মুসলিম সমাজ, ভারতে বৌদ্ধ-সমাজ, রাশিয়া ও চীনের মার্কসবাদী সমাজ আদর্শভিত্তিক সমাজ।

রক্তভিত্তিক সমাজের সংগতি কোনো একটি গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বিশ্ব-মানবের বিবর্তনে ইতিহাসে এদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রক্তভিত্তিক সমাজ বিশ্বের সমৃদ্ধশালী সমাজকে নিজ গোষ্ঠী-স্বার্থে ধ্বংস করেছে এবং যুগে যুগে বহু দুর্বল সমাজ-সংহতিসম্পন্ন সমাজকে শাসন ও নির্মমভাবে শোষণ করে নিজেদের পুষ্ট করেছে– এটা সত্য; কিন্তু এদের ঐতিহাসিক ভূমিকা কেবল শাসন-শোষণ প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কার্যের অবদানে বিশ্বমানবের সুখ-সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। রক্তভিত্তিক সমাজ অত্যন্ত দীর্ঘায়ু এবং জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু একটি মারাত্মক দোষে এটা দুষ্ট। রক্তভিত্তিক সমাজের কোন সার্বিক আবেদন নেই; নিজ সমাজ-জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ও মঙ্গলসাধন প্রভৃতি এর চিন্তা ও কর্ম অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস। রক্তভিত্তিক সমাজের এই প্রবৃত্তি আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্বলকে শোষণ ও শাসন প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিশ্ব-অশান্তির কারণ। এই প্রবৃত্তির প্রাধান্যের জন্যই রক্তভিত্তিক সমাজকে নিজ সমাজের বহির্জগতে জালিমের ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়। স্বার্থভিত্তিক সমাজের ঐতিহাসিক দিক প্রধানত ধ্বংসাত্মক। আধুনিক মার্কিন সমাজের উৎপত্তি স্বার্থভিত্তিক হলেও কালে এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির রক্তসংমিশ্রণের ফলে বর্তমানে

---

২৬৮ কলম্বাস (আনু. ১৪৫১-১৫০৬ খ্রি.) ছিলেন ইতালীয় নাবিক ও ঔপনিবেশিক। তাঁর আমেরিকা অভিযাত্রা ঐ অঞ্চলে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের সূচনা করেছিল। ভারতে পৌঁছানোর জলপথ আবিষ্কার করতে গিয়ে কলম্বাস ১৪৯২ সালে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন।

একে রক্তভিত্তিক বলা যেতে পারে। এই বিবর্তনের ফলেই মার্কিন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে; কিন্তু তার স্বার্থভিত্তিক চরিত্রের প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। মার্কিন সমাজের এই স্বার্থভিত্তিক সমাজ-চরিত্রের জন্যই বিশ্ব-সমাজে একে (এর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রচুর অবদান থাকা সত্ত্বেও) প্রধানত বেনিয়ার ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায় এবং এ কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই জাতি আণবিক শক্তি প্রয়োগে যুদ্ধ জয়ের কলংক অর্জন করতে কোন প্রকার দ্বিধা বা লজ্জাবোধ করে নাই। হিটলারের মত উগ্র মানুষও আণবিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন আশংকা করে আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। এই নৃশংস মরণাস্ত্র ব্যবহারে উগ্র ফ্যাসিবাদী জার্মান সমাজের চিত্তে ও বিবেকে যে চিন্তা, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, সেই মানবোচিত দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব মার্কিন সমাজসমূহে কোন স্থান পায়নি। এর কারণ, এই সমাজের উৎপত্তি স্বার্থভিত্তিক। অবশ্য বিশ্ব মানবের বিবর্তনের ইতিহাসে ধ্বংসেরও প্রয়োজন আছে। এই স্বার্থভিত্তিক সমাজগুলোকে প্রকৃতি তার ধ্বংসাত্মক কার্যে ব্যবহার করে থাকে। হালাকুর স্বার্থভিত্তিক সমাজ মুসলিম আরব সমাজের সমাজ-সংহতির স্পন্দন ইতিহাসবিখ্যাত আব্বাসী সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়। ধ্বংসের এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে উদ্দেশ্য করে আল-কুরআন ঘোষণা করেছেন:

وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ

"আল্লাহ যদি এক সম্প্রদায় দ্বারা অপর সম্প্রদায়কে ধ্বংস না করতেন, তবে পৃথিবী কেবল ফ্যাসাদেই পূর্ণ থাকত।"[২৬৯]

আল্লামা আবুল হাশিম (র)-এর মতে, বিশুদ্ধ আদর্শভিত্তিক সমাজ-সংহতি ও সমাজ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর। এর আবেদন কোনো এক গোষ্ঠী অথবা কোন এক স্বার্থচক্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর আবেদন সার্বিক। বিশুদ্ধ আদর্শভিত্তিক সমাজ কেবল মানুষের জৈবিক সত্তার সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে এমন নয়; এটা মানুষের অন্তর্জগতের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি ও উন্নততর মূল্যবোধ সৃষ্টি করে মানুষের দেহ, মন ও মস্তিষ্কের সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করে। আদর্শ এক প্রকার নয় এবং আদর্শভিত্তিক সমাজও এক প্রকার নয়। মার্ক্সবাদী আদর্শ মানুষের অন্তর্জগতে বহির্জগতের বস্তুনিরপেক্ষ ঐশ্বর্যবাদ অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই আদর্শের মতে মানুষের অন্তর্জগত তার বহির্জগতের বাস্তব পরিবেশের প্রতিক্রিয়ামাত্র। এই আদর্শ মানুষের নশ্বর জৈবিক সত্তাকে স্বীকার করে; কিন্তু মানুষের অবিনশ্বর সত্তাকে অলস মনের

---

[২৬৯] আল-কুরআন সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫১ এবং সূরা আল-হজ্জ, আয়াত: ৪০।

অজ্ঞানতাপ্রসূত আকাশকুসুম কল্পনা-বিলাস বলে উপহাস করে। এটা ছাড়াও এর আবেদন এক বিশেষ অর্থনৈতিক শ্রেণিচক্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই এই আদর্শ পরিণামে এটা বিশ্বমানবের গভীর পরিতাপের কারণ হবে। যে আদর্শ জীবের জৈবিক ও আত্মিক উভয় সত্তাকে স্বীকার করে জাতি, গোত্র, শ্রেণি নির্বিশেষে বিশ্বমানের এই উভয়বিধ সত্তার নিঃস্বার্থ কল্যাণ সাধনের প্রবৃত্তি জাগ্রত ও সক্রিয় করে, সেই আদর্শ-সৃষ্ট সমাজ ও সমাজ-সংহতি সারা বিশ্বজগতের জন্য নিরংকুশ আশীর্বাদ। মুসলিম আরব-সমাজ এই প্রকার সমাজের একটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। এই প্রকার আদর্শভিত্তিক সমাজকেই আল-কুরআন বিশ্বজগতের জন্য আশীর্বাদ অর্থাৎ ‘রাহমাতুললিল আলামিন’ বলে ঘোষণা করেছেন। সূর্যের কিরণ, আসমানের পানি, প্রাণভরা বায়ু ও শস্য-শ্যামলা রত্নগর্ভা ধরিত্রীর মত এই প্রকার আদর্শ সমাজ আল্লাহ তায়ালার রহমত বা করুণার দান; এটা অর্থনেতিক শ্রেণি-সংগ্রামের ফল নয়।[২৭০]

[২৭০] আবুল হাশিম, সমাজের জন্ম ও জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের দৃষ্টিতে সমাজ কাঠামো

সমাজ কাঠামো

সমাজকাঠামো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে খালদুন প্রথমেই মানব সমাজকে দুভাগে ভাগ করেছেন। ১. Sedentary Culture (স্থায়ী আবাসধারী সংস্কৃতি) ২. Bedouin Culture (যাযাবর সংস্কৃতি)। এ দুই সমাজের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও বিরোধকে তিনি ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উপজাতীয় সমাজের সদস্যরা মরুভূমি এলাকা ত্যাগ করে উর্বর ভূমিতে বসতি স্থাপন করে। প্রয়োজনের তাগিদে যাযাবর সম্প্রদায় নগর জয় করে এবং প্রতিষ্ঠিত সভ্যতাকে গ্রহণ করে।[২৭১] ইবনে খালদুনের মতে, জীবিকা নির্বাহের ভিন্নতাই সমাজ- সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিন্নতা তৈরি করে যা কার্ল মার্কসের ভাষায় Means of production বা উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদন সম্পর্ক যা সমাজের সকল স্তরের কাঠামো তৈরি করে।

সমাজের প্রথম জনগোষ্ঠী যা নির্মাণ করে তাদের বংশধর দ্বিতীয় জনগোষ্ঠী তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। পরবর্তী বংশধরেরা তা উপভোগ করে এবং সর্বশেষ জনগোষ্ঠী তা ধ্বংস করে ফলে আবার গড়ে উঠে এক নতুন সমাজব্যবস্থা। এ ধরনের বৃত্তাকারে আবর্তন সব সামাজিক বিবর্তনের ধারা।

অনেকগুলো ধাপের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন হয়। কারণ সমাজ এমন কোনো জিনিস নয় যা হুট করে পরিবর্তন হতে পারে। সমাজ একটি ধারাবাহিক প্রবাহমান প্রক্রিয়াশীল বিষয় যা ক্রমধারায় অবিরত পরিবর্তন হয়ে চলছে। নিম্নে সমাজ পরিবর্তনের ধাপসমূহ আলোচনা করা হলো।

সমাজ সংঘবদ্ধ জীবন

ইবনে খালদুনের মতে, মানুষ মূলত সামাজিক জীব। জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পথকে অনুসরণ করে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং এ থেকে সমাজের উদ্ভব ঘটে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত মানুষ চলতে পারে না। প্রয়োজনের

---

২৭১ ইবনে খালদুন মানুষের জীবনযাত্রার মানকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি জীবন যাত্রার নিম্নস্তর বেদুঈন জীবনধারাকেই সভ্যতার ভিত্তি মনে করেন। এক্ষেত্রে তিনি মানদণ্ড হিসেবে এমন সব উপকরণ বুঝিয়েছেন, যা ব্যতীত একজন মানুষের পক্ষে জীবন ধারণ করা সম্ভব নয় এবং সভ্য সমাজে বসবাস করার উপযুক্ত নয়। যেমন, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান– এই তিনটি মানুষের মৌলিক চাহিদা। (দ্র. মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, অনুবাদ, এডভোকেট মো: মোস্তফা জামাল ভূঞা (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ২১৫ (টীকা)।)

তাগিদেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করে এবং পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব জাগিয়ে তোলে। অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন থেকে শুরু করে মানুষ ক্রমশ পরিমার্জিত ও পরিশোধিত যৌথ জীবনধারার দিকে ধাবিত হয়। ইতিহাসের উচিত সভ্যতার লগ্ন থেকে বর্তমান সভ্যতা পর্যন্ত সমাজের ধারাবাহিক বিবর্তনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা। ইতিহাসকে অবশ্যই জীবনের অভাব অভিযোগ মেটাবার লক্ষ্যে মানুষের কার্যকলাপের গতিপ্রকৃতি আবিষ্কার করতে হবে। মানুষ কেন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়, কেন একজন শাসকের অধীনে বাস করে এবং শেষ পর্যন্ত কেন তারা এমন এক সমাজ গঠন করে, যেখানে কলা ও বিজ্ঞান চর্চার অবকাশ পাওয়া যায়? একটি অপরিপক্ক সংস্কৃতি শুরু থেকে কি করে মার্জিত সংস্কৃতি গড়ে তোলায় এবং কিভাবেই-বা আবার নতুন সংস্কৃতি গড়তে গিয়ে পুরনো সংস্কৃতি ধ্বংস করা হয়?-এসব প্রশ্নের সদুত্তর ইতিহাসের দেওয়া উচিত।[২৭২]

যাযাবর জীবন

ইবনে খালদুনের মতে, সমাজ জীবন শুরু হয় যাযাবর জীবন (ওমরানে বদবী) থেকে এবং বিকাশের এক পরবর্তী পর্যায়ে তা উপনীত হয় সামরিক রাজবংশের অধীনস্থ জীবনে। যাযাবর পর্যায়ে মানুষ প্রধানত ব্যস্ত থাকত খাদ্য সংগ্রহের কাজে। বিরাজমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিস্থিতির আলোকে জীবনধারণের জন্য তাদের অবলম্বন করতে হয় বিভিন্ন পেশা। এই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা আবার তাদের বাধ্য করে, একজন নেতা বা রাজার অধীনে সংঘবদ্ধ জীবন যাপনে। এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হলো বংশানুক্রমিক নেতৃত্ব।

অধ্যাপক নূরুজ্জামানের মতে, মুকাদ্দিমায় আরব জাতির এক অতি সরল জীবন-যাপন প্রাণালির বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের জীবিকা অর্জনের এক বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়। আর এই জীবিকার সন্ধানে তারা আবিষ্কার করছে নতুন নতুন পথ বা উপায়, মানুষ যতই তার সভ্যতার বিকাশে অগ্রসর হয় ততই সে জীবিকা অর্জনের পথকে সমৃদ্ধ করে। জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পথের বা উপায়ের সংযোজনের মাধ্যমে জীবনযাপনপ্রণালি সহজতর করে তোলে।[২৭৩]

---

২৭২ ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, ১ম সংস্করণ, (ঢাকা: মাওলানা ব্রাদার্স, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৩০৬-৩০৭।

২৭৩ মোঃ নূরুজ্জামান, চিরায়ত সমাজচিন্তা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯।

ইবনে খালদুনের মতে প্রান্তরবাসীদের জীবিকার অর্জনের দু'টি উপায় বর্ণনা করেন– কৃষিকাজ ও পশুপালন (Animal Husbandry)। প্রান্তরবাসীদের উৎপাদন পরিমাণ ছিল খুবই সীমিত। সেজন্য তারা কায়ক্লেশে জীবনধারণ করত। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, উদ্বৃত্তের আবির্ভাব/উদ্বৃত্তের উপস্থিতি তাদের সরল জীবনযাপনের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। এই উদ্বৃত্তই তাদের যাযাবর জীবনের পরিবর্তে স্থায়ী জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে। আর স্থায়ীভাবে বসবাস করার ইচ্ছা থেকে গড়ে তোলে শহর বা নগর। এই নাগরিক জীবন তাদের সরল যাযাবর জীবনের পরিবর্তে জটিল জীবন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। স্টিফেন ফ্রেডারিক ডেল (Stephen Frederic Dale)-এর মতে, 'সহজতর এবং অধিকতর সরল বেদুইন প্রকৃতির সমাজ থেকে বিবর্তিত হয় জটিল এবং উত্তরোত্তর অগ্রগতিশীল নাগরিক জীবন প্রণালী'।[২৭৪]

নগর জীবন

যাযাবর জীবন থেকে ক্রমশ গড়ে ওঠে নগরজীবন। এ পর্যায়ে সম্পদ উৎপাদনের লক্ষ্যে মানুষ বোধ করতে শুরু করে শ্রমবিভাজন ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা। আর্থিক উন্নতি ও সম্পদ অর্জন ক্রমশ জনগণের এক অংশের মধ্যে সৃষ্টি করে অলসতা ও বিলাসী মনোভাব। প্রারম্ভিক পর্যায়ে শ্রম মানুষের জন্য উন্নতি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে ঠিকই, কিন্তু সভ্যতার উচ্চতম পর্যায়ে সমাজের উচ্চতর শ্রেণির ব্যক্তিরা নিজেরা সম্পদ উৎপাদন না করে চেষ্টা করে অপরের শ্রমের উপর বেঁচে থাকার এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত সম্পদ উৎপাদনকারীদের বঞ্চিত করা হয় শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক থেকে। কিন্তু শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েও এসব অবস্থায় গরিব মানুষ ধনীক শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ভয় পায়, কারণ তাদের অসহায় জীবনের সাফল্য নির্ধারিত হতে থাকে সেই ধনিক শ্রেণির প্রতি তাদের মান্যতা ও বশ্যতা দ্বারা।

ইবনে খালদুন উল্লেখ করেন যে, কোনো দল বা যাযাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন সংহতি সুদৃঢ় হয় তখন ঐ দল বা সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। তারা ধীরে ধীরে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে এবং ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠে নগরসভ্যতা। নগরসভ্যতার প্রভাবে যাযাবর জাতি তাদের সংঘবদ্ধ জীবনকে ভুলতে বসে এবং বিলাসব্যবসে গা ভাগিয়ে দেয়। সমস্ত কর্তৃত্ব তারা রাজার উপর ন্যস্ত করে। এই অবকাশে রাজা তার ক্ষমতা ও শক্তি

---

[২৭৪] Stephen Dale, Ibn Khaldun: The Last Greek and the First Annaliste Historian, Int. J. Middle East Stud, No. 38, 2006, p. 438.

কেন্দ্রীভূত করতে থাকেন। বিদেশি ভাড়াটে সৈনিক ও রাজকর্মচারীদের উপর তাকে নির্ভরশীল হতে হয়। এভাবে জাতির বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। অনুরূপে, আল্লাহর ইচ্ছায় রাষ্ট্রের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব তখন অন্য কোনো সুসংহত জাতির হস্তগত হয়।[২৭৫]

শ্রেণি-ব্যবধান

সমাজের মানুষ ক্রমশ গরিব ও ধনী এ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যায়। ধনিক শ্রেণি তাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য গরিব শ্রেণির উপর নির্ভর করে এবং তাদের সাফল্য ও আরাম আয়েশের জন্য কাজ করতে গরিবদের বাধ্য করে। ফলে ধনীরা বিলাসী ও গরিবরা দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। উচ্চতর শ্রেণিগুলো তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ধর্মীয় বন্ধনের দোহাই নিম্নশ্রেণির মানুষকে এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে শান্ত ও তৃপ্ত রাখতে চায়। সে বন্ধন ও হয়ে পড়ে অকেজো ও অনিবার্যভাবে তখন ভেঙ্গে যায় সমাজ। এ থেকে বুঝা যায় সমাজ পতনের শক্তি ও কারণসমূহ ক্রিয়াশীল থাকে সমাজের অভ্যন্তরেই। এভাবে একতার বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে।

সমাজে কৃত্রিম বৈষম্য

সমাজ বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেক মানুষ তাঁর নিজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্পদ উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে মানুষকে সৃষ্টি করা হয় এক কৃত্রিম বৈষম্যে। দরিদ্ররা তখন বুঝতে শুরু করল যে, ধর্ম ও আইনকে নিম্নতর শ্রেণি দুঃখকষ্টের বিনিময়ে এবং উচ্চতর শ্রেণির সুবিধার্থে ব্যবহার করা হয়েছে, এর ফলে বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা দ্রুত ধাবিত হয় অনিবার্য অনাবিল ধ্বংসের দিকে।

এ অবস্থায় এমন এক শক্তিশালী যাযাবর জাতি আবির্ভূত হবে যা তেমন সভ্য না হলেও উদ্বুদ্ধ হবে জনকল্যাণের প্রেরণায়। যাযাবর জাতিই ভেঙ্গে দেবে অসন্তুষ্ট ভরপুর পুরনো ক্ষয়িষ্ণু সমাজকে এবং পূর্ববর্তী সমাজের উপকরণ ও অবদানের সাহায্যে গড়ে তুলবে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা। কিন্তু এ নতুন সমাজও কালক্রমে হবে আগের সমাজের মতই ধ্বংসের সম্মুখীন, এবং এভাবেই ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে চলবে নিজের। সমাজের প্রথম জনগোষ্ঠী যা নির্মাণ করে তাদের বংশধারা। দ্বিতীয় জনগোষ্ঠী তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। পরবর্তী বংশধারা তা উপভোগ কর এবং সর্বশেষ জনগোষ্ঠী তা ধ্বংস করে এবং এর ফলে আবার গড়ে উঠে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা এ ধরনের আবর্তন সব সমাজের বিবর্তনের ধারা। ইবনে খালদুনের

---

[২৭৫] আব্দুল হালিম, মুসলিম দর্শন চেতনা ও প্রবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩।

মতে, এভাবে ইতিহাসের চাকা বৃত্তাকারে জাতির উত্থান-পতনের গতি নির্ধারণ করে। ইবনে খালদুন বলেন, "সমাজের প্রথম বংশধর যা নির্মাণ করে, দ্বিতীয় বংশধর তা রক্ষণাবেক্ষণ করে, পরবর্তী বংশধরেরা তা উপলব্ধি করে এবং সর্বশেষের বংশধরগণ তা ধ্বংস করে।"[২৭৬]

যুদ্ধবিগ্রহ

ইবনে খালদুন বলেন, 'গোত্রপ্রীতিই রাজকীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ বলিষ্ঠ আসাবিয়ায় বলীয়ান হয়েই কোন গোত্র এবং এর যোগ্য নেতা রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রত্যয়ী হয়, অন্য গোত্রের উপর নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। রাজ্য প্রতিষ্ঠা বা অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার সহজ কাজ নয়। রাজবংশ বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধবিগ্রহ দেখতে পাওয়া যায়। বলিষ্ঠ আসাবিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ কোনো গোত্র যদি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অধীনে যুদ্ধ পরিচালনা করে তবে এরকম গোত্রের দ্বারা অন্যসব গোত্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার সম্ভব। অন্য গোত্রের সাথে যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব। এভাবে এক গোত্র অন্য গোত্রের সাথে যুদ্ধে জয়ী হয়ে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে এবং পরাজিত গোত্র জয়ী গোত্রের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। তাদের সাথে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে। বিজিত দল বিজয়ী দলের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে একই গোত্রে, একই নেতার নেতৃত্বে কাজ করে। ফলে গোত্রের কর্তৃত্ব ও শাসনের পরিধি বহুগুণ বেড়ে যায়।[২৭৭]

ইবনে খালদুন বিবর্তনের বাস্তব কারণ নির্দেশ করেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও কৃষ্টিজাত কারণসমূহ যে মানবসমাজ বিকাশের মূলে অন্তর্নিহিত রয়েছে, এই ধারণা ইবনে খালদুনের পূর্বে কেউ করেননি। তিনি সভ্যতার কারণ অন্বেষায় প্রাকৃতিক বাস্তব কারণের উপর নির্ভরশীল হতে পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, কারণ অগ্রগতি ও সীমাহীন- তবে সর্বশেষ এক পরিণত কারণ রয়েছে এবং তা হলো অল্লাহ। অভিজ্ঞতার দ্বারা সবকিছু জানা যায় না। তিনি উল্লেখ করেন, মানুষের জ্ঞান সীমিত এবং জগতের বহু বিষয় সম্বন্ধে মানুষ অজ্ঞ। ইবনে খালদুন আরও বলেন, সচেতন অজ্ঞতাও এক ধরনের জ্ঞান এবং যতটুকু সম্ভব জ্ঞানানুশীলন করা আমাদের কর্তব্য।[২৭৮]

---

২৭৬ অর্থাৎ "অগ্রগতির কাল অপরিহার্যভাবেই অবক্ষয় ও ধ্বংসের পথ অনুসরণ করে"-এই ব্যাপারে সারটন ইবনে খালদুনকে স্পেঙ্গলারের অগ্রদূত বলে মনে করেন। (দ্র. বাল্টিমোর, ইনট্রোডাকশন টু হিস্ট্রি অব সায়েন্স, ১৯৪৭, খ. ৩, পার্ট-২, পৃ. ১৭৭০)

২৭৭ Ibn Khaldun, The Muquaddimah: An Introduction to History (1967), ibid, p. 284-285.

২৭৮ আব্দুল হালিম, মুসলিম দর্শন চেতনা ও প্রবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১-৯২।

ইবনে খালদুনের লেখায় আরব বেদুইনের জীবন বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে আছে। বেদুইনদের মূল পেশা ছিল কৃষি ও পশুপালন। পেশার তাগিদে মরুভূমির ডাকে ঘর ছাড়তে হতো তাদের। প্রকৃতির সাথেই ছিল তাদের সংসারের নিত্য যোগাযোগ আর মেলামেশা। প্রকৃতি যেহেতু সব সময়ই অনিশ্চিত, সেহেতু তাদের জীবনও দুলতো অনিশ্চয়তার দোলনায়। ফলে জীবন রক্ষার তাগিদে একে অপরের উপর নির্ভরশীল হতো। এর ভিত্তিতেই তাদের মধ্যে গড়ে উঠত গোত্র। তাদের গোত্রীয় প্রীতি ছিল তীব্র। অস্তিত্ব রক্ষা কিংবা ক্ষমতা প্রদর্শনের খাতিরে গোত্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধ হতো। নির্দিষ্ট নিরাপত্তা বাহিনী না থাকায় নিজেদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদেরকেই নিতে হতো। ফলে তারা অনেক সচেতন ও শক্তিশালী হয়ে উঠত। খালদুনের মতে রসুল মোহাম্মদ(সা) ইসলামের বৈশ্বিকতার সাথে যাযাবরদের গোত্রীয় প্রীতি ও নানান গুণগুলোর সম্মিলন ঘটিয়ে এর বিকাশকে আরও ত্বরান্বিত করেন এবং পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেন।

নারীরা যেহেতু জীবিকা ও নিরাপত্তার দিক দিয়ে পুরুষের উপর নির্ভরশীল; ফলে এ সমাজে নারী অনেক অবহেলিত। আর এর কারণেই বেদুইন সমাজ পুরুষতান্ত্রিক। বেদুইন সমাজে গোত্র মুখ্য, ব্যক্তি গৌণ। ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এ সমাজে তৈরি হয় না। অন্যদিকে স্থায়ী আবাসধারীদের নিজস্ব স্থায়ী রাষ্ট্র থাকে, তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষী থাকে,ফলে তারা নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে অসচেতন, যুদ্ধে নিজেরা অংশগ্রহণ করে না বলে তারা কম শক্তিশালী। এ সমাজে মানুষের আয় অনেক বেশি, ফলে তারা নিত্য প্রয়োজন মেটানোর পর অন্য দিকে মন দিতে পারে। আর এ জন্যই এ সমাজে শিল্প, সাহিত্যের চর্চা হয় বেশি। এ সমাজের মানুষ প্রয়োজনীয়তা মেটানোর পর বিলাসিতার দিকে ঝুঁকে। আর এর প্রভাব তাদের পোশাক, আসবাবপত্র, খাবার ও জীবনাচরণে দেখা যায়। এর ফলে বাহারি খাবারের হোটেল গড়ে উঠে। অতি ভোজনের ফলে নানান ধরনের রোগ তৈরি হয়। রোগ মুক্তির নিমিত্তে উন্নতি হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের, গড়ে উঠে হাসপাতাল। পোশাকি বিলাসিতার চাহিদা মেটাতে গড়ে উঠে শিল্প-কলকারখানা।এ সমাজের মানুষ গোত্রীয় রীতিকে ঝেড়ে ফেলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জয়গান গায়।তারা অনেক বেশি যৌক্তিক হয়ে উঠে। আর এর ফলেই এ সমাজে জ্ঞান চর্চার জন্য স্কুল,কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠে।

বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা এ সমাজেই বেশি হয়। কারণ, তারা কম সময়ে কম শ্রমে বেশি চায়। তারা সব কিছুকে একটা নির্দিষ্ট ব্যাকরণের মধ্যে নিয়ে আসতে চায়।আর এ জন্যই আইন, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্বের বিকাশ হয়। আইন ও ব্যাকরণের জটিল জালে নিজেদের বন্দি

করতে চায় এ সমাজের মানুষগুলো।এর ফলে তারা তাদের স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে যান্ত্রিক কৃত্রিমতার সীমাবদ্ধ পুকুরে সাঁতার কাটে। অতিমাত্রার রাষ্ট্রীয় নির্ভরশীলতা এ সমাজের মানুষগুলোকে যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার নিজস্ব গুণগুলো নষ্ট করে দেয়। খালদুন উদাহরণ হিসেবে বলেন, ইসলাম ধর্মের উত্থান হয় বেদুইন সমাজে (মক্কায়),বিকাশ হয় স্থায়ী আবাসধারী সমাজে (মদীনায়)। পরবর্তীতে ইসলাম অনুসারীরা স্থায়ী আবাসধারী সভ্যতা যেমন পারস্য, রুম, ইরাক এবং সিরিয়ানদের জয় করে। এবং ঐ সমাজেও ইসলামের বিকাশ হয়। ইবনে খালদুন বলেন, ইসলামের বেশিরভাগ পণ্ডিত অনারব অর্থাৎ স্থায়ী আবাসধারী সমাজের।

বেদুইনরা ধর্ম চর্চায় বেশি গুরুত্ব দেয় বিশ্বাস, ভক্তি ও উৎসর্গকে আর অন্যদিকে স্থায়ী আবাসীরা গুরুত্ব দেয় চিন্তা, বুদ্ধি ও গবেষণায়। তারা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ গুলোকে বস্তুজগতের ভাল-মন্দের মানদন্ড দিয়ে বিচার করে বেশি। খালদুনের মতে, সভ্যতার উত্থান হয় যাযাবর সমাজে এবং এর বিকাশ ও পতন ঘটে স্থায়ী আবাসধারী সমাজে। তার মতে এ দু সংস্কৃতির মিলন-দ্বন্দ্ব, সংযোজন, বিয়োজন ও সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমাজ,সভ্যতা ও সংস্কৃতি নতুন রূপ পায় ও এগিয়ে চলে। ইবনে খালদুনের পরবর্তী সমাজতাত্ত্বিকরা তার সমাজ ব্যাখ্যার কাঠামো দ্বারা অনেক প্রভাবিত হয়েছেন।

আধুনিক পাশ্চাত্যের সমাজতাত্ত্বিক অগাস্ট কোঁত Positivism (দৃষ্টবাদ), এমিল ডুর্খেইম এর সমাজ বিন্যাসে Organic solidarity (জৈব সংহতি) ও Mechanical solidarity (যান্ত্রিক সংহতি), ম্যাক্স ওয়েবারের পুঁজিবাদের উত্থান দেখাতে গিয়ে Protestantism-I Catholic দের চিন্তাগত ফারাক, হেগেলের ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতাবাদ সবই ইবনে খালদুনের সমাজ ব্যাখ্যার কাঠামো দ্বারা প্রভাবিত।

দার্শনিক হিসেবে খালদুনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বরাবরই ব্যতিক্রমধর্মী, যা নিম্নোক্ত উদ্বৃতিটিতে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃতি পেয়েছেঃ “Ibn Khaldun is all the time contrasting not urban and country life, or bourgeosis and popular life, as westerners do, but settled and nomadic life, and trying to explain the paradox involved, for a fixed settlement is the condition of cultural progress, but is also the source of corruption and decadence; it is the origin at once of urbanity and of racial

deterioration".[২৭৯] অর্থাৎ, ইবনে খালদুন সব সময় পাশ্চাত্যের মতো শহুরে ও গ্রামীণ জীবন অথবা বুর্জোয়া ও সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে নিয়োজিত ছিলেন না। তিনি বরং স্থায়ী এবং যাযাবর জীবনের মধ্যকার বৈপরীত্যগুলো ব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছেন। কারণ স্থায়ী বসতি সাংস্কৃতিক প্রগতির পূর্বশর্ত হলেও এটি সমাজ জীবনে দুর্নীতি ও অবক্ষয়ের সূত্রপাত করতে পারে। শুধু তা-ই নয়, এটি যুগপৎ নাগরিকতাবোধের বিকাশ ও বর্ণগত অবনতিও ঘটাতে পারে। আর এভাবে এক সভ্যতার পতনের পর অন্য একটি নতুন সভ্যতা সৃষ্টি হয়। সভ্যতার উত্থান-পতনের পরিপেক্ষিতে খালদুনের উক্ত ধারণাকে বিচার করলে তাঁকে জার্মান সামাজিক ইতিহাসবিদ অসওয়াল্ড স্পেংগলার (১৮৮০-১৯৩৬)-এর প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর আগের সমাজ দার্শনিক হিসাবে গণ্য করা যায়। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে স্পেংগার রচিত গ্রন্থটির নাম The Decline of the West; Perspectives of world History (1926), এছাড়া, এখানে অন্য একজন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী জর্জ যিমেল (১৮৫৮-১৯১৮) রচিত Problems of the Philosophy of History (1892) নামক গ্রন্থটিকে যুক্ত করা যায়। যিমেল 'আনুষ্ঠানিক সমাজবিজ্ঞান' (Formal Sociology)-এর প্রবর্তক বলে পরিচিত।[২৮০]

---

২৭৯ George Sarton, Introduction to the History of Science, Vol. III (baltimore: The Williams and Wilkins Company, 1948), p. 1770.

২৮০ অধ্যাপক রংগলাল সেন, ইবনে খালদুন, সমাজবিজ্ঞানের অনানুষ্ঠানিক জনক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, অর্থনৈতিক, দর্শন ও ভূগোলশাস্ত্রে ইবনে খালদুনের অবদান

১ম পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রদর্শন

২য় পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের ইতিহাস দর্শন

৩য় পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের অর্থনৈতিক দর্শন

৪র্থ পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের দার্শনিক মতবাদ

৫ম পরিচ্ছেদ
আধুনিক সমাজচিন্তাবিদদের তত্ত্বে ইবনে খালদুনের প্রভাব

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ
ভূগোলশাস্ত্রে ইবন খালদুনের অবদান

৭ম পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুন সম্পর্কে আধুনিক দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের অভিমত

১ম পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রদর্শন

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

মানব সমাজের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র। রাষ্ট্র (পলিস) বা রাজনৈতিক সংঘ হল মুকুটসম। অতএব, এটা মানুষের জন্য স্বাভাবিক এবং সে নিজে প্রকৃতিগতভাবে একজন রাজনৈতিক প্রাণী।[২৮১] ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমায় রাষ্ট্রকে 'দওলাত' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে 'সংহতি' (group mind) বা 'আসাবিয়া'। বিভিন্ন ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কারণে এই সংহতি সংঘটিত হয়। জীবন-জীবিকার অভাব পূরণ এবং বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদে মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতার প্রয়োজন অনুভব করে। এজন্য তাঁর সমগ্র রাষ্ট্রদর্শনে আসাবিয়া (Asabiya) সংগতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ইবনে খালদুন রাষ্ট্র উদ্ভবের মূল কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন: "যখন কোনো স্থানে সমাজ কায়েম হলো বা জনবসতি স্থাপিত হলো সেক্ষেত্রে এমন একটি নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠন বা সংস্থা থাকা আবশ্যক, যা সমাজ সদস্যের একে অপরের প্রতি অন্যায়, অবিচার, নিপীড়নকে দমন করবে। তাছাড়া সৃষ্টিগতভাবে মানবচরিত্রে সীমালঙ্ঘন, নিপীড়ন, জুলুমের প্রবণতা অধিক হারে কার্যকর। মানুষের এ প্রবণতা দমনের জন্য সাধারণ হাতিয়ার যা বন্যপশুদের আক্রমণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অধিকহারে থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে এমন একটি কর্তৃত্ব অবশ্যম্ভাবী; যা তাদের সীমালঙ্ঘনমূলক তৎপরতা প্রতিহত করবে এবং সমাজে শান্তি ও স্থিতি বজায় রাখবে, যাকে আমরা 'মুলক' রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করি।"[২৮২] তিনি আরও বলেন, "মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হলো, একজন শাসকের অধীনে সুস্থ জীবন যাপনে অভিলাষী। যেমনটি মানুষ ছাড়াও অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে সত্য। যেমন, মধুমক্ষিকাদেরও একজন কর্তৃত্বশালী শাসক আছে, যার আনুগত্য তারা করে থাকে।"[২৮৩]

এ্যারিস্টোটল রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেননি। তিনি রাষ্ট্র ও সমাজকে একই সংগঠন হিসেবে ভেবেছেন। কিন্তু ইবনে খালদুনের চিন্তাধারায় নতুনত্বের আভাস লক্ষ

---

[২৮১] Earnest Barker, The Politics of Aristotle (London: Oxford, 1961), p. 6-7.

[২৮২] ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা (কায়রো: ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৫০।

[২৮৩] আবদুল ওদুদ, সমাজ দর্শন (ঢাকা: মনন পাবলিকেশন্স, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৯-২০।

করা যায়। তিনি রাষ্ট্র ও সমাজকে দুটো ভিন্ন ও আলাদা সংগঠন হিসেবে চিন্তা করেছেন এবং অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তাদের মধ্যতার সম্পর্ক হচ্ছে অভেদ্য ও পরস্পর নির্ভরশীল।[২৮৪]

যে সংহতির কারণে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়, সেই সংহতির উদ্ভব অন্য একটি কারণেও হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, মানব স্বভাব ও প্রকৃতিতে পশুসুলভ মনোবৃত্তি বিদ্যমান। এই ধরনের মনোবৃত্তি মানুষের মধ্যে বিরুদ্ধভাবাপন্ন দ্বন্দ্ব ও কলহ সৃষ্টির ইন্ধন যোগায়। ফলে, সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হয়। সামাজিক সংহতি রক্ষার্থে একটি শক্তিশালী কর্তৃপক্ষের উপস্থিতির প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই কর্তৃপক্ষ তাদের ক্ষমতা ও আধিপত্যের মাধ্যমে অন্যদেরকে দ্বন্দ্ব-কলহ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবে। এই ধরনের ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়। জনগণের মধ্যে সংহতি বজায় রাখার জন্য এই কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন। এ ধরনের সংহতিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে রক্ত বা আত্মীয়তার সম্পর্ক। ইবনে খালদুন সংহতি বা রাষ্ট্র সৃষ্টির মূলে ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাবের কথা অস্বীকার করেননি।[২৮৫]

ইবনে খালদুনের মতে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিকাশ, শীর্ষারোহণ, অবক্ষয় ও পতন (Origin, growth, peak, decline and fall) আসাবিয়ার আনুপাতিক পরিমাণের উপর নির্ভরশীল।

আসাবিয়ার প্রকৃতস্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক রোজেন্থাল বলেন, ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে কতকগুলো সমভাবাপন্ন মানুষের সক্রিয় সমর্থনের প্রয়োজন। মূলত একেই খালদুন 'আসাবিয়া' বলে অভিহিত করেন।

ইবনে খালদুনের মতে, রাষ্ট্র স্থাপন ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠা একমাত্র জনসমর্থন ও আসাবিয়্যার উপর নির্ভরশীল। এর কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, "যেমন, জয় করা, এমনকি পরাজয় এড়ানো, এমন দলের ভাগ্যে ঘটে যার সংহতি সর্বাপেক্ষা বেশি এবং যে দলের লোকেরা যুদ্ধ করার জন্য ও পরস্পরের (নিরাপত্তার) জন্য মৃত্যুবরণ করতে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রস্তুত। রাজত্ব একটি সম্মানীয় লোভনীয় বস্তু যা এর অধিকারককে সর্বপ্রকার পার্থিব সুযোগ-সুবিধা এবং শারীরিক ও মানসিক সন্তুষ্টি প্রদান করে।" তাঁর মতে, "রাজত্ব একটি ঘোর

---

[২৮৪] আব্দুল হালিম, মুসলিম দর্শন চেতনা ও প্রবাহ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৯২।

[২৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার বস্তু এবং কচিৎ কেউ বাধ্য না হলে ইচ্ছাকৃতভাবে এটা ছেড়ে দেয়।"[২৮৬] কিন্তু রাজত্ব কারও নিকট থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য অথবা কাউকেও এটা ছেড়ে দেবার জন্য বাধ্য করার উদ্যোগ ইবনে খালদুনের মতে, "সংগ্রাম ও যুদ্ধের কারণ হয়, রাজত্বের উত্থান-পতন ঘটায় এবং এসব প্রক্রিয়ার কোন অংশই আসাবিয়্যার সংযোগ ছাড়া সংঘটিত হতে পারে না।"[২৮৭]

ইবনে খালদুন মনে করেন, 'রাজ্য প্রতিষ্ঠা' অথবা নগরাদি বিজয়ের মাধ্যমে তখনই রাষ্ট্র স্থাপিত হয়, যখন কোনো আদিম জনগোষ্ঠী, আসাবিয়া ও ধর্মের বন্ধনের দ্বারা একতাবদ্ধ হয়ে, তাদের স্বাভাবিক ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা ইত্যাদি পূর্ণ করার জন্য ও তাদের সম্ভাবনাগুলি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং আদিম সভ্যতার স্তরে আরম্ভ করা জীবনের ধারাগুলির পূর্ণতা অর্জনের মানসে এরূপ রাজ্য স্থাপন করে বা অন্য কোনো নগর বা রাজ্য জয় করে।"[২৮৮]

রাষ্ট্র শাসনের ভিত্তি

মানুষের প্রকৃতিগত পশুসুলভ মনোবৃত্তিকে দমন করার জন্য এককেন্দ্রিক ক্ষমতাশালী সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন রয়েছে বলে ইবনে খালদুন মনে করেন। এর কয়েক শত বছর পর ইংরেজ দার্শনিক হবসও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রের সদস্যদের অন্তর্কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে বিরত রেখে রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য এই নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি একান্ত আবশ্যক। এই নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি থেকে একজন শক্তিশালী প্রধানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে মানুষের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-কলহকেও শান্ত করে। এই ধরনের রাষ্ট্রকে অপরিসীম সামাজিক ক্ষমতার অধিকারী হতে হয়– এই হচ্ছে সার্বভৌম শক্তি বা সার্বভৌমত্ব। ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রান্সের জ্যাঁ বোঁদা সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে আইনগত যে মতবাদ ব্যক্ত করেছেন, ইবনে খালদুন তা বহু পূর্বেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সামাজিক ক্রমবিবর্তনের ধারায় ইতিবাচক-নেতিবাচক সূত্রের 'আয়াসী' সমাজের স্তর পার হয়ে রাষ্ট্রীয় প্রথম পাদে ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রদর্শন সম্বন্ধীয় আসল প্রশ্নের সূত্রপাত হয়। চতুর্দশ খ্রিস্টীয় শতাব্দীতে ইবনে খালদুন ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বাধুনিক 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের' জন্ম

---

[২৮৬] James Kritzeck ed., Anthology of Islamic Literature, 1964, pp.285.

[২৮৭] ibid.

[২৮৮] Muhsin Mahdi, Ibn Khaldun's Philosophy of History, ibid, p. 204.

দেন। ইবনে খালদুনের আবিস্কৃত নতুন বিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্বের 'বয়োপ্রাপ্তি' ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সত্যিকারের সূচনা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার গভীরতায় তিনি যেরূপ মধ্যযুগীয় ভাবধারাকে যুক্তিতত্ত্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করেন, তেমনি পদ্ধতিগত বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি আধুনিকতার সূচনা করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি হলেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ নায়ক ও আধুনিক যুগের প্রথম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ।[২৮৯]

রাষ্ট্রের প্রকারভেদ

ইবনে খালদুন তিন প্রকার রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। যথা- (১) ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র (সিয়াসা দীনিয়া) (২) যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র (সিয়াসা আক্বলীয়া) (৩) দার্শনিকদের আদর্শ রাষ্ট্র (সিয়াসা মাদানীয়া বা মাদীনা ফাযিলা)।[২৯০] ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্রে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে মানুষের যে বিশ্বাস রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে আনুগত্য দাবি করা হয়। যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র মানবিক যুক্তির দ্বারা আবিস্কৃত আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের সুফল ইহকাল ও পরকালে লাভ করা যায়। যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্রের সুফল শুধুমাত্র ইহকালেই লাভ করা যায়। আর আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিফলন বাস্তবে অসম্ভব এটা শুধু অনুমানমূলকভাবে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

ইবনে খালদুন গভীরভাবে উপলদ্ধি করেন যে, যে কোনো দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে তার বলিষ্ঠ অর্থনীতি এবং এই অর্থনীতি জন্য সুষম বাজেটের প্রয়োজন অপরিহার্য। তিনি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের অর্থনীতিকেই আদর্শ অর্থনীতি বলে মনে করেন।[২৯১]

রাষ্ট্রের ব্যাপ্তি এবং এর আয়ুষ্কাল

যখনই কোনো সভ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, ইবনে খালদুনের মতে, তা মানব সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গগুলির মত– জন্ম, বৃদ্ধি, যৌবন, বার্ধক্য ও লয়জনিত প্রকৃতির অমোঘ নিয়মগুলির

---

২৮৯ ড. মঈনউদ্দিন আহমদ খান, ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রদর্শন, জার্নাল অব ইসলামিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইসলামিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্টাডি সেন্টার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ৪-৫, ১৯৯৮-৯৯, নং-১, পৃ, ৪২-৪৩।

২৯০ E. I. J. Rosenthal, Political Thoght in Medieval Islam (U.S.A.: Cambridge University press, 1962), p, 87.

291 H.K. Sherwani, Studies in Muslim Political Thought and Administration, (Lahore, Review, 1965), p. 196.

অনুসরণ করে।[২৯২] খালদুন রাষ্ট্র বিকাশের পাঁচটি পর্যায় চিহ্নিত করেছেন। এসব হলো: বিজয়, রাজবংশ প্রতিষ্ঠা, সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন, অবক্ষয় এবং পতন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, "a connection between the upward and downward development of the state, the character of rulers and ruled, conditioned by psychological and economic factors, and the stability of the political order is its dependence on defence and security. There is no upward surge towards the millennuim. The state is, like a natural organism, subject to growth, maturity and decline." অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিকাশের উত্থান ও পতন এবং শাসক ও শাসিতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভেতর সম্পর্ক রয়েছে, যা মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত। রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব তার প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে হাজার বছর ধরে উত্থান অব্যাহত থাকে না। কারণ রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক জৈবিক সত্তার সমতুল্য, যার রয়েছে প্রবৃদ্ধি, পরিপক্কতা ও পতন।[২৯৩]
ইবনে খালদুন মনে করেন, কোনো রাষ্ট্র তিন জমানার অধিক টিকে থাকতে পারে না। চল্লিশ বৎসর এক জমানা ধরা হয়, অর্থাৎ কোনো রাষ্ট্র ১২০ বৎসরের বেশি টিকে থাকতে পারে না। ইবনে খালদুন রাষ্ট্রের আয়ুষ্কাল তিনটি পর্বে ভাগ করেন, প্রতিটি পর্বের স্থায়িত্বকাল তাঁর মতে চল্লিশ বছর। প্রথম পর্বে সদস্যদের শৌর্যবীর্য ও আদেশের আতিশয্যে রাষ্ট্র সৃষ্টি ক্রমশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় পর্বে স্বগোত্রীয় সংহতি বেশ হ্রাস পায়, কারণ সদস্যগণ স্থিতিশীল নগরজীবনের ভোগবিলাসে মত্ত থাকে। এতদসত্ত্বেও তাদের মধ্যে তখনও পূর্বপুরুষদের শৌর্যবীর্যের রেশ কিছুটা থেকে যায়। তৃতীয় ও শেষ পর্বে রাষ্ট্র শাসক ও নাগরিকবৃন্দ নিরবচ্ছিন্ন ভোগবিলাসের প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে সংহতিকে নষ্ট করে দেয়– নিঃশেষ হয়ে যায় ঐক্যবোধ। ফলে রাষ্ট্রের পতন বা বিলুপ্তি ঘটে খোদ আল্লাহর নির্দেশে।[২৯৪]

---

[২৯২] Muhsin Mahdi, Ibn Khaldun's Philosophy of History (USA: University of Chicago Press, 1964), p. 204.

[২৯৩] Franz Rosenthal, ibid, p. 86-89.

[২৯৪] প্রাগুক্ত।

রাষ্ট্রের স্বাভাবিক আয়ু সম্পর্কে ইবনে খালদুন বলেন যে, রাষ্ট্র সাধারণত চার পুরুষ ধরে টিকে থাকে এবং চার পুরুষ তা পরিবর্তনের পাঁচটি পর্ব অতিক্রম করে ধ্বংসের পথে বিলীন হয়ে যায়।[২৯৫] পাঁচটি পর্বকে তিনি নিম্নলিখিতভাগে ভাগ করেছেন:

১ম পর্ব: সংহতির ভিত্তিতে শাসক শত্রুতে পরাজিত করে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং 'আসাবিয়া'র চাহিদা মোতাবেক সে নাগরিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে এবং শাসন পরিচালনা করে।

দ্বিতীয় পর্ব: এ পর্বে সে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জন করে এবং তার অনুসারীদের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই শাসন করে। ঐ নাগরিকগণ তাদের নিজেদের সঙ্গে শাসনের যে অংশীদারিত্ব দাবি করে সে তা ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং তা ভাড়া করা লোকদের সাহায্যে এবং তার সমর্থকদের (চাটুকার) সাহায্যে সে তার শাসন কায়েম রাখার প্রয়াস পায়। পরিশেষে শাসনের সব ক্ষমতা নিজ পরিবারের মধ্যে কুক্ষিগত করে নেয়।

তৃতীয় পর্ব: এ অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব। এটি আরাম-আয়েশ ও বিশ্রামের পর্ব। এ পর্বে সে শাসন ও কর্তত্বের যাবতীয় সুফল নিজেই ভোগ করে এবং অর্থ ব্যয়ে মিতাচার অবলম্বন করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে আবার প্রাসাদাদি নির্মাণের ব্যাপারে অধিক মনোযোগ দেয়। তার পরিবারবর্গ ও সমর্থকদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করে এবং সেনাবাহিনীকে নিয়মিত মাইনা প্রদান করে। এসব করার পেছনে উদ্দেশ্য হলো, মিত্রদের উপর প্রভাব বিস্তার করা এবং শত্রুদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করা।

চতুর্থ পর্ব: এ পর্বে শাসক তার পূর্ব পুরুষগণ যা নির্মাণ করে গেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকে। মিত্র ও শত্রু নির্বিশেষে অন্য সকল শাসকের সঙ্গে সে শান্তিতে বাস করতে চায় এবং যতদূর পারে তার পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করে চলে।

পঞ্চম পর্ব: এ পর্ব হচ্ছে বিলাসিতা ও অপচয়ের পর্ব। এ পর্বে সে তার পূর্বপুরুষদের সঞ্চয়কৃত যাবতীয় সম্পদ নষ্ট করে ফেলে এবং তা করে শুধু ভোগ ও লালসার জন্য। সে তার ঘনিষ্ঠ সহচরদের প্রতি অত্যধিক বদান্যতা প্রদর্শন করে এবং ভোজসভাগুলোর জন্য অযথা অর্থ অপব্যয় করে। এসব করার অর্থ হচ্ছে, সে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে যেসব অপদার্থ লোকদের নিয়োগ করে তাদের চিত্ত জয় করা। এভাবে সে দেশের সম্ভ্রান্ত ও গুণী ব্যক্তিদের আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং তাদের অন্তরে ঘৃণা-বিদ্বেষের সূচনা হয়। পরিশেষে এসব লোক

---

[২৯৫] Franz Rosenthal, ibid, p. 90.

ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাকে পরিত্যাগ করে। তা ছাড়া সেনাবাহিনীর মাইনা বন্ধ করে দেয় তাদের সে অর্থ নিজের আমোদ-প্রমোদ ফুর্তিতে ব্যয় করার জন্য এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাদেরকে কাছে ঘেঁষতে না দেয়ার জন্য সে তাদেরও সমর্থন হারিয়ে ফেলে। এ পর্বে রাজবংশের স্বাভাবিক অবক্ষয়ের দ্রুত সূচনা হয় এবং তা এমনই এক কাল ব্যধির কবলে পতিত হয়, যা তাকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

এক কথায়, যে ইতিবাচক সৃজনশক্তি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণ হয়েছিল, প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম-এর সীমারেখা অতিক্রমের পর, রাষ্ট্রের গতিবেগের শেষ প্রান্তে, উক্ত সৃজনশক্তির নেতিবাচক প্রতিবিম্ব, রাষ্ট্রের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[২৯৬] পরিশেষে কোনো বহিরাক্রমণ রাষ্ট্রটির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়, অথবা অধঃপাতের মুখে ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে, ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়– বাতির সলিতা যেমন তেলের অভাবে ভষ্ম্য হয়ে যায়।[২৯৭]

অধ্যাপক রোজেন্থাল (Rosenthal) বলেন, 'আমার জ্ঞানে ইবনে খালদুনই হচ্ছেন মধ্যযুগের প্রথম চিন্তানায়ক যিনি রাষ্ট্রনীতিতে এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংগঠিত যে কোনো সমাজের সার্বিক জীবনে অর্থনীতির বিষয় তিনি উপলব্ধি করেন।" ইবনে খালদুন উল্লেখ করেন যে, গোষ্ঠীয় সংহতির বন্ধন যখন শিথিল হয়ে যায়, তখন রাজাকে তাঁর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করতে হয় এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর অর্থের। এ অর্থ তিনি কর আদায়ের মাধ্যমে অনেক সময় সক্রিয়ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। কিছুদিন পর যখন তাঁর হাতে অগণিত সম্পদ জমা হয়। তখন তিনি আরাম-আয়েশে এবং বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেন। এর অপরিহার্য ফলস্বরূপ তাঁর ধ্বংসের সূচনা দেখা দেয়। তিনি আত্মরক্ষার নিমিত্ত এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন যার ফলে প্রজাবৃন্দ তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এর ফলে শুধু যে রাজবংশের পতন হয়, তা নয়, খোদ রাষ্ট্রেরও মৃত্যু ঘটে। দার্শনিক প্লেটো বংশকে ফলের সঙ্গে তুলনা করে এক অনুপম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, শুরুতে ফল শক্ত হবার দরুণ খাওয়া যায় না। যখন কিছু পরিপক্ক হয়, তখন তার মাঝামাঝি অবস্থা আর যখন পরিপূর্ণ পক্কতা প্রাপ্ত হয়, তখন তা সুস্বাদু হয়। কিন্তু অতিরিক্ত পেলে গেলে পচন ধরে এবং অখাদ্য হয়।[২৯৮]

---

২৯৬ ড. মঈনউদ্দিন আহমদ খান, ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রদর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

২৯৭ Muhsin Mahdi, ibid, p. 189.

২৯৮ F. Rosental, The Muqaddimah, Translation from the Arabic (London: 1958), P. Lxxxi, footnote.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের ইতিহাস দর্শন

ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) আধুনিক ইতিহাস দর্শনের ইতিহাসে এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আর্নল্ড টয়েনবির মতে, 'তিনি এক তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস-দর্শনের প্রণেতা ছিলেন। এ কালের যে কোনো দেশের ও যে কোন কালের মানবীয় মননশক্তির তিনি সবচেয়ে বড় পরিচয়।'[২৯৯] তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাব আল-ইরাব' গ্রন্থে ইতিহাস জ্ঞানের জটিল আবর্ত সম্পর্কে যে সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ করেন তা তাঁকে ইতিহাস দর্শনের জগতে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী করে রেখেছেন। তিনিই ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করেন এবং একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, যথাযথ ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা বিপুল। প্রফেসর এম.এ. শরীফের মতে, It is a truism to repeat the Ibn Khaldiun's contribution in connecting history with sociology has been outstanding.[৩০০] নিম্নে ইবনে খালদুনের ইতিহাস-দর্শন সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

ইতিহাসের সংজ্ঞা

ইতিহাসের[৩০১] সংজ্ঞা, রূপ, বিষয়বস্তু ও দর্শন নিয়ে সুধী মহলে আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক নতুন নয়। কেউ ইতিহাসকে 'মহাপুরুষের জীবন চরিত', আবার কেউ অতীতের তথ্য সম্বলিত 'ফটোগ্রাফ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার অনেকের মতে, ইতিহাস মানে তথ্যের সমাবেশ নয়; বরং এর যথার্থ বিশ্লেষণই ইতিহাসের সার্থকতা। মহাকাল রচিত

---

[২৯৯] A.J. Toynbee, A Study of History, (London: Oxford University press, 1962), Reprint, Voll III, p. 322.

[৩০০] Prof. M.M. Sharif : A History of Muslim Philosophy (Germany, 1866), Vol. 2, p. 1217.

[৩০১] 'ইতিহাস' শব্দটির ইংরেজি পরিভাষা 'History' এবং গ্রীক সাহিত্যে Historia বা Istoria হিসেবে ব্যবহৃত হত। এর অর্থ হলো 'কোন ঘটনা বা বিষয়ের সত্য উদ্‌ঘাটনের অনুসন্ধান তথা জিজ্ঞাসা বা 'তদন্ত'। আরবী সাহিত্যে ইতিহাসের পরিভাষা হল 'খবর' বা 'তারিখ'। তবে ইতিহাসের বহু প্রচলিত আরবী শব্দ হল 'তারিখ' (tarikh) এর অর্থ হল- সময় বা কাল লিপিবদ্ধকরণ। (al-Kafij, Mukhtasar fi ilm al-tarikh, text and english translation in F. rosenthal, A History of Muslim Historigraphy, Leiden 1952, p. 245-262; Abdur Rahman al-Sakawi, al-Ilam bit-tawbik li-man dijamma ahl at tawrik (i.e. the open denunciation of the adverse critics of the historians) eng. tr. F. Rosental, A History of Muslim Historiography, Lieden, 1952, pp. 203-204; ড. মো. আখতারুজ্জামান, মুসলিম ইতিহাসতত্ত্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১; ২১-২২)

একটানা সেতুবন্ধনের নাম ইতিহাস। তাই তথ্য, জীবনী, ঘটনাপ্রবাহ, কার্যকারণ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ সবই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।[৩০২] ইবনে খালদুন ইতিহাসের সংজ্ঞায় বলেন, 'ইতিহাস অর্থগতভাবে কেবলমাত্র রাষ্ট্র বা ধর্ম নয়, ইতিহাস হচ্ছে মানুষের কার্যাবলির বিবরণী, সভ্যতা বিকাশের অমর কাহিনি।'[৩০৩]

ইতিহাস-দর্শন

'ইতিহাস-দর্শন' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ভলতেয়ার। তাঁর মতে এর অর্থ হচ্ছে সমালোচনামূলক বা বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস। হেগেলের ইতিহাস দর্শন সংক্রান্ত বক্তৃতামালায় এ শব্দ দু'টির ব্যবহার বিশ্বের ইতিহাস বা সার্বজনীন ইতিহাসের ইঙ্গিতবহ। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক জে.বি. বারি (১৮৬১-১৯২৭খ্রি.) এক বক্তৃতায় বলেন, History is a Science, no less, no more.[৩০৪] সুতরাং ইতিহাস দর্শন বলতে সাধারণত ঐতিহাসিক ধারার সার্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে বুঝায়। মধ্যযুগে ইতিহাস দর্শনের মূলে ধর্মতত্ত্ব ক্রিয়াশীল ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সমালোচনা ও বিশ্লেষণমূলক ইতিহাস দর্শনের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।[৩০৫] এই নতুন দর্শন ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে মানব-ইতিহাসকে অজ্ঞতা অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তির পথ দেখায়। বিংশ শতাব্দীতে আদর্শবাদী ও বস্তুবাদী ইতিহাস দর্শনই বেশি প্রচলিত। ইবনে খালদুনের মতে, 'ইতিহাস মানব সমাজ ও সভ্যতার বিবরণ, সমাজের রূপে যে পরিবর্তন আসে, তার কাহিনি, সমাজের এক অংশের বিরুদ্ধে অপরের সংঘাত ও বিপ্লবের বৃত্তান্ত, সমাজের পুনর্গঠন অথবা এক যুগ থেকে যুগান্তরের আলেখ্য। অর্থাৎ সমাজের রূপান্তরই ইতিহাসের গতি। সেই রূপান্তরের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণই ইতিহাসের প্রাণ।'[৩০৬]

ইবনে খালদুন তাঁর বিখ্যাত বই 'আল-মুকাদ্দিমা'র শুরুতে বলেন, "ইতিহাস এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা বিশ্বের সকল জাতি ও গোত্রের নিকট সমাদৃত। সাধারণ মানুষগুলো তা জানতে আগ্রহী এবং রাষ্ট্রপতি ও নেতৃস্থানীয়রা তাতে স্থান পেতে প্রতিযোগিতা করে"।

---

[৩০২] গোলাম কিবরিয়া, ইতিহাস তত্ত্ব (ঢাকা: সানডে পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৭।

[৩০৩] মোঃ আয়েশ উদ্দিন, রাষ্ট্র চিন্তা পরিচিতি (ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৭।

[৩০৪] অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার, ইতিহাসের দর্শন (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ২।

[৩০৫] R.G. Collingwood, The Idea of History (Oxford: 1946), P-12.

[৩০৬] সুশোভন সরকার, প্রসঙ্গ ইতিহাস (কলকাতা: ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৫১।

ইতিহাসের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে, কিভাবে সমাজের পরিবর্তিত অবস্থা তাদের সম্পর্কের জালগুলোতে প্রভাব ফেলে। কিভাবে একটা গোত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করে এবং কিভাবে তার পতন ও বিকাশ হয়। কিভাবে অন্য সাম্রাজ্য এসে পুরাতনদের পতন ঘটায় এবং নব্য সাম্রাজ্যের বিস্তার করে।

ইবনে খালদুন বলেন, মানব সমাজের প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন অলক্ষ্যে সাধিত হচ্ছে, তা সম্যক উপলব্ধি করা ও তার যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা ঐতিহাসিকের কাজ। এ পরিবর্তন নানা রকমের হয় এবং নানাভাবে প্রকাশ পায় বর্বরতায়, নগর-সামাজিকতায়, বা ধর্মীয়, জাতীয় বা গোষ্ঠীসুলভ সংহহিতে। নব নব শ্রেণির উত্থান-পতন, বিপ্লব, রাজ্য জয়, রাষ্ট্রগঠন বা রাষ্ট্র পরিবর্তনেই তার পদক্ষেপ। মানুষের অভাব পূরণ ও জীবন যাত্রার জন্য বিভিন্ন শিল্পকলার উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধন এ পরিবর্তনেরই সাক্ষ্য দেয়। ইতিহাস তাই মানব সমাজের সামগ্রিক জীবনযাত্রার ও তার প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ইতিবৃত্ত। এ পরিবর্তন বাস্তব নিয়মের বশেই হয় এবং এতে বড় একটা ব্যক্তিবিশেষের স্থান নেই।[৩০৭] ইবনে খালদুনের এ উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সর্বপ্রথম 'আধুনিক যুক্তিবাদী শাস্ত্রে'র সূচনা করেন। সেজন্যই অগাস্ট কোঁতে (১৭৮৯-১৮৭৫খ্রি.) বলেছেন, 'বৈজ্ঞানিক তথ্যই জ্ঞানের ভিত্তি ও সত্য পৌঁছাবার একমাত্র নিশ্চিত পথ।

ইবনে খালদুনের ইতিহাস চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানুষ। তাঁর মতে, মানুষ প্রকৃতির পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশগত পার্থক্যের জন্য মানুষের স্বভাব-চরিত্র আচার-আচরণ এবং অবয়বের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। তিনি যাযাবর সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন, যাযাবরগণ সাধারণত খাঁটি দুগ্ধ মাংস আহার করে বলে তারা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। এমনকি, আধ্যাত্মিক গুণেও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয়।[৩০৮] তিনি ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির উপর আবহাওয়া ও ভৌগোলিক প্রভাবের কথা অনেকেই বলেননি। এছাড়া উন্নতি ও অবনতির মূল স্বাভাবিক শাশ্বত নীতি-নিয়মের অনুধাবনেও তিনি অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।[৩০৯]

---

৩০৭ আবদুল মওদুদ, মুসলিম মনীষা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২৩৬।

৩০৮ Sherwani, H.K. Studies in Muslim Political Thought and Administration (Lahore, Sh. Muhammad Ashraf Publication), p. 186.

309 P.K. Hitti, History of the Arabs (London: Macmillan Education Limited, 1962), p. 258.

খালদুনের ইতিহাস চর্চার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ কর। তিনি মনে করেন, কোনো মানুষ একা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না। মানুষ সম্মিলিতভাবে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারে। তাঁর মতে, এই ধরনের পরিপূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতা এ ধরনের সামাজিক বিবর্তনের সৃষ্টি করে। তাঁর মতে, মানুষ সবসময়ই অভাব পুরণের জন্য সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করে।

তিনি মনে করেন, এই ধরনের প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ যখন কোনো সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করে তখন তার উপর ভিত্তি করেই সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। এ ধরনের সভ্যতাকে তিনি 'উমরান'-এর অর্থ হলো– To Build up, To develop" অর্থাৎ তৈরি করা এবং প্রসারিত করা। এরপর তিনি বলেছেন মানুষের মনে সহযোগিতার ইচ্ছা জাগ্রত করার জন্য তাদের মধ্যে অনুপ্রেরণার প্রয়োজন আছে। এই অনুপ্রেরণাকে খালদুন নাম দিয়েছেন 'সংহতি' (Solidarity) এবং 'দলচেতনা' (Group consiousness)। ইবনে খালদুনের মতে, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হলো- অধিক লোকসংখ্যা। তিনি বলেছেন, 'বিকশিত সভ্যতার মধ্যেই কোনো রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা যায়। আরও বলেন, বংশানুক্রমিক শাসন চক্রাকারে আবর্তিত হয়। কোনো বংশ যখন অবক্ষয় বা পতনের যায় তখন সে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সমস্যার মোকাবিলা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেই শাসক বংশের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং নতুন বংশ ক্ষমতার অবধারিত নিয়মে একই চক্রে আবর্তিত হয় এবং পরিশেষে বিলীন হয়ে যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানব সমাজের এই চক্র (Cycle) সবসময়ই অব্যাহত থাকে। তিনি মনে করেন, এই Cycle বা চক্র হলো- উত্থান-পতনের এক চিরন্তন খেলা।

তাঁর মতে, বিভিন্ন রাজবংশের বা সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের এই ধারায় সভ্যতার চাকা ক্রমশ প্রগতির দিকে অগ্রসর হয়। এইভাবে দেখা যায় প্রগতির ধারণা বা Idiea of Progress খালদুনের ইতিহাসচর্চায় সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এইদিক থেকে বিচার করলে খালদুনকে হেগেল, মার্কস এবং ভিকোর পূর্বসূরী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ইতিহাস দর্শনের ইতিহাসে খালদুন এক অন্যন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

ইবনে খালদুন ইতিহাসের দুটি দিক উল্লেখ করেন, ১। জাহেরী রূপ, ২। বাতেনী রূপ। জাহেরী রূপটা মূলত অতীতের রাজা-বাদশা, যুদ্ধ ও রাষ্ট্রের কাল্পনিক ও গল্পাশ্রিত বিবরণী। এতে অতীতের রাজা-বাদশার স্তুতি ও বিপক্ষ দলের কুৎসা রটনা, রাজাদের বংশ পরস্পরা,

সংখ্যা ও সালের আধিক্য থাকে। এতে কোনো ঘটনার পেছনে তার সম্ভাব্য সামাজিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণগুলোর উল্লেখ থাকে না। ইতিহাসের জাহেরি রূপটা সাধারণ মানুষের বিনোদনের খোরাক। এই ইতিহাসগুলো রচিত হয় ক্ষমতাশীল শাসকের গৃহপালিত ইতিহাসবেত্তা দ্বারা। সব যুগের ক্ষমতাশীলরাই তাদের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য গৃহপালিত কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদের লালন-পালন করেন। আর এর মধ্য দিয়েই সাধারণ মানুষের মনকে উদ্দেশ্যহীন ধোঁয়াটে মরুতে রেখে তাদের কাধেই ভর করে রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করে জালেম শাসক!

অন্য দিকে বাতেনি রূপ হল– ইতিহাসের অন্তর্নিহিত দিক। এ দিকটা উল্লেখ করতে গিয়ে খালদুন ইতিহাসকে দর্শনের একটা মূল শাখা হিসেবে উল্লেখ করেন এবং জ্ঞান চর্চার ইতিহাসে 'ইতিহাসের দর্শন' নামক নতুন এক সাগরের সন্ধান দেন। ইবনে খালদুন ইতিহাসের বাতেনি রূপকে জাহেরি রূপ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক,গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত মনে করেন, এই ধারা আমাদের সমুখে অতীত ঘটনাবলির কারণ, বিকাশ ও বিনাশের স্বরূপ উন্মোচন করে। 'ইতিহাসের দর্শন' এর মূল কাজ হলো কোনো ঘটনা কিংবা বিষয়কে 'কিভাবে' (How) ও 'কেন' (Why) দ্বারা প্রশ্ন করে তার মূলকে জানা। এরিস্টটল তাঁর 'অধিবিদ্যা'(Metaphysics) নামক বইতে যেভাবে কোনো বিষয়ের পেছনে চারটি কারণ (উপাদানগত, আকারগত, কার্যকরী ও উদ্দেশ্যমূলক কারণ) উল্লেখ করেছেন 'ইতিহাসের দর্শন' অনেকটা তার কাছাকাছি।

ইতিহাসের মূল্য, ইতিহাসের প্রকারভেদ, সম্ভভ-অসম্ভবের মধ্য পার্থক্য নির্ণয়ে অজ্ঞতা, পক্ষপাতিত্ব, তথ্য ও উৎসের ত্রুটি এবং সামাজিক তত্ত্ব, মতবাদ ও সমাজের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুণ ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে পূর্বের ঐতিহাসিকগণের যে ত্রুটি, সেসব ইবনে খালদুনের ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি কতিপয় উদাহরণ উপস্থাপিত করেও তাঁর আলোচনাকে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এসব ভুলের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, ইতিহাস রচনায় বহুবিধ সূত্র, জ্ঞান ও বিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রয়োজন। ইতিহাসবিদকে অবশ্যই মননশীলতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হতে হবে। উক্ত গুণসমূহ ইতিহাস রচয়িতাকে সত্যের অনুসারী ও স্খলন-পতন-ত্রুটি হতে মুক্ত করতে পারে।[৩১০]

---

৩১০ ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ৬৩।

ইবনে খালদুন বলেন, অধিকাংশ পণ্ডিতই ইতিহাস-বিদ্যার নিগূঢ় রহস্য ভুলে যান। ফলে ইতিহাস বিতর্কিত রূপ নেয়। যাদের ইতিহাস জ্ঞানের ভিত্তি কোনোদিন মজবুত ছিল না, তাদের লোক ও তথাকথিত পণ্ডিতবর্গ ইতিহাস চর্চার কাজকে সহজ বলে মনে করে। ফলে আসলের সাথে নকল মিশে যায়। আর সত্য মিথ্যা দ্বারা কলুষিত হয়। আল্লাহ বলেন,

وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"সবকিছুরই পরিণতি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল।"[৩১১] পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, যুগের পরিবর্তনের সাথে আসে জাতীয় ও কৌম পরিবর্তন। এ সত্যের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন ইতিহাস বিদ্যার অন্যতম বিচ্যুতি। কেননা পৃথিবীর জাতিগুলির অবস্থা চিরকাল এক রূপ থাকে না। সময়ের পরিবর্তন অনুসারে তাদের বৈষম্য দেখা দেয়, অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। রাজবংশ, আঞ্চলিক এলাকা, বিশেষ নগর ও যুগকাল সম্বন্ধে এ একই নিয়ম প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন,

"এমনিভাবে আল্লাহ পূর্ববর্তীকালে তাঁর বান্দাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।"[৩১২] এ প্রসঙ্গে তিনি পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত যথার্থরূপে উদ্ধৃত করেছেন।

ইবনে খালদুনের মতে, যে ইতিহাস অতিরঞ্জিত বা অমলুক কাহিনীর বিবরণী, তার সাহায্যে প্রকৃত মত নিরূপণ সম্ভব নয়। সুতরাং ঐতিহাসিককে অবশ্যই নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত মন নিয়ে অতীত ঘটনাবলি, রীতি-নীতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রকৃতি বিচার বিশ্লেষণ করে তা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। অন্যথায় রাষ্ট্রতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্বের মূল সূত্র নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। এন.স্মিডের ভাষায়: "আল-মুকাদ্দিমাতে ইবনে খালদুন ইতিহাস পর্যালোচনার নীতি, ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর মতামত ও ধারণা, ইতিহাসের পরিধি, ইতিহাসের বিষয়বস্তু, ইতিহাসের আনুষঙ্গিক বিষয়সহ আইন-কানুনের প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের সামাজিক অগ্রগতি, প্রাকৃতিক কারণের উপর মানুষের নির্ভরতা, পরিবেশের প্রভাব এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উপর এসবের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও তিনি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। সেজন্য এখনও পর্যন্ত তাঁর গ্রন্থের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রয়েছে।[৩১৩]

---

[৩১১] আল-কুরআন, সূরা লুকমান, আয়াত: ২২।

[৩১২] আল-কুরআন, সূরা মুমিনুন, আয়াত: ৮৫।

[৩১৩] N. Smid, Ibn Khaldun, Historian, Socialist and Philosopher (New York: 1930), p. 15-16.

ইতিহাস-দর্শন সম্পর্কে ইবনে খালদুনের বৈজ্ঞানিক মতবাদ আধুনিক বিদগ্ধ সমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। ভন ক্রেমার ইবনে খালদুনকে "Culture Historica" বলে আখ্যায়িত করেছেন।"

ইবনে খালদুনের ইতিহাস-দর্শন প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক নোথালিয়েল স্মিড বলেন, ইবনে খালদুন নিজেকে প্রাণীর উৎপত্তি ও ইতিহাসের প্রকৃতিগত তত্ত্বের উদ্ভাবক বলে মনে করতেন। অবশ্য মুসলিম বিশ্বের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। কেননা তাঁর পূর্বে মুসলিম বিশ্বে কেউ এতদূর অগ্রসর হননি। যদিও প্রাচীনকালের অবস্থা সম্বন্ধে ইদানিং কালে আমাদের জ্ঞান তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাপি আজ পর্যন্ত আমরা যা জানি, তাতে বলা যায়, ইতিহাসের এই বিশেষ দিকটা নিয়ে ইবনে খালদুনই প্রথম কলম ধরেন এবং ইতিহাসকে একটা বিশেষ বিজ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করে এর আওতাভুক্ত সকল বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা চালান। তাঁর আগে মানব জীবনের প্রত্যেকটি দিককে এভাবে স্পর্শ করে বা সামাজিক অবস্থা সমূহের এমন বিশদ বর্ণনা দিয়ে আর কখনও ইতিহাস রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নাই। এটাই ইবনে খালদুনের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। যদি ইতিহাসের পরিধি এভাবে পরিব্যাপ্ত করাটাকে যুক্তি ও বিধিসঙ্গত বলে ধরা হয় এবং যদি ইতিহাসকে একটি বিজ্ঞান বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে স্বীকার করতেই হবে, তিউনিসিয়াবাসী এই মহান ব্যক্তি কারও কাছ থেকে কোন অনুপ্রেরণা না নিয়েই, কারও প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়েই আপন চিন্তাধারা প্রকাশ করে গেছেন। তাই তাঁকে এক্ষেত্রে উদ্ভাবকের মর্যাদা দান করা যুক্তিসঙ্গত।

বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারের উত্থান-পতনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইবনে খালদুন উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই উত্থান-পতনের বিষয়কে শুধুমাত্র উদ্দেশ্য ও উচ্চাবিলাষ, লক্ষ্য ও প্রয়োজন, ব্যক্তির ইচ্ছার দৃঢ়তা ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতার দ্বারা যাচাই করলে চলবে না। কোন গোত্রের বা দলের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের আলোকে এই উত্থান-পতন যাচাই করতে হবে। এ পর্যায়েই তিনি সামাজিক-অবস্থা সৃষ্টির উপকরণ ও কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। পরিশেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নৈতিক ও গোত্রীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাবই এর মূলে কার্যকর। একইভাবে তিনি আরও জানতে পারেন যে, ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া, পানি, মাটি, অবস্থান ও খাদ্য থেকেও এসব গোত্রগত বৈশিষ্ট্যে আবিষ্কার করা সম্ভব। তাই রাজনৈতিক উত্তরণকে পূর্ণমাত্রার উপলব্ধির জন্য সমাজ জীবনের প্রতিটি দিক এবং ভৌগলিক পরিবেশ পর্যালোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এভাবে ইতিহাসের লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু ব্যাপ্তি সাধন করে এবং ঐতিহাসিকের বর্ধিত দায়িত্ব পালন করে ইবনে খালদুন ইতিহাসকে মানব জীবনের বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করে গেছেন। এই বিজ্ঞানই হচ্ছে সমাজতত্ত্ব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের অর্থনৈতিক দর্শন

'অর্থনৈতিক চিন্তাধারা' বলতে যা বুঝায় তা হলো দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য, উৎপাদন ও বণ্টন, বিনিময় ও ভোগ, দাম ও অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের চিন্তাধারা। এর আওতায় আসে অর্থনৈতিক বিষয়াদির বিবরণ, অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহের ব্যাখ্যা ও সুপারিশ এবং কোন সুনির্দিষ্ট নীতির সম্ভাব্য ফলাফল নিরূপণ ও বিশ্লেষণ। সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে ইবনে খালদুনের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী হলেও ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কেও তিনি অগাধ জ্ঞান রাখতেন।

ইবনে খালদুন ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত আল মুকাদ্দিমা ইসলামী অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতে তিনি শ্রম বিভাজন, মুদ্রা ও দাম, উৎপাদন ও বণ্টন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চক্র, দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য, জনসংখ্যা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এবং করের সামষ্টিক অর্থনীতি ও সরকারি ব্যয় এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর সময়কালে যেসব বিষয় তাঁকে নাড়া দেয় তা হলো রাজবংশের উত্থান ও পতন এবং দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য। এগুলোতে তিনি বেশ কিছু প্যাটার্ন চিহ্নিত করেন। কোন কোন দেশ বেশি ধনী আবার কোন কোন দেশ বেশ গরিব। তাঁর সুবিন্যস্ত গ্রন্থ 'কিতাব আল-ইবার'-এ এসবের কারণ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন।

ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমার পঞ্চম অধ্যায়ে জীবিকা উপার্জনের উপায় এবং সম্পদ পুঞ্জিভূত করার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বাণিজ্য, সরবরাহ, পেশার শাখা-প্রশাখা ও অবস্থাদি সাধারণভাবে আলোচনা করেছেন। কৃষি, ইমারত নির্মাণ, বস্ত্র বুনন, ধাত্রী ও চিকিৎসা এক কথায় একেকটি প্রধান পেশার জন্য বিশেষ আলোচনা করেছেন।[৩১৪] ইবনে খালদুন জীবিকা সম্পর্কে বলেন, "জীবিকার অর্থ হল- সম্পদ অর্জনের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা। এটা্ জীবন শব্দজাত। কারণ জীবন তথা মানুষের অস্তিত্ব এটি ছাড়া সম্ভব নয় বলে একেই জীবনের আধার স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে।"[৩১৫]

---

[৩১৪] আখ্তার-উল্-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

[৩১৫] ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী, ৪র্থ সংস্করণ (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০১৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৪।

ইবনে খালদুন মজুদদারি সম্পর্কে বলেন, "নগরীর দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ লোকদের কাছে এটি সুপরিচিত যে, দুর্মূল্যের জন্য শস্যাদি মজুদ করে রাখা অশুভ কাজ। কারণ তার দ্বারা লব্ধ উপকার পরিণামে ক্ষতি ও সর্বনাম ডেনে আনে।"[৩১৬]

ইবনে খালদুন শিল্পকর্মের জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, "জেনে রাখুন, শিল্প একেকটি অভ্যাস, যা গড়ে তুলতে দৈহিক ও মানসিক শ্রমের প্রয়োজন। শ্রমের দিক থেকে এটা দৈহিকভাবে অনুভবযোগ্য। বস্তুত যা দৈহিক শ্রমের দ্বারা অনুভবযোগ্য তা সাহচর্যের দ্বারা অনুসৃত হলে বেশি সম্পূর্ণ ও ব্যাপক হয়ে ওঠে। কেননা, দৈহিক শ্রমের ক্ষেত্রে সাহচর্যই বেশি উপকারী। ফলত শিল্প একটি অভ্যাস, যা বিশেষভাবে বারংবার অনুশীলনের দ্বারা স্থায়ী হয় এবং তা বাস্তবরূপ পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ অনুকরণ মূল্যের অনুপাতেই সমৃদ্ধ হয়। সুতরাং এর দ্বারা যে অভ্যাগ গড়ে ওঠে, তা শ্রুতির দ্বারা লব্ধ অভ্যাস অপেক্ষা পূর্ণতর ও স্থিরতর হয়ে থাকে। শিক্ষার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা ও শিক্ষকের দক্ষতা অনুসারেই শিল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও অভ্যাস গড়ে ওঠে।"[৩১৭]

চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বলেন, "এ শিল্পটি শহর নগরের জীবনের জন্য মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত; কারণ এর উপযোগিতার দিক এভাবেই সর্বত্র পরিচিত। বস্তুত এর ফলশ্রুতি হল স্বাস্থ্যবানদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করা এবং রুগ্নদের রোগ ঔষধাদি প্রয়োগের মাধ্যমে দূরীভূত করা; যাতে সকলেই নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতে পারে।"[৩১৮]

শ্রম বিভাজন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সরকারি অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে ইবনে খালদুন বলেন, 'শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে তিনি বলেন, একজন ব্যক্তিকে গমের মতো খাদ্য শস্য উৎপাদন করার জন্য কমপক্ষে ৬ অথবা ১০ রকমের সেবা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। সে তার নিজ প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদন করে। ফলে উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়, যা দিয়ে অন্য দ্রব্য বিনিময় করা হয়। এভাবেই প্রাচুর্য আসে।'

এ্যাডাম স্মিথেরও চার শত বছর পূর্বে আল-মুকাদ্দামায় তিনি শ্রম বিভাজন এবং এর ইতিবাচক ফল সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা সকরেছেন। একদল মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মিলিত শক্তির ভিত্তিতে যা উৎপন্ন করে তা এককভাবে একজনের উৎপাদনের চেয়ে ঢের

---

[৩১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

[৩১৭] ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, ষোড়শ পরিচ্ছেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

[৩১৮] ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭০।

বেশি। ফলে প্রয়োজন পূরণের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তা বিক্রি করা সম্ভব। তিনি বলেন, শ্রমবিভাজনের ফলেই উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব হয়। শ্রমের বিশেষীকরণের মাধ্যমে উৎপাদনের সামাজিক সংগঠনের পক্ষে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, একমাত্র বিশেষীকরণের ফলে উঁচু হারে উৎপাদন সম্ভব যা পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের জন্যে অপরিহার্য। ইবনে খালদুন উৎপাদনের সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে মানবীয় শ্রমের সবিশেষ গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন। নানা ধরনের পেশা ও সেসবের সামাজিক উপযোগিতার কথাও তিনি আলোচনা করেছেন। দারিদ্র্যের ভিত্তি এবং তার কারণ সম্বন্ধে তাঁর আলোচনার জন্যে ইবনে আল-সাবিল তাঁকে প্রুঁধো, মার্ক্স ও এঙ্গেলসের পূর্বসূরি হিসেবে গণ্য করেন।[৩১৯]

ইবনে খালদুন বিশ্লেষণ করে দেখাতে সক্ষম হন যে সব দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত সেসব দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় ধনী। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনসংখ্যা বেশি হলে, শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণ সহজ হয় এবং এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। এরূপ উন্নয়ন বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে এবং শিল্পের বৈচিত্র্য আনয়ন করে।

তিনি কর ও সরকারি ব্যয় সম্পর্কে সার্বিক মতামত রাখেন এবং বলেন, যতদূর সম্ভব জনগণের করের পরিমাণ সর্ব নিম্ন রাখলে তা জনসংখ্যা ও সভ্যতায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যেহেতু তারা সভ্যতার সুবিধাদি ভোগ করার সুযোগ পায়। সেহেতু তারা এতে উৎসাহিত বোধ করে। কম কর প্রাচুর্য আনয়নে ও করের ভিত্তি সম্প্রসারণে সহায়তা করে। এতে সরকারের আয় বৃদ্ধি ঘটে। করের হার কম রাখার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন, করের উঁচু হার প্রকৃত পক্ষে সরকারের আয় কমিয়ে দেয়। তিনি সুস্পষ্টভাবে করের হার হ্রাস ও সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর গভীর বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্যে পাশ্চাত্যের অনেক গবেষক তাঁকে আধুনিক অর্থনীতির অন্যতম পুরোধা হিসেবে বিবেচনা করেন।

মুদ্রার মূল্য সম্বন্ধেও ইবনে খালদূনের মূল্যায়ন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, সোনা ও রূপা যেহেতু সবদেশে সকলেই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে সেহেতু মুদ্রার মান হিসেবে এই দুই ধাতু ব্যবহার করা সমীচীন। এর দ্বারা মুদ্রার মূল্যও সংরক্ষিত হয়। যেহেতু মুদ্রা হিসেবে

---

[৩১৯] শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ (রাজশাহী, ২০০৫ খ্রি.), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৪০-২৫০।

ব্যবহারের সময়ে মুদ্রার ওজন দেখা সম্ভব নয় সেহেতু টাকশালে মুদ্রার তৈরির সময়ে সোনা ও রূপার ধাতুগত মান ও প্রতিটি মুদ্রার ওজর যেন একই রকম হয় তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। কারণ মুদ্রা শাসক কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টি বহন করে যে, এর মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা বা রূপা রয়েছে। ইবনে খালদুন বলেন, সকল দ্রব্যই বাজারে নানা ধরনের উঠা-নামার শিকার, কিন্তু মুদ্রা হবে তার ব্যতিক্রম। এজন্যে টাকশালকে তিনি সরাসরি খলিফার নিয়ন্ত্রণাধীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানতুল্য গণ করেছেন।

তাঁর রচনায় শ্রমের মূল্যতত্ত্বের সন্ধান মেলে। কারও কারও মতে, তাঁর শ্রমের মূল্যতত্ত্বে শ্রমিকের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ভূমিকা রয়েছে যে জন্যে তাঁকে ম্যাক্রের পূর্বসূরি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। সভেৎলানার মতে, তিনিই অতীতকালের প্রথম অর্থনীতিবিদ যিনি মূল্যের রহস্য ভেদে সক্ষম হন। তিনি আবিষ্কার করেন মূল্যের ভিত্তি হচ্ছে শ্রম। তাঁর মতে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের মধ্যে তিনটি উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকে: (১) বেতন, (২) মুনাফা এবং (৩) কর। বেতন উৎপাদনকারী প্রাপ্য, মুনাফা ব্যবসায়ীর প্রাপ্য এবং কর সরকারের প্রাপ্য যা দিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন ও সরকারি সেবাসমূহের ব্যয় নির্বাহ হবে। তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পৃক্ত।

পাশ্চাত্যের সমাজ বিজ্ঞানী বলেন: "Before Durkheim, Ibn Khaldun hinted that division of labour reinforces Social Solidarity. Like Marx, he understood the enormous influence exerted by economic factors on political and social life, going as far as to say." æThe difference between peoples arises out of the differences in their occupations."[৩২০]

অর্থাৎ, শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে যে সমাজিক সংহতি শক্তিশালী হয় সে-ধারণা সম্পর্কে ডুর্খিমের অগেই খালদুন ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। আসলে খালদুন কর্তৃক প্রবর্তিত 'আসাবিয়া' প্রত্যয়টি ধার করে ডুর্খিম তাঁর উক্ত গ্রন্থে এর আরও বিকাশ সাধন করেছেন। এছাড়া, মার্কসের মতো খালদুন রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অর্থনৈতিক উপাদানের প্রবল ভূমিকার কথা পূর্বেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এ বিষয়ে ইবনে খালদুন একটি উদাহরণ

---

[৩২০] Charles Issawi, An Arab Philosophy of History (London: Gohn Muray, 1969), p. 17.

দিয়ে বলেছেন, "বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যকার বৈষম্য পেশাগত পার্থক্য থেকে উদ্ভূত।" উল্লেখ্য, শেষোক্ত ক্ষেত্রে খালদুন কেবল কার্ল মার্কসের অগ্রপথিক ছিলেন না, মনে হয় ম্যাক্স ওয়েবার (১৮৬৪-১৯২০) ও তাঁর এ ধারণা গ্রহণ করে 'সামাজিক স্তরবিন্যাস' (Social stratification) প্রত্যয়টিকে সমাজবিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৩২১]

ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেছেন। ইবনে খালদুনের সভ্যতার চক্রতত্ত্বকে অর্থনীতিবিদ জে.আ.হিকসের বাণিজ্য চক্রতত্ত্বের সাথে তুলনা করেছেন স্পেঙ্গলার। তবে তাঁর তত্ত্বটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরের সঙ্গে তুলনা করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।[৩২২]

অর্থনৈতিক চিন্তার আধুনিক ইতিহাসবিদদের মধ্যে শ্যুমপিটারই প্রথম ইবনে খালদুনের কথা উল্লেখ করেন। ব্যারি গর্ডন তার Economic Analysis Before Adam Smith-Hesiod to Lessius বইয়ে ইবনে খালদুনের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের গুরুত্বের কথা খুব জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনার জন্যে জে. স্পেঙ্গলার, ফ্রাঞ্জ রোজেনথাল, টি.বি. আরভিৎ, জে.ডি. বৌলকিয়া প্রমুখ ইউরোপিয় গবেষকরা তাঁকে আধুনিক অর্থনীতির অন্যতম পুরোধা হিসেবে বিবেচনা করেন। বৌলকিয়া বলেন[৩২৩]- "Ibn Khaldun discovered a great number of fundamental ecomomic notions a few centuries before their officela birth. He discovered the virtue and necessity of a division of labour before (Adam) Smith and the Principle of labour value before (David) Ricardo. He elaborated a theory of population before Malthus and insisted on the role of the State in the economy before Keynes. .... but much more than that, Ibn Khaldun used these concepts to build a coherent dynamic system in which the economic machanism inexorably lead economic activity to long-term

---

৩২১ রংগলাল সেন, ইবনে খালদুন: সমাজবিজ্ঞানের অনানুষ্ঠানিক জনক, পৃ. ৩৮-৪০।

৩২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

৩২৩ Jean David Boulakia, Ibn Khaldun: A Furteenth Century Economist, Journal of Political Economy, Vol. 79 No. 5, September-October 1971, pp.1105-1114.

fluctuations. Without tools, without preexisting concepts he elaborated a genial economic explanation of the world. ..... His name should figure among the fathers of economic science”.

অধ্যাপক রংগলাল সেন বলেন, ইবনে খালদুন হচ্ছে মধ্যযুগের প্রথম চিন্তাবিদ, যিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উপাদানের গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ যুগপৎ চলে। Rosenthal এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন, “The wealth of the ruler and his entourage is greatest in the middle stage of the dynasty. This leads inevitable to increased taxation, a luxurious life at court, the decline of the former supporters of the ruler and finally to the ruin of the dynasty and the state.”[৩২৪] অর্থাৎ, “শাসক ও তার অনুচরবর্গের সম্পদের পরিমাণ রাজ্য শাসনকালের মধ্যবর্তী পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি হয়। এটি অনিবার্যভাবে কর বৃদ্ধি করে, রাজ দরবারের জীবনযাত্রা বিলাসবহুল হয়, শাসকের পূর্বতন সমর্থকদের অধঃপতন ঘটে এবং এর চূড়ান্ত পরিণতিতে রাজবংশ ও রাষ্ট্র ধ্বংস হয়।” তাঁর মতে, যুক্তিনির্ভর রাজনীতির রয়েছে দুটো রূপ। প্রথমটিতে জনগণের কল্যাণ ও সুলতানের সুশাসন যুগপৎ নিশ্চিত থাকে। দ্বিতীয়টিতে শাসকের সুবিধা এবং শক্তি ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রাধান্য পাওয়ায় প্রজাবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত, রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পর্কে ইবনে খালদুনের ধ্যান-ধারণা উল্লেখযোগ্যভাবে উদারনৈতিক। তিনি একদিকে ছিলেন স্বাধীনতাপ্রেমী, আবার অন্যদিকে সমাজ ও রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পক্ষপাতী। সেজন্য তিনি যাযাবরদের নৈরাজ্যমূলক ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ অপছন্দ করতেন। তাঁর বিবেচনায়, রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে নাগকিদের জীবনে নিরাপত্তা ও শান্তি বিধান, এবং বিশেষ করে, আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা সংরক্ষণ। আর এসবের ব্যবস্থা করতে পারলেই কেবল রাষ্ট্র তার জনগণের কাছ থেকে সহনীয় মাত্রায় কর আদায় করার অধিকার রাখে। খালদুন এটিও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন সে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রের কোন প্রকার অযথা হস্তক্ষেপ অত্যন্ত গর্হিত কাজ। সার্বভৌমত্ব ও সরকার সম্পর্কে খালদুনের

---

[৩২৪] Rosenthal, ibid, p. 91; অধ্যাপক রংগলাল সেন, ইবনে খালদুন, সমাজবিজ্ঞানের অনানুষ্ঠানিক জনক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।

ধারণা তাঁর মুক্তচিন্তারই সুস্পষ্ট পরিচায়ক, যা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইবনে খালদুনের সমাজ দর্শনে সমাজ পরিবর্তনের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাতে অর্থনৈতিক উপাদানের গুরুত্বের বিষয়ে জ্যাঁ ডেভিস সি. বোউলাকিয়া (Jean David C. Boulakia) বলেন: "ইবনে খালদুন তাঁর লেখায় দার্শনিক, সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলিকে অন্তর্ভুক্ত করেন।"[৩২৫]

অনেকের মতে চতুর্দশ শতকে ইবনে খালদুন চিরায়ত অর্থনীতির যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাই আধুনিক অর্থনীতিবিদরা পুনরায় তাঁদের সময়ে আবিষ্কার করেছেন। ইবনে খালদুন চাহিদা-সরবরাহ, উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদনে সামাজিক সংগঠন, মূল্য, মুদ্রা এমনকি বণ্টন ব্যবস্থার যে বিশদ বর্ণনা 'মুকাদ্দিমা'য় প্রদান করেছেন তা নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের অর্থনীতিবিদদের তত্ত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[৩২৬]

বোউলাকিয়া বলেন, "ইবনে খালদুন ব্যাপক সংখ্যক অর্থনীতির মৌলিক ধারণা এদের প্রাতিষ্ঠানিক জন্মের আগেই আবিষ্কার করেন। তিনি স্মিথের পূর্বেই শ্রম বিভাজনের গুণাবলী ও প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করেন এবং রিকার্ডোর পূর্বেই শ্রম মূল্যতত্ত্ব আবিষ্কার করেন।"[৩২৭]

প্রতিটি মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে। এই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্যই "তাকে আবার অর্থনৈতিক প্রাণী হিসেবে অভিহিত করা যায়, যার উদ্দেশ্য হলো- উৎপাদন। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে তোলে। মানুষের এই উৎপাদন সম্পর্ক, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও বণ্টন ব্যবস্থা- এসব বিষয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হবে- এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। এ সম্পর্কিত আলোচনায় ইবনে খালদুনের এক উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যাবলি সূচারুরূপে সম্পাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে এবং এর নিয়ন্ত্রণ যত কম হয় ততই ভাল বলে ইবনে খালদুন মনে করেন। উৎপাদন ও বিপণনের প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্য রাষ্ট্র কাজ করবে এবং এর বিনিময়ে রাষ্ট্র যে ট্যাক্স আদায় করবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেওয়ার জন্য ইবনে খালদুন

---

[৩২৫] Jean David C. Boulakia, Ibn Khaldun: Last Greek and the First Annaliste Historian, Int. J. Middle East Stud, No. 38, pp. 1106.

[৩২৬] মোঃ নূরুজ্জামান, চিরায়ত সমাজচিন্তা (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩২।

[৩২৭] Jean David C. Boulakia, ibid, pp. 1117.

উপদেশ দেন। তাঁর এসব বক্তব্য সমকালীন অর্থনীতিবিদদের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে দাবি করা যায়।[৩২৮]

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইবনে খালদুনের সমাজদর্শনের মূল প্রত্যয় 'আসাবিয়া'র ভূমিকা রয়েছে। সমাজ সভ্যতার বিকাশে মূল শক্তি হিসেবে আসাবিয়া কাজ করে। কোনো গোত্র বা রাজবংশ এই শক্তিকে বলীয়ান হয়েই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, নিজেদেরকে অন্যান্য গোত্র অথবা বংশ থেকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। আসাবিয়ার এই শক্তি কোনো সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে বলে সমকালীন উন্নয়নবিদরা দাবি করেন। সমকালীন উন্নয়নবিদরা মনে করেন প্রাকৃতিক সম্পদ, দক্ষ শ্রমশক্তি যেমন উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তেমনই এর পেছনে সংশ্লিষ্ট জনগণের প্রত্যাশা, বাধা অতিক্রম করার মনোবল, নেতৃত্বের প্রতি দৃঢ় আস্থা– এই বিষয়াবলির গুরুত্বও সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হবে। দক্ষ নেতৃত্বের অধীনে আসাাবিয়ার বলে বলীয়ান হয়ে কোনো গোত্র যেমন তার সকল সদস্যের নিরাপত্তা প্রদান করতে সক্ষম, অন্য গোত্র থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে অথবা কোনো রাজবংশ বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে তেমনিভাবেই দক্ষ নেতৃত্ব ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে কাজ করলে কোনো জাতি তার আর্থিক অবস্থারও আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। তারা দাবি করেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও দক্ষ নেতৃত্ব ও জনগণের দৃঢ় মনোবলের উপর নির্ভর করে কোনো অঞ্চলের জনগণ নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম হয়েছে।[৩২৯] ডিয়েটের ভাইস (Dieter Weiss) বলেন, "বর্তমানে আসাবিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োগ করা যেতে পারে: উন্নয়নের প্রতি নেতাদের অঙ্গীকার এবং জনগণের প্রেষণার সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। গত চার দশকের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সফলতা ও ব্যর্থতার পিছনে এই দুটি বিষয় গতানুগতিক অর্থনেতিক উপাদান যেমন পুঁজি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রম শক্তির চেয়ে বেশি নির্ধারক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। [৩৩০] মানুষ একা তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ বা উৎপাদন করতে সক্ষম নয়। সংগ্রহ বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সে সমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তির সাথে একত্রিত হয়।

---

৩২৮ মোঃ নূরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩।

৩২৯ Ibrahim Oweiss, æIbn Khaldun, The Father of Economics," *Georgetown University*, <http://www9.georgetown.edu/faculty/imo3/ibn.htm> (accessed 13 August 2013).

৩৩০ Dieter Weiss, æIbn Khaldun on Economic Transformation", Int. J. Middle East Stud. 27., 1995, p. 30.

এই একত্রিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সে উৎপাদন বা সংগ্রহ করার কাজকে সহজ করে তোলে এবং নিজেদের চাহিদা পূরণের মধ্য দিয়ে সহজ জীবন যাপন করে। তারা একে অন্যের চাহিদাকে বুঝতে পারে এবং তা পূরণে সহায়তা করে। এর মধ্য দিয়ে এক ধরনের বন্ধন তৈরি হয়। এই বন্ধনের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাত্রা। পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক যদি আসাবিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তবে এক্ষেত্রে সফলতার মাত্রাও বেশি হবে বলে আশা করা যায়।

অধ্যাপক মো: নূরুজ্জামান বলেন, "ইবনে খালদুনের আসাবিয়াতত্ত্বে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার মাধ্যমে গোত্রের উন্নয়নের যে দিক-নির্দেশনা রয়েছে তার অনুরূপ নির্দেশনা পাওয়া যায় সমকালীন উন্নয়নবিদদের নিকট থেকে। তাঁরা দাবি করেন, উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত হল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক সংহতির দৃঢ়তা। আর এ দুটিই গভীর আসাবিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পাওয়া যায়। আসাবিয়ার বলিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজমান থাকে এবং তাদের সামাজিক ঐক্য দৃঢ়তর হয়, ফলে কোনো কঠিন বাধাও তারা সহজে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।[৩৩১]

ইবনে খালদুনের অবদান সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারাকাত বলেন, "চতুর্দশ শতকে 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে ইবনে খালদুন অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শন সম্পর্কে যেসব বক্তব্য ও যুক্তির অবতারণা করেছেন, সেগুলো অ্যাডাম স্মিথের 'দ্য ওয়েলথ অব নেশনস' প্রকাশের ৩৫০ বছর আগে। অথচ তাকে খুব কম মানুষই জানেন এবং অর্থনীতিশাস্ত্রে তার মৌলিক অবদানের খুব বেশি স্বীকৃতি নেই। এসবই 'মননের দারিদ্র্য'।"[৩৩২]

[৩৩১] মোঃ নূরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

[৩৩২] অধ্যাপক আবুল বারাকাত, অর্থনীতি শাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য; বণিক বার্তা, শনিবার, জানুয়ারি ০৬, ২০১৮।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুনের দার্শনিক মতবাদ

ইবনে খালদুন তাঁর রচিত মুকাদ্দিমা গ্রন্থে ইসলামী জ্ঞানের সার্বিক কাঠামো সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বর্ণনা উপস্থিত করেন। দার্শনিক বিজ্ঞানসমূহের স্বরূপ ও পরিসর সম্পর্কে তিনি যে বিশদ পর্যালোচনা করেন তাতে চৌদ্দ শতকের দার্শনিক জ্ঞান-পরিস্থিতির এক সুস্পষ্ট আলেখ্য পাওয়া যায়। দার্শনিক ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান গুরু ছিলেন আল-গাযালী (৪৫১-৫০৫ হি.১০৫৫-১১১১খ্রি.)[৩৩৩]। দার্শনিক বিজ্ঞান সমূহের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ইবনে খালদুন গতানুগতিক (নকলি) ও দার্শনিক বিজ্ঞানসমূহের শ্রেণিন্যাস করেন এবং সেইসঙ্গে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেন সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রবাহমান দার্শনিক প্রবাহের, দর্শনের উত্থান ও বিকাশের।[৩৩৪]ইবনে খালদুনের 'মুকাদ্দিমা'য় কয়েকটি বিক্ষিপ্ত খণ্ডে রচিত 'যুক্তিবিজ্ঞান' 'দ্বান্দ্বিকবাদ', 'দর্শনের বিপদ ও অনুপত্তিসমূহ' 'অধিবিদ্যা' প্রভৃতি শিরোনাম থেকে তাঁর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

যুক্তিবিদ্যা

জ্ঞানের জগতে ইবনে রুশদ[৩৩৫] যুক্তিবিদ্যাকে অতি উচ্চস্তরে স্থান দিয়েছেন। সক্রেটিস ও প্লেটো অ্যারিস্টোটলের যুক্তিবিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ইবনে খালদুন যুক্তিবিদ্যার ভূমিকাকে অত্যন্ত গৌণ মনে করেন। তিনি যুক্তিবিজ্ঞানকে কেবল সহায়ক বিদ্যা বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে,

---

৩৩৩ আল-গাাযালীর পূর্ণ নাম: আবদুল হামিদ মুহাম্মদ ইবনে আল-গাযালী। তিনি ১০58 সালে খোরাসানের তুস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলিম দর্শন, ফিকাহ, ইলমুল কালাম (ধর্মতত্ত্ব) বিষয়ে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বাগদাদে তৎকালীন বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় বাগদাদের নেজামিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক ও রেকটর ছিলেন। ইমাম গাজ্জালি ইসলামকে মধ্যযুগীয় অনৈসলামিক দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাব থেকে মুক্ত করে পবিত্র কোরআন-হাদিসের শিক্ষায় মুসলমানদের ফিরিয়ে আনেন। তাই তার এই অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য তাকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বা 'ইসলামের রক্ষক' বলা হয়ে থাকে। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-এহইয়া উলুমুদ্দিন, তুহফাতুল ফালাসিফা, কিমিয়ায়ে সায়াদাত, দালায়েলুল আখবার ইত্যাদি। অবশেষে ১১১১ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

৩৩৪ ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন (ঢাকা: মাওলানা ব্রাদার্স, ২০১৬ খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৭২।

৩৩৫ আবূ ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে রুশদ। কুরআন বিষয়ক শাস্ত্রসমূহে বিশেষজ্ঞ এবং অন্যতম মুসলিম পদার্থবিদ, চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ, জীববিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ, ধর্মতাত্ত্বিক ও শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। পাশ্চাত্য জগতে তিনি Averroes নামে পরিচিত। তিনি ১১৬০-৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেভিল এবং ১১৭০-১১৭২খ্রি. পর্যন্ত কর্ডোভায় কাজীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৫২০হি./১১২৬ খ্রি. সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৯৫/১১৯৮ খ্রি. সনে ইন্তিকাল করেন। (ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ৪, পৃ. ১৪৬।)

যুক্তিবিদ্যা পাঠের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অযথা সময় ব্যয় করে। তবে, প্রায়শই এটা একজনকে চতুর ও বিচারবুদ্ধিহীন পণ্ডিতে পরিণত করে। যুক্তিবিদ্যা একজনকে সত্যের অকৃত্রিম অনুসন্ধানকারী করে তোলে না। এর কার্যাবলি মূলত নঞর্থক; যা সত্য তাকে নয় বরং যা সত্য নয় তাকে জানার জন্য যুক্তিবিদ্যা আমাদেরকে সদর্থক জ্ঞান দান করে না। সদর্থক জ্ঞানের জন্য অমাদেরকে স্বীয় পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা এবং অপরের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হয়েও একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি বা বৈজ্ঞানিক মেধাসম্পন্ন প্রতিভাধারী স্বাভাবিকভাবেই যৌক্তিক উপায়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। অন্যদিকে, যুক্তি বিদ্যায় পণ্ডিত হয়েও একজন তার প্রকৃতি চিন্তায় বহু যৌক্তিক অনুপপত্তি ঘটাতে পারে। পেশাদারি যুক্তিবিদও এই দোষ থেকে মুক্ত নয়। আধুনিক পাঠকদের এখানেই সহজেই জে.এস. মিলের দৃষ্টান্তকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে।[৩৩৬]

দ্বান্দ্বিকবাদ

দ্বন্দ্বমূলক জ্ঞান হচ্ছে প্রজ্ঞা ও অলংকারশাস্ত্রের ব্যবহার যা ধর্মবিশ্বাসের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এটা এক ধরনের পাণ্ডিত্য দর্শনের ন্যায় (scholastic philosophy)। ইবনে খালদুন মনে করেন, দ্বন্দ্বমূলক জ্ঞানও যুক্তিবিদ্যার ন্যায় একটি সহায়ক বিজ্ঞান মাত্র। এটাও নঞর্থক ভূমিকা পালন করে থাকে।[৩৩৭] মুসলিম চিন্তার বিকাশে ইবনে খালদুন উল্লেখ করেন, “ইলম-আল-কালাম[৩৩৮] নাস্তিক ও অমুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আত্মরক্ষার অস্ত্র বা হাতিয়ার স্বরূপ।”[৩৩৯] ইবনে খালদুন ‘প্রতিরক্ষার অস্ত্র’ হিসেবে এর কার্যকারিতা অবশ্যই স্বীকার করেন। তবে তিনি বলেন যে, “ধর্ম মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করতে দ্বন্দ্বমূলক মতবাদ সার্থক হলেও, ধর্মের নিজস্ব মতবাদগুলোকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই মতবাদ সিদ্ধান্তমূলক কোনো যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে না। দ্বন্দ্বমূলক মতবাদ দ্বারা আমরা একজন নাস্তিককে স্তব্ধ করে দিতে পারি। কিন্তু তাকে ধর্মমতের সমর্থনে আনতে পারি না।

---

৩৩৬ আব্দুল হালিম, মুসলিম দর্শন চেতনা ও প্রবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩-২৯৪।

৩৩৭ প্রাগুক্ত।

৩৩৮ ‘ইলমুল কালাম’ ইসলামের দ্বীনী জ্ঞান, যার বিষয়বস্তু হল- দ্বীনের আক্বিদাসমূহ যুক্তি ও দলীল প্রমাণ দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিতকরণ এবং আক্বিদা সংক্রান্ত বিরোধী মতবাদের খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান। (দ্র.ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯৮৮, খ. ৫, পৃ. ১২)

৩৩৯ ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, ইংরেজি অনুবাদ, খ. ৩, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

দ্বন্দ্বমূলক মতবাদ ধর্মের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে বলে ভাবা উচিত নয়, কারণ ধর্মের সত্য যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে।"[৩৪০] এছাড়াও, দ্বন্দ্বমূলক মতবাদ প্রায়শই অলংকারশাস্ত্রের রূপ ধারণ করে। একজন দ্বান্দ্বিক প্রায়শই শব্দের খেলায় ও সূক্ষ্মতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেন এবং সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। তিনি সাধারণত শব্দ বা বাগধারার উপর তাঁর পাণ্ডিত্য ও কৌশল প্রদর্শনে ব্যস্ত হয়ে থাকেন এবং এইভাবে সত্য অনুসন্ধানের পথ থেকে দূরে সড়ে পড়েন। সত্য অতিরঞ্জিত ভাষার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়।

দর্শনের বিপদ ও অনুপত্তিসমূহ

'মুকাদ্দিমা'র সূচনাখণ্ডেই ইবনে খালদুন ধর্মের জন্য দর্শনকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা দেন। দর্শনের বিপদের কারণ হচ্ছে, দার্শনিকদের বিভিন্ন পূর্বানুমান এবং পক্ষপাতমূলক মতবাদ। এগুলো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন এবং ধর্মের জন্য তা ক্ষতিকর। এমন কয়েকটি তিনি উল্লেখ করেন। যেমন:

১। ধর্মের সত্যকে বোঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য দর্শন যথেষ্ট বলে দার্শনিকদের ধারণা এবং এভাবে তারা দর্শনের সাথে ধর্মকে সমন্বয় করার প্রচেষ্টা চালান।

২। কেবলমাত্র দার্শনিক অনুধ্যানের মাধ্যমে মানব আত্মার মুক্তি সম্ভব বলে মনে করে।

৩। আল্লাহ জগৎ থেকে বিকিরণের ক্রমধারায়, আল্লাহ কেবল ক্রমের প্রথমটির সাথে, অর্থাৎ প্রথম বুদ্ধির সাথে সম্পর্কিত।[৩৪১]

প্রথমত: দর্শন ও ধর্মের মধ্যে সমম্বয় সাধণ করার উদ্দেশ্যই ছিল সমস্ত মুসলিম দার্শনিকদের আশা ও প্রত্যাশা। তাঁদের মতে, দর্শন ও ধর্ম একই সত্যের সন্ধান দেয়। দর্শন দেয় অমূর্ত ভাষায়, ধর্ম দেয় রূপক ভাষায়; যাতে করে সাধারণের জন্য তা বোধগম্য হয়। দার্শনিকদের ধারণা যে, তারা ধর্মকে বিশুদ্ধ ও উত্তমরূপে অনুধাবন করতে সক্ষম।

ইবনে খালদুন মনে করেন যে, দার্শনিকদের পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং তাদের পদ্ধতির ধারণা-গঠন (concept formation) এবং অমূর্ত প্রজ্ঞা (abstract-reason) গঠন-বৈ আর কিছু নয়। তাঁর মতে, এই পদ্ধতির দ্বারা দার্শনিকগণ কখনও ধর্ম-বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্রভাবে পরমসত্যে উপনীত হতে পারবেন না। অধিকন্তু, দার্শনিক সত্যের সাথে ধর্মের

---

৩৪০ মুসলিম দর্শন চেতনা ও প্রবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪।

৩৪১ E.I.J. Rosenthal, æIbn Jaldun's Attitude to the Falasifa" in al-Andalus, (1955), Vol. 20, No.1.

সমন্বয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না- কারণ, দার্শনিকদের দেয়ার মতো কিছুই নেই। তারাও সত্যের দাবিদার- দার্শনিকদের এই দাবি শেষে বিশ্লেষণের ধোপে টেকে না। তারা ধর্মীয় সত্যকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেন না। কারণ, ধর্মীয় সত্য অধিকতররূপে একটি আভ্যন্তরীণ, স্বজ্ঞার বিষয়- অর্থাৎ, অভিজ্ঞতা বিশেষ। এটা দার্শনিকদের অমূর্ত ধারণা বা যুক্তি-প্রদর্শন নয়। তাদের পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কারণে শুধু ধর্মের নির্জীব ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যার দ্বারাই দার্শনিকগণ ধর্মীয় মতবাদের সাথে তাঁদের দর্শন মতবাদের সমন্বয় সাধন করতে পারেন। এভাবে দেখানো যেতে পারে দর্শন ধর্মের জন্য কত ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক।

দ্বিতীয়তঃ গ্রিক শিক্ষক প্লেটো ও অ্যারিস্টোটল অনুসরণে মুসলিম দার্শনিকবৃন্দ এই অভিমত পোষণ করেন যে, অমূর্ত দার্শনিক অনুধ্যানের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে সত্যিকার সুখ ও মানবাত্মার মুক্তি। কিন্তু ইবনে খালদুন মনে করেন যে, এটা বাস্তব অভিজ্ঞতার বিপরীত। কারণ দর্শন হচ্ছে প্রত্যক্ষণ (perceptual) অন্বেষা যার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। যতই দর্শন পাঠ করা যায়, ততই উদ্ভব হয় দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ। সুখ ও পরিত্রাণ আনার পরিবর্তে দর্শন আমাদের জন্য নিয়ে আসে দুঃখ ও অভিশাপ। কারণ, এটা আমাদেরকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অনেক শিক্ষার্থীই ইবনে সিনার 'শিফা' ও 'আল-নাজাত' অধ্যয়ন করে। তাদের প্রত্যাশা এটা তাদের আত্মার সুখ ও মুক্তি দেবে। কিন্তু পরিবর্তে দেখা যায় যে, এটা দ্বারা তাদের আত্মা দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের আবর্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে গেছে, যার থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ইবনে রুশদের ভাষ্য অধ্যয়নে বৃথা জীবন ব্যয় করেন। এটা তাঁদেরকে দর্শনের জট থেকে বিমুক্ত হওয়ার কঠিন পাঁকে আবৃত করে রাখে।[৩৪২]

তৃতীয়তঃ ফারাবী, ইবনে সিনা এবং অন্য দার্শনিকগণ ক্রমবন্ধন আকারে আল্লাহর সত্তা থেকে বুদ্ধি ও আত্মাসমূহের বিকিরণ মতবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ইবনে খালদুন তার মধ্যে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ বা অভিজ্ঞতামূলক ভিত্তি খুঁজে পান না। তাঁর নিকট এ বিষয়টি দার্শনিকদের ফাঁদ, হালকা তত্ত্ব বলে প্রতীয়মান হয় যা ক্ষুদ্র যুক্তির দ্বারাই প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। এই মতবাদ অনুসারে আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে কেবলমাত্র প্রথম বুদ্ধির সাথে সম্পর্কিত; অর্থাৎ আল্লাহ ও জগতের মধ্যকার বিকিরণের সমগ্র ক্রমবিন্যাসের আল্লাহ প্রথম দফার (Item) সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে, জগৎ সেই বিন্যাসের কেবল শেষ দফার

---

[৩৪২] মুকাদ্দিমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪-৮৫।

(Item)-এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। এই ব্যাপারটি আল্লাহ ও জগতের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি করে। এই মতবাদ যদি মুসলিম নব্য প্লেটোবাদীদের উপর আরোপ করা হয়, তবে তারা জড়বাদ সমর্থন করেছেন বলে সহজেই বলা যায়। জগৎ প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর সৃষ্টিক্রিয়ার ফল নয় বরং বিকিরণ ক্রমবিন্যাসের শেষ দফায় বিকিরণ এই কথা বলার অর্থ হচ্ছে আদি জড় থেকে জগৎ উদ্ভব হয়েছে এ মতবাদকে স্বীকার করে নেয়া।

অধিবিদ্যা

ইবনে খালদুন অধিবিদ্যার অসম্ভাব্যতার কথা বিশ্বাস করেন। অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে তাঁর মত হচ্ছে, মানবজ্ঞান সীমিত এ কথা প্রকাশ করা। মানবজ্ঞান যে সীমাবদ্ধ এ কথা তিনি বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। অবভাসিক জগতের জ্ঞান, শেষ বিশ্লেষণে প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু প্রত্যক্ষকারীর জ্ঞান তার ইন্দ্রিয় ক্ষমতা ও সংখ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দৃষ্টিশক্তির অবিজ্ঞতা সম্বন্ধে অন্ধলোকের কোনো ধারণা নেই। কিংবা বধির লোকের কোনো ধারণা নেই শ্রবণশক্তির ব্যাপারে। এসব অভিজ্ঞতার বাস্তবতা যারা অস্বীকার করেন তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ব্যতিরেকে আর কিছু নেই। অবভাবিসক এমন সত্তার অস্তিত্ব থাকতে পারে যারা বস্তুর জ্ঞান লাভে আমাদের চেয়েও উত্তমরূপে বিন্যস্ত ও সুসজ্জিত।[৩৪৩]

ইবনে খালদুনের দর্শনের মূল মতাদর্শ ছিল, ধর্ম আর বিজ্ঞান একসূত্রে গাঁথা। অতীন্দ্রিয়বাদকে তিনি ফিকহশাস্ত্রের আওতায় এনে আলোচনা করেছেন। তার মতে, "মানুষের জ্ঞান চর্চা অবশ্যই করতে হবে– এই জ্ঞান প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা উচিত। এমন পর্যায়ে যাওয়া উচিত নয় যেখানে মানুষের বুদ্ধি যথেষ্ট নয়। তার নিকট সে পর্যায়গুলো হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব, মৃত্যু পরবর্তী জীবন, ধর্মীয় ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করবে কিন্তু অবশ্যই এসব বিষয়কে বাদ রেখে।

[৩৪৩] মুকাদ্দিমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।

ইবনে খালদুন বলেন, অধিবিদ্যা মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য বা মুক্তির সঙ্গে যুক্ত সমস্যাবলির সমাধান দিতে পারে না। এর একটি মাত্র উপযোগিতা এই যে, যৌক্তিক পদ্ধতির সুদীর্ঘ অনুশীলন দ্বারা তা সত্য অর্জনের জন্য মানুষের মনকে শানিত করে। সব রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ পদ্ধতি মানবীয় উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এর অপব্যবহার এবং প্রয়োগজনিক সব সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত থাকার একটি মাত্র উপায় অসময়ে এর প্রয়োগ না করা। তাঁর মতে, ধর্মীয় বিজ্ঞানসমূহ, বিশেষত কোরআনের ভাষ্য (তাফসীর) ও আইনবিজ্ঞানে (ফিকাহ) দক্ষতা অর্জনের আগে এই শাস্ত্র অনুশীলনে ব্রতী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।[৩৪৪]

ইবনে খালদুন কোনো সংকীর্ণ শাস্ত্রগত পরিভাষায় কোনো প্রসিদ্ধ অতিপ্রাকৃত দার্শনিক ছিলেন না, তবে তিনি একজন সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন যে, তাঁর সুস্থ মেধা কোনো বক্র ও আনুমানিক বস্তু গ্রহণ করত না। তিনি মুকাদ্দিমায় এই মূলনীতির ভিত্তিতেই দর্শনের সমালোচনা করেছেন। তিনি বুদ্ধিবৃত্তির সীমা সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

'মুকাদ্দিমা'র সূচনাখণ্ডেই ইবনে খালদুন ধর্মের জন্য দর্শনকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা দেন। দর্শনের বিপদের কারণ হচ্ছে, দার্শনিকদের বিভিন্ন পূর্বানুমান এবং পক্ষপাতমূলক মতবাদ। এগুলো মিথ্যে ও ভিত্তিহীন এবং ধর্মের জন্য তা ক্ষতিকর। তিনি বলেন, "নিজ মেধার এ দাবির উপর কখনো বিশ্বাস করবে না যে, তা সৃষ্টিকুল ও সৃষ্টিজগতের কার্যকারণ সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারে এবং সৃষ্টিকুলের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা তার পক্ষে জানা সম্ভব। স্মরণ রাখতে হবে যে, অস্তিত্বের অর্থ হলো, ব্যক্তির নিকট বস্তুর প্রতিকৃতির উপস্থিতি। সে মনে করে অস্তিত্ব বলতে শুধু এটিই বুঝায়। এর বাইরের কোনো বস্তুর অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না। অথচ এটি বাস্তবতার পরিপন্থি। বধির ব্যক্তির নিকট অস্তিত্বশীল জগতের অর্থ- চতুরিন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা যা অনুভব করা যায় তাই। অন্ধ ব্যক্তির নিকট দর্শনযোগ্য কোন বিষয়ই অস্তিত্বশীল জগতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এসব অসুস্থ ব্যক্তির নিকট যদি সমসাময়িক জ্ঞানী ও সাধারণ লোকদের কথার কোনো মূল্য না থাকে, তাহলে তারা এসব বস্তুর অস্তিত্ব কখনও স্বীকার করবে না। তারা যদি স্বীকার করে, তবে তা তাদের স্বভাবের চাহিদা ও উপলব্ধি ক্ষমতার সাক্ষ্য অনুযায়ী নয়। অবলা জন্তুরা যদি কথা বলতে পারত এবং তারা নিজেদের মতামত প্রকাশ করত, তাহলে আমরা শুনতে পেতাম যে, তারা বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনো বিষয় মানতে রাজী নয়। তাদের নিকট এসব বিষয়ের কোনো অস্তিত্ব নেই। এমন অনেক বিষয়

---

[৩৪৪] ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪-৭৫।

রয়েছে, যা আয়ত্ত করার কোন উপকরণ আমাদের নিকট নেই। কারণ, আমাদের উপলব্ধি ক্ষমতা সীমিত ও অস্থায়ী। অথচ আল্লাহর কুদরতের বাইরে কোনো কিছু নেই।

অতএব, নিজ উপলব্ধি ক্ষমতার ব্যাপকতা ও নিজ আয়ত্তকৃত বিষয়ের সংখ্যা সম্পর্কে সংশয়মুক্ত হওয়া উচিত নয়। বরং আল্লাহর দেয়া শরীয়তের শিক্ষার ওপর আস্থা রাখা উচিত। কেননা, আল্লাহ মানুষের কল্যাণের কথা মানুষের চেয়েও বেশি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন, মানুষের কল্যাণ কিসে নিহিত তাও তিনি ভালো জানেন। তাঁর মর্যাদার সাথে মানুষের মর্যাদার কোনো তুলনা হয় না। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আল্লাহর সামনে কিছুই নয়। কিন্তু তাই বলে বুদ্ধিবৃদ্ধির যে কোনো মূল্য নেই এমন নয়। বুদ্ধিবৃত্তি একটি সঠিক মানদণ্ড। এর সিদ্ধান্ত সংশয়মুক্ত। এতে কোনো মিথ্যার অবকাশ নেই। কিন্তু এ মানদণ্ডে তাওহীদ, আখেরাত, নবুওয়াত, আল্লাহর গুণাবলির স্বরূপ এবং বুদ্ধি সীমার বাইরের বিষয়গুলো মাপা যায় না। যদি কেউ মাপতে চায়, তাহলে তা হবে নিষ্ফল প্রচেষ্টা মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ, এক ব্যক্তি স্বর্ণ-রূপা ওজনের দাঁড়িপাল্লায় যদি পাহাড় মাপতে চায়, তাহলে তা সম্ভব হবে না। তবে তাই বলে এতে দাঁড়িপাল্লার বিশুদ্ধতা অপ্রমাণিত হয় না। কেননা তার শক্তির একটি সীমা আছে। তেমনই বুদ্ধিবৃত্তির কার্যকারিতার একটি পরিসর রয়েছে। সে তার বাইরে যেতে পারবে না। কেননা এটি তাঁর সৃষ্টির একটি বিন্দুমাত্র।”[৩৪৫]

ইবনে খালদুন মন্তব্য করেন, বুদ্ধি হচ্ছে সেই শক্তি যার মাধ্যমে আমরা বস্তুর মধ্যে কারণিক সম্পর্কের সন্ধান পাই এবং কার্যকারণের শৃঙ্খল আবিষ্কার করি। ব্যক্তি যতই বুদ্ধিমান হন, ততই তিনি বহুসংখ্যক বিষয় বা ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণের নিয়ম দ্বারা সংযোগ ঘটাতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দাবা খেলায় বুদ্ধিমান খেলোয়াড় তার সম্ভাব্য চালের সংখ্যা সম্বন্ধে পূর্বেই সচেতন থাকে, যেটা কমবুদ্ধিসম্পন্নের জন্য সম্ভব হয়ে ওঠে না।

---

[৩৪৫] সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (র), মাযহাব ও তামাদ্দুন (ইন্ডিয়া, জামিয়া মিল্লিয়া, ১৯৪৩ খ্রি.); ইসলাম ও অন্যান্য সংস্কৃতি, লিয়াকত আলী অনূদিত (ঢাকা: ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৯-২০; মুসলিম দর্শন চেতনা ও প্রবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫।

ইবনে খালদুন তাঁর 'মুকাদ্দিমা'য় বলেন, "আপনি যেমন জানতে পারলেন, এটাই এ শাস্ত্র পাঠের ফলশ্রুতি এবং এর সাথে শাস্ত্রবিদদের বিচিত্র মত ও পথ, তাদের ক্ষতিকারক ধারণা সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা যায়। কাজেই উক্ত শাস্ত্র সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রকেই তার অপকারিতা সম্বন্ধে সতর্কতার সাথে অবহিত হতে হবে। যে-কোনো ব্যক্তি তার সৃষ্টিশক্তিকে ধর্মীয় বিধান, কুরআনের ভাষ্য, শাস্ত্রীয় অনুশাসন ইত্যাদির যথাযথ অবহিতির দ্বারা উজ্জ্বল করে যেন তাতে দৃষ্টিপাত করে।

ধর্মীয় জ্ঞানহীন অবস্থায় কারও পক্ষে উক্ত শাস্ত্রের উপর ঝুঁকে পড়া উচিত নয়; অন্যথায় তার অপকারিতা থেকে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা খুবই কম। আল্লাহই সঠিক পথের সাহায্যদাতা এবং সত্যের দিকে তিনিই পথ প্রদর্শন করেন।[৩৪৬] আল্লাহ বলেন, "আমরা কিছুতেই সত্যের পথ অনুসরণ করতে পারতাম না, যদি না আল্লাহ আমাদেরকে সেই পথ প্রদর্শন করতেন।"[৩৪৭]

[৩৪৬] ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, অনুবাদ, গোলাম সামদানী কোরায়শী, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪।

[৩৪৭] আল-কুরআন: ৭: ৪৩।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ভূগোলশাস্ত্রে ইবনে খালদুনের অবদান

ভূগোলের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Geography' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গ্রিক পণ্ডিত ইরাটোসথেনিস (২৭৬ খ্রি. পূ.) সর্বপ্রথম মানুষের আবাসস্থল হিসেবে পৃথিবী সম্পর্কে বর্ণনা করতে 'Geography' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'Geo' অর্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ নিয়ে গঠিত পৃথিবী এবং 'Graphia' বলতে উক্ত পৃথিবীর বর্ণনা। সুতরাং তাঁর ধারাণা অনুযায়ী 'Geography' হচ্ছে মানুষের আবাসস্থল হিসেবে পৃথিভীর বর্ণনা।[৩৪৮] প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিত ইরাটোসথেনিসের[৩৪৯] (Eratosthenese, 276-194 BC) প্রায় তিনশত বছর পর তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি গ্রিক পণ্ডিত ক্লডিয়াস টলেমি[৩৫০] (Claudius Ptolemy, আনুমানিক ১০০-১৭০ খ্রিস্টাব্দ) তদানীন্তন জ্ঞান পৃথিবী সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করে ভূগোল শাস্ত্রে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ 'Geography' যা ল্যাটিন ভাষায় জিওগ্রাফিয়া (Geographia) রচনা করেন এবং ভূগোল একটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তার পরিসর পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে আসছে। ভৌগলিক জ্ঞানের ধারণা শুরু সম্ভবত তখন থেকেই। ভূগোলের ইতিহাস থেকে জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ২০০ বছর পূর্বেও যদিও 'Geography' অর্থাৎ ভূগোল শবইট এসেছে কিন্তু এর পর্যালোচনা শুরু হয় অনেক আগ থেকেই। একটি পৃথক বিষয় হিসেবে ভূগোলের সমীক্ষা শুরু হওয়ার আগে এটি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একটি আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে সমীক্ষা করা হতো।[৩৫১] মধ্যযুগে এসে একটি আলাদা বিষয় হিসেবে এটি পরিগণিত

---

৩৪৮ The Study of Geography, Vol. 9, No. 210 (Feb. 11, 1887), pp. 137-141; Published by: American Association for the Advancement of Science Stable URL: https://www.jstor.org/stable/1762738.

৩৪৯ এরাতোস্থেনেস প্রাচীন গ্রিক গণিতজ্ঞ, ভূগোলবিদ, কবি, জ্যোতির্বিদ, এবং সঙ্গীত তত্ত্ববিদ। যিনি আলেকজেন্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে কেবলমাত্র জ্ঞানার্জনের জন্য কর্মরত ছিলেন। তিনি জ্ঞানের অন্যতম শাখা ভূগোল এবং এর কতিপয় পরিভাষা উদ্ভাবন করেন।

৩৫০ গণিতবিদ ক্লডিয়াস টলেমি ছিলেন মিসরের অধিবাসী। মিসর তখন রোমান-গ্রিসের শাসনাধীন ছিল। গণিতের পাশাপাশি ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রেও পাণ্ডিত্য ছিল টলেমির।

৩৫১ মোঃ বাহাদুর হোসেন ভূঞা ও জগন্নাথ রায়, ভৌগোলিক চিন্তা ও ধারণা (ঢাকা: স্বজন প্রকাশনী, ২০১৬ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৪১-৪২।

হয়। পরবর্তীতে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে এসে ভূগোল একটি পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়।

মধ্যযুগে বিজ্ঞানে মুসলিম বিশ্ব গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে। একটি প্রকাণ্ড মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে মুসলমাগণ একটি পরাশক্তিতে পরিগণিত হয় এবং বিশ্বময় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম পণ্ডিতবর্গ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখঅয় অভূতপূর্ব ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। মধ্যযুগে মুসলিম সভ্যতা আরবের শুষ্ক মরুভূতিতে বিকশিত হয়। বৃষ্টিহীন, শুষ্ক বালুকাময় আরবভূমি কৃষিকাজের অনুপযুক্ত। ফলে অধিবাসীগণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও পশুপালন পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করত। আরব বণিকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে পূর্বদিকে ভারত, মালয়, জাভা হয়ে বোর্নিও পর্যন্ত এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে মিশর, আলেজিরিয়া, মরক্কো, স্পেন, তিউনেসিয়া অঞ্চলে যাওয়া-আসা করত। ফলে গ্রিক ও অন্যান্য জাতির সাথে আরবদের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। আরব বণিকগণ পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়তেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করে আরব পণ্ডিতগণের নিকট ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের বিবরণ বিধৃত করতেন। আরব পণ্ডিতগণও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করতেন এবং লিপিবদ্ধ করে রাখতেন যা দ্বারা সে সময় ভৌগোলিক জ্ঞানের ব্যাপক পরিবর্তন সংঘঠিত হয়।[৩৫২] এ যুগে ভৌগোলিক জ্ঞান অনুশীলনের সর্বপ্রধান পদক্ষেপ ছিল বাদশাহ আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)[৩৫৩] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বাইতুল হিকমাহ' অর্থাৎ বিজ্ঞান গৃহ। এ সময় মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ভৌগোলিক জ্ঞানে অনেক অবদান রাখেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন– মুসা আল-খাওয়ারিজমী (৭৮০-৮৫০ খ্রি.), ইয়াকুবী (মৃ. ৮৯৭ খ্রি.), আল-বালখি (৮৫০-৯৩৪ খ্রি.), ইবনে হাউকাল (মৃ. ৯৭৮ খ্রি.), আল-মাসুদী (৮৯৬-৯৫৬ খ্রি.), আল-মুকাদ্দিসী (৯৪৭-৯৯১ খ্রি.), আল-বিরুনী (৯৭২-১০৪৬ খ্রি.), আল-ইদ্রিসী (১০৯৯-১১৬৬ খ্রি.), ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৭ খ্রি.) ও ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.) প্রমূখ।

---

[৩৫২] ভৌগোলিক চিন্তা ও ধারণা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৪।

[৩৫৩] আবু জাফর আবদুল্লাহ আল মামুন ইবনে হারুন (৭৮৬-৮৩৩ খ্রি.) ছিলেন ৭ম আব্বাসীয় খলিফা। তিনি ৮১৩ খ্রি. থেকে ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পর্যন্ত শাসন করেন। মামুন বুদ্ধিমান, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উদার, প্রজাহিতৈষী এবং সুবিচারক ছিলেন। তাঁর শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল বলে ইসলামের ইতিহাসে এ যুগকে 'অগাস্টান যুগ' বলে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর সময়েই অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, আইন ও ধর্মতত্ত্ব, এক কথায় জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় এক অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল। (দ্র. মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, আরব জাতির ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬-৩৭।)

ইবনে খালদুন একজন ইতিহাসবেত্তা এবং সমাজবিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও মানবিক ভূগোলে তাঁর অবদানের জন্য খ্যাতি রয়েছে। তাঁর খ্যাতির ভিত্তি ছিল 'মুকাদ্দিমাহ'। এটি তাঁর সমাজবিজ্ঞান এবং জীবন ও জনবসতির উপর সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কিত ধারণা যা অত্যন্ত মূল্যবান হিসেবে স্বীকৃত। এতে তিনি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে মানব সভ্যতা এবং তার পরিবেশ, বেদুইন ও স্থায়ী জীবন, লাভজনক পেশা, দেশ ও শহর, বিজ্ঞান এবং বহু ঐতিহাসিক বিষয়ের আলোকপাত করেছেন। বিশেষ করে যাযাবরীয় মরু জীবন, স্থায়ী মানব সমাজ এবং নগর সম্প্রদায়ের উপর তার আলোচনা ছিল মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

বসবাসযোগ্য পৃথিবী সম্পর্কে খালদুনের ধারণা

ইবনে খালদুন বাসযোগ্য পৃথিবী সম্পর্কে বলেন, পৃথিবীর স্থলভাগের বেশীরভাগ এলাকাই মরুভূমি, পাহাড় দ্বারা পরিপূর্ণ। ফলে স্থলভাগের সব অংশই মনুষ্য বসবাসের উপযোগী নয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে অত্যধিক উত্তাপের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, সূর্য এই এলাকায় লম্বভাবে কিরণ দেয়; কেবলমাত্র বছরে দুইবার ২৩.৫ ডিগ্রি পর্যন্ত দূরে সরে যায়। এ ধরনের অধিক উষ্ণ অঞ্চলে মানুষের বসতি স্থাপনের উপযোগী নয় বলে ইবনে খালদুন অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে তাপ ও শৈত্যের মিলনের ফলে সৃষ্ট নাতিষীতোষ্ণ অঞ্চল মানুষের বৃদ্ধি ও বসতি স্থাপনের জন্য সহায়ক। তাঁর মতে নিরক্ষরেখার দক্ষিণ অংশের মরু এলাকাগুলো অত্যধিক গরমের জন্য বসবাসের প্রায় অনুপযোগী এবং অধিকাংশ মরু অঞ্চল এই দক্ষিণাংশেই অবস্থিত। ফলে সেখানে মানুষের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ গড়ে উঠেনি এবং ঐ অঞ্চলে হালকা বসতি এলাকায় পরিণত হয়েছে।[৩৫৪] ইবনে খালদুনের মতে, পৃথিবীর বাসযোগ্য অংশ প্রধানত উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত এবং এর উপরিভাগ উত্তল আকৃতির, কারণ পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীর উত্তরাংশ দক্ষিণ অংশ অপেক্ষা অধিক জনবসতিপূর্ণ। তিনি আরও বলেন যে, নিরক্ষরেখা ও এর নিকটবর্তী স্থানে জনসংখ্যা সবচেয়ে কম এবং নিরক্ষরেখা থেকে দূরবর্তী স্থানে বাসযোগ্য অংশের উপরিভাগে লোক বসতির সমাবেশ সবচেয়ে বেশী। তাঁর মতে বাসযোগ্য এলাকাটি নিরক্ষরেখা ও ৬৪° উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত।[৩৫৫] তাঁর মতে, পৃথিবীর মোট স্থলভাগের মাত্র এক চতুর্থাংশ

---

[৩৫৪] ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন (ঢাকা: ই.ফা.বা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৮।

[৩৫৫] ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

বাসযোগ্য বলে বিবেচিত। তিনি উত্তর গোলার্ধের বাসযোগ্য অংশকে ৭টি জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন কিন্তু উত্তরের সর্বশেষ বসতিহীন অঞ্চলটি সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত বলে উল্লেখ করেন। তিনি জলবায়ু ও অবস্থানভেদে সমাজের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা এবং উষ্ণ-শীতল ও নীতিশীতোষ্ণ মন্ডলে এর বিভিন্নতার উপর আলোকপাত করেছেন।[৩৫৬]

গাণিতিক ভূগোলে অবদান

ইবনে খালদুনের মতে, নিরক্ষরেখাই সবচেয়ে বড় বৃত্ত, যা পৃথিবীকে দুইটি সমানভাগে বিভক্ত করেছে। তিনি বৃহৎ বৃত্ত নিরক্ষরেখার ৩৬০° ডিগ্রিতে বিভক্ত করেন এবং উল্লেখ করেন যে, মেরুবিন্দু নিরক্ষরেখা থেকে ৯০° কৌণিক ব্যবধানে অবস্থান করেছে। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পদ্ধতিতে নিরক্ষরেখা এবং অক্ষরেখা দাঘিমারেখাগুলো নির্ধারণের কৌশল বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, ভূপৃষ্ঠে যখন সূর্যালোকে সমকোণে পতিত হয় ঠিক তখনই সৌরতাপ সবচেয়ে বেশি এবং যখন তা তীর্যক কোণে পতিত হয় তখন সৌরতাপ তুলনামূলকভাবে কম।[৩৫৭]

মানবিক ভূগোলে অবদান

ভূগোলের যে শাখা পৃথিবীতে বসবাসরত বিভিন্ন মানবসম্প্রদায় ও তাদের জীবন যাপনের ধরণ ব্যাখা করে তাকে মানব ভূগোল বলে। মানবীয় ভূগোল হল– ভূগোলের এমন একটি শাখা যা মানব সমাজের আকৃতিগত পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। এতে মানুষ, তার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, এবং আর্থনৈতিক দিক নিয়ে   পর্যালোচনাভূক্ত। মানবিক ভূগোলে পৃথিবীপৃষ্ঠে মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বর্ণনা, স্থানিক পার্থক্য এবং এই পার্থক্যের পেছনে প্রাকৃতিক প্রভাবের ভূমিকাও পর্যালোচনা করা হয়।

ইবনে খালদুন ছিলেন সমাজবিজ্ঞানের জনক। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের আচার-ব্যবহার, চালচলন, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবিকা, মানুষের ওপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব, জলবায়ুর প্রভাব, সম্পদের স্বল্পতা ও পর্যাপ্ততার প্রভাব, সমাজ জীবনে জাতি, ধর্ম, গোত্রের বিভিন্নতার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইতিহাসের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করতে হবে এবং সম্ভব ও অসম্ভব চিহ্নিত করতে হবে, কোন সমাজকে বিশ্লেষণ করতে হলে তার (১) অবস্থানগুলো বৈশিষ্ট্যসহ চিহ্নিত

---

[৩৫৬] প্রাগুক্ত।

[৩৫৭] ভৌগোলিক চিন্তা ও ধারণা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮।

করতে হবে (২) মাঝে মধ্যে যে সব ঘটনা ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং (৩) যে সব অবস্থা সৃষ্টি হবার প্রশ্নই ওঠে না। এই তিনটি অবস্থাকে পৃথক করতে হবে।

ইবনে খালদুন এক সম্পূর্ণ পৃথক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজের বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করেছেন। নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকে তিনি মানব সমাজ এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। তার মুকাদ্দিমা গ্রন্থে মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের উপর তার প্রভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতঃপর আদি সামাজিক সংগঠন নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। নগরীয় জীবন কিভাবে মানবীয় সংগঠন এবং সভ্যতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে তার উল্লেখের মাধ্যমে বাণিজ্য ও কারু শিল্পের ক্রমোন্নয়ন বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষতঃ স্থায়ী অধিবাসীরা কৃষি এবং হস্ত ও কুটির শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কোন কোন এলাকা শহরে পরিণত হয়েছে। আবার অনুকূল পরিবেশে কোন কোন শহর বিরাট নগরীতে পরিণত হয়েছে। এভাবে তিনি আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা ও মানবিক ভূগোলের প্রাথমিক বিকাশ পর্যালোচনা করেছেন।[৩৫৮]

পরিবেশের প্রভাব

ইবনে খালদুন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে, এমনকি একই অক্ষাংশের মধ্যে পরিবেশের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, একই অক্ষাংশে অবস্থিত মহাদেশীয় ভূ-ভাগের বিভিন্ন অংশে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ব্যাপক পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। মানব জীবনে জলবায়ুর প্রভাব ও এর প্রতিক্রিয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে পরিবেশের পার্থক্যের ফলে মানুষের জীবন যাত্রার বিভিন্ন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি বলেন, নাতিশীতোষ্ণ ও অনাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ু মানুষের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্য মানুষের বিকাশ ও বিভিন্ন এলাকার উন্নতির ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন যে, নিরক্ষীয় অঞ্চলের উত্তাপ ও মেরু অঞ্চলের শৈত্যের মধ্যবর্তী অংশে এমন একটা অঞ্চল রয়েছে যেখানে দক্ষিণের তাপ ও উত্তরের ঠাণ্ডা মিশ্রিত হয়ে একটি স্বাস্থ্যকর জলবায়ু অঞ্চলের সৃষ্টি করেছে, যাকে ‘পরিমিত’ নামে অভিহিত করা যায়।

---

[৩৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

ইবনে খালদুনের মতে, বিশ্বের সমস্ত জনগণের মধ্যে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জনগণ জীবনযাত্রা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, পোশাক, বাসস্থান, খাদ্য, কারিগরী কৌশল, পরিবহণ, চারু ও কারুকলা প্রভৃতির দিক থেকে অগ্রগামী। চরম আবহাওয়া বিশিষ্ট অঞ্চলের জনগণ ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় পশুর মতো জীবন যাপন করে। তিনি আরও বলেন যে, জলবায়ুর পার্থক্যের জন্য শুধু মানুষের মধ্যেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না, জীবজন্তুর স্বভাব, গঠন প্রকৃতি, বুদ্ধি, বর্ণ, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়।

ইবনে খালদুন নিগ্রোদের জীবন যাত্রায় পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "অধিকাংশ নিগ্রো গুহায় এবং বনজঙ্গলে বাস করে, বনের ফলমূল আহার করে এবং হিংস্র অসভ্য প্রকৃতির; কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সগোত্রের মাংস আহার করে। নিগ্রোদের গায়ের রং কালো হবার কারণ সম্পর্কে তিনি বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি প্রদর্শন করেন। তখনকার দিকে প্রচলিত ধারণা ছিল যে, নিগ্রোরা নূহ নবীর হাম-এর বংশধর। নূহের (স.) অভিসম্পাত লাভ করায় হামের বংশধরদের গায়ের রং কালো হয়েছে।[৩৫৯]

ইবনে খালদুন উল্লেখ করেন যে, নিরক্ষীয় অঞ্চলের অত্যধিক সৌরতাপের ফলেই নিগ্রোদের গায়ের রং কালো এবং অনুরূপভাবে অত্যধিক শৈত্য ও বরফাবৃত পরিবেশের জন্য মেরু অঞ্চলের অধিবাসীদের গায়ের রং সাদা, চোখ নীল এবং চুল লাল বা লালচে বাদামী হয়। মানুষের গায়ের রং-এর পার্থক্য সম্পর্কে জনপ্রিয় ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে তার ভৌগোলিক কারণ উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হন।

---

[৩৫৯] ইবনে খালদুন বলেন, "কতিপয় বংশ তালিকা বিশারদ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে, নিগ্রোরা হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র হামের বংশধর। হামকে তার পিতা নূহ (আ) অভিশাপ দেয়ার ফলে তার (হামের) গায়ের রং কালো বর্ণ ধারণ করেছিল এবং আল্লাহ হামের বংশধরের উপর দাসত্ব চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারী বংশ তালিকা বিশারদগণ এ প্রসঙ্গে গল্পকারদের একটি কল্পিত কাহিনীরও অবতারণা করে থাকেন। তাওরাত গ্রন্থে হযরত নূহ (আ) কর্তৃক তার পুত্র হামকে অভিশাপ দেওয়ার কথা বর্ণিত আছে, কিন্তু গায়ের রং কালো হওয়া প্রসঙ্গে কোনো কিছুর উল্লেখ নেই।" তিনি আরও বলেন, "বংশ তালিকা বিশারদগণের ভ্রান্তির কারণ হল– তারা শীত-গ্রীষ্মের প্রকৃতি এবং আবহাওয়া ও প্রাণীকুলের উপর এদের প্রভাব সম্পর্কে অমনোযোগী।" (দ্র. ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।)

ইবনে খালদুনের মতে, জলবায়ুর ওপর ভিত্তি করেই স্থানভেদে লোকসংখ্যা ঘনত্বের তারতম্য হয়। তিনি মিশরীয়দের সাথে মরক্কোর অধিবাসীদের তুলনা করে বলেছেন যে, মৃদু জলবায়ু ও পর্যাপ্ত সরবরাহ মিশরীয়দের মধ্যে উত্তম রসিকতাবোধ ও সাবধানতা সৃষ্টি করেছে। পক্ষান্তরে, অনুর্বর উচু ভূমি ও চাহিদা পুরণের অসুবিধা মরক্কোবাসীকে ঐকান্তিক সাবধানী ও সতর্ক হতে বাধ্য করেছে।

ভৌগোলিক ধারণা প্রকাশের ক্ষেত্রে ইবনে খালদুনের অবদানের মধ্যে নিম্নোক্ত ৩টি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(ক) একজন দাশনিক হিসেবে পৃথিবীর গোলাকারত্ব এবং বিশ্বজগতে পৃথিবীর স্থান প্রমাণ করতে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন।

(খ) তিনি মানুষ ও জলবায়ুর মধ্যবর্তী সম্পর্ক গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

(গ) গাণিতিক হিসেব ছাড়াই তিনি পৃথিবীর কেন্দ্রীয় আকর্ষণ (মধ্যাকর্ষণ) শক্তির ধারণা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন।[৩৬০]

---

[৩৬০] ভৌগোলিক চিন্তা ও ধারণা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১০।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
আধুনিক সমাজচিন্তাবিদদের তত্ত্বে ইবনে খালদুনের প্রভাব

আধুনিক গবেষকদের মতে, ইবনে খালদুনের সমাজচিন্তার সাথে ম্যাকিয়াভেলি, মার্কস, ডুর্খেইম ও প্যারেটোর সমাজচিন্তার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। অধ্যাপক রংগলাল সেন ইবনে খালদুনের সমাজ চিন্তার সাথে মার্কস, ডুর্খেইম ও প্যারেটোর সমাজচিন্তার সাদৃশ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, খালদুন-কথিত 'আসাবিয়া' প্রত্যয়সূত্রে একদিকে মার্কসীয় শ্রেণিতত্ত্বের সন্ধান মেলেন আর অন্যদিকে শ্রেণিতত্ত্ব-বিরোধী পেরেটো-প্রবর্তিত এলিট-তত্ত্বেরও আভাস পাওয়া যায়। এখানে একথাও বলা আবশ্যক যে, উক্ত তত্ত্ব দুটি বিপরীতধর্মী হলেও অনেকের মতে পরস্পরের পরিপূরকও বটে। অর্থাৎ, ইবনে খালদুনকে কতকাংশে কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ভিলফ্রেডো পেরেটো (১৮৪৮-১৯২৩) উভয়েরই পূর্বসূরি ভাবলেও বোধ হয় খুব একটা ভুল হবে না। তবে পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীদের ভেতর যিনি সরাসরি সামাজিক সংহতি (Social solidarity) নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি হলেন ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খিম (১৮৫৮-১৯১৭)। ডুর্খিম তাঁর The Division of Labour in Society (1893) গ্রন্থে সামাজিক সংহতির ভিত্তি হিসেবে শ্রমবিভাজনকেই সনাক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অর্থনৈতিক উপাদান যে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে সে-ধারণাটিও খালদুন চিন্তায় অনুপস্থিত ছিল না। পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরাই একথা স্বীকার করেছেন।[৩৬১]

অধ্যাপক নূরজ্জামান বলেন, "ইবনে খালদুন বর্ণিত 'মুকাদ্দিমা'য় গোত্রপ্রীতির বিকাশ ও বিবর্তনের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তার পরবর্তীকালের অন্যতম সমাজদার্শনিক এমিল ডুর্খেইমের (১৮৫৮-১৯১৭খ্রি.) মতবাদের সাদৃশ্য লক্ষ্য পরিলক্ষিত হয়।"[৩৬২]

ইবনে খালদুন ও এমিল ডুর্খেইম

এমিল ডুর্খেইম তাঁর বিখ্যাত The Division of Labour in Society (1893) গ্রন্থে বলেন, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক তাদের মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অথবা আদান-প্রদানের উপর নির্ভর করে সামাজিক সংহতির গভীরতা। তিনি সামাজিক সংহতিকে

---

[৩৬১] রংগলাল সেন, ইবনে খালদুন: সমাজবিজ্ঞানের অনানুষ্ঠানিক জনক, পৃ. ৩৮-৪০।

[৩৬২] মোঃ মোঃ নূরুজ্জামান, চিরায়ত সমাজচিন্তা (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৮।

দুইভাগে বিভক্ত করেন– যান্ত্রিক সংহতি ও জৈবিক সংহতি। আদিম সমাজে অথবা বর্তমানে বিভিন্ন উপজাতীয় সমাজব্যবস্থায় আমরা সদস্যবর্গের মধ্যে যৌথচেতনার উপস্থিতি লক্ষ করি, এরূপ সমাজ কাঠামোয় শ্রম বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নাই। সীমিত সম্পদের মধ্যে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে যৌথভাবে সকল সমস্যা সমাধানের একটি চেতনা গড়ে ওঠে। তাদের এই চেতনা পরস্পরের মধ্যে এক গভীর মমত্ববোধ অথবা সংহতির জন্ম দেয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরিবর্তে যৌথচেতনার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এরূপ সমাজে।[৩৬৩]

আরব বেদুইনদের মধ্যে এরূপ সামাজিক সংহতি অথবা আসাবিয়ার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। কিন্তু তারা যখন প্রান্তর ছেড়ে নগরে বসবাস শুরু করে তখন থেকেই তাদের যৌথচেতনার মধ্যে ফাটল দেখা দেয়, অথবা রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর রাজকার্য পরিচালনায় যৌথচেতনা আস্তে আস্তে কমে যায় বলে তারা মনে করে। এমিল ডুর্খেইমও মানুষের নগর জীবনে যৌথ চেতনার উপস্থিতি লক্ষ করেন। এই জীবনব্যবস্থায় শ্রম বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যৌথচেতনার পরিবর্তে এখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যে আরব বেদুইনরা প্রান্তরে থাকা অবস্থায় গোত্রপ্রীতির গভীর বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় যৌথভাবে কোনো বিরূপ অবস্থার মোকাবেলার করত, তারাই কোনো রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর রাজকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যৌথচেতনার পরিবর্তে বিশেষজ্ঞ শ্রেণি গড়ে তোলে। বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত এই শ্রেণির মধ্যে কোনোরূপ সামাজিক সংহতির উদ্ভব হয় না। ফলে কোনো বিরূপ অবস্থা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে গোত্রের সকলের সহায়তা তারা পায় না, শাসনকার্যে দুর্বলতা দেখা দেয় এবং একসময় রাজবংশের পতন ঘটে। এমিল ডুর্খেইম দাবি করেন, সামাজিক সংহতির অভাবে নৈরাজ্য বয়ে আনে।'[৩৬৪] এছাড়া ডুর্খইম তাঁর বিখ্যাত 'সুইসাইড' গ্রন্থে আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দাবি করেন যে, আত্মহত্যার মূলে রয়েছে সংহতি। তিনি আত্মহত্যা সম্পর্কিত তাঁর মতবাদে বিভিন্ন প্রকার আত্মহত্যার কথা বলেছেন- আত্মকেন্দ্রিক

---

৩৬৩ Doyle Paul Johnson (1981), Sociological Theory: Classical Founders and Contemporary Perspectives, John Wiley Press, p.282.

৩৬৪ Akbar Ahmed, Ibn Khaldun's Understanding of Civilization and the Dilemmas of Islam and the West Today", The Middle East Journal, 2002, Vol. 56, No. 1, p. 20-25.

আত্মহত্যা, পরার্থবাদী আত্মহত্যা ও নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা।"[৩৬৫] তার মতে, এ সকল আত্মহত্যার মূলে রয়েছে হয় সামাজিক সংহতির অভাব অথবা নতুবা এর আধিক্য। তিনি আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার কারণ হিসেবে সামাজিক সংহতির অভাবকে দায়ী করেন। ব্যক্তির সাথে যদি সমাজের অথবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্ক শিথিল থাকে, তবে সে এক প্রকার বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হয়, ক্রমে সে পরিবার থেকে, সমাজ থেকে দূরে সরে যায়। এক সময় জীবন তার নিকট অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর মাধ্যমে এ সমাধান খোঁজে। অন্যদিকে পরার্থবাদী আত্মহত্যায় বিপরীত অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির সাথে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের বন্ধন থাকে গভীর, ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেয়। প্রবল সামাজিক সংহতির জন্যই কোনো ব্যক্তি নিজের সমাজের অন্যান্য সদস্যদের মঙ্গলার্থে বিজর্সন দেয়।[৩৬৬]

ইবনে খালদুন ও প্যারেটোর

রাজবংশ প্রতিষ্ঠা এবং এর পতন সম্পর্কে ইবনে খালদুনের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তার সাথে পরবর্তীকালের সমাজদার্শনিক ভিলফ্রেডো প্যারেটোর (১৮৪৮-১৯২৯) সমাজচিন্তার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তিনি শ্রেণিবিভক্ত সমাজ কাঠামোয় বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, বৈসাদৃশ্য, তাদের মধ্যকার বৈষম্য একান্তভাবে বাস্তব বলে প্যারেটো বিশ্বাস করতেন। গুণাবলির দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিছু মানুষ যোগ্যতার বিচারে অন্য কিছু মানুষের তুলনায় অধিকতর সমৃদ্ধ। ফলে এই যোগ্যতর মানুষগুলোই সমাজের শাসক হয়ে ওঠে। এই অল্প কিছু মানুষ দ্বারা সমাজের অধিকাংশ মানুষ শাসিত হয়। প্যারেটো তাদেরকে 'এলিট' বলে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তার মতবাদকে 'এলিট থিউরি' বলে অভিহিত করা যায়। এলিটদেরকে তিনি দুই ভাগে ভাগ করেছেন, শাসনকারী ও অশাসনকারী এলিট। শ্রেণিবিভক্ত সমাজ কাঠামোয় বিশ্বাসী প্যারেটো সমাজের এই বিভাজন অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করতেন। কেননা মানুষ জ্ঞানে অথবা গুণে কখনোই একে

---

[৩৬৫] Emile Durkheim, Suicide: A Study in Sociology, Translated by John, A Spauding and George Simpson, Routledge & Kegan Paul, Ltd., 1952, p. 152-276.

[৩৬৬] মোঃ নূরুজ্জামান, চিরায়ত সমাজচিন্তা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

অপরের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে না।[৩৬৭] শাসনকারী এলিট চিরদিন ক্ষমতায় থাকতে পারে না। এক সময় এই শাসনকারী এলিট অশাসনকারী এলিটে পরিণত হয়। আবার অশাসনকারী এলিট শাসনকারী এলিটে রূপ নেয়। এটিই প্যারেটোর বিখ্যাত 'সারকুলেশন অব্ এলিট' বা 'এলিটকদের চক্রাকার' মতবাদ হিসেবে পরিচিত। প্যারেটের এই তত্ত্বের সাথে ইবনে খালদুনের মতবাদের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ইবনে খালদুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা, এর পেছনের বিভিন্ন শক্তি, এর বিকাশ ও পতনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তার সাথে প্যারেটোর শাসকবর্গের উত্থান, বিকাশ ও পতনের সামঞ্জস্য রয়েছে। ইবনে খালদুন রাজবংশের উদ্ভব ও বিকাশের পেছনে আসাবিয়্যার অবদানকে গুরুত্বপ্রদান করেছেন। আসাবিয়ার অফুরন্ত শক্তিই কোনো গোত্রকে রাজবংশ বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। আবার আসাবিয়ার অনুপস্থিতি এক সময় এই রাজবংশের পতন ঘটায়।[৩৬৮] প্যারেটো বলেন, "শাসনকারী এলিট চিরদিন ক্ষমতায় থাকতে পারে না। এক সময় এই শাসনকারী এলিট অশাসনকারী এলিটে পরিণত হয়।"

এ পরিবর্তনের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এর পেছনে রয়েছে রেসিডিউস। মানব আচরণের ব্যাখ্যা প্যারেটো রেসিডিউস প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। কোনো কাজের পেছনে মানুষের প্রেষণা কাজ করে, কোনো না কোনো প্রেষণায় তাড়িত হয়ে সে একটি কাজ সম্পাদন করে থাকে। এই প্রেষণাসমূহের স্থায়িত্ব আপেক্ষিক। কমবেশি স্থায়ী প্রেষণাসমূহকে রেসিডিউস বলা হয়। প্যারেটো বলেন, "থার্মোমিটারের মধ্যে পারদের উঠা যেমন তাপমাত্রার বৃদ্ধিকে প্রকাশ করে তদ্রুপ রেসিডিউস মনোভাব ও প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করে।"[৩৬৯] রেসিডিউসের প্রকারভেদের আলোচনায় প্যারেটো ৫২ প্রকার রেসিডিউস রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তবে এদের মধ্যে ছয় প্রকার রেসিডিউস প্রধান। প্যারেটো তাঁর 'সারকুলেশন অব্ এলিট' মতবাদের ব্যাখ্যায় দুই প্রকার রেসিডিউসের উপস্থিতি শাসনকারী এলিটদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক বলে দাবি করেন। এ দুই প্রকার রেসিডিউস হলো- 'সমন্বয়ের প্রবৃত্তি

---

[৩৬৭] শাসনকার্যে যারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত তাদেরকে বলা হয় 'শাসনকারী এলিট'। আবার যারা শাসনকার্যে কোনো রকমের ভূমিকা পালন করে না অথবা অংশগ্রহণ করেনা তাদেরকে বলা হয় 'অশাসনকারী এলিট। (দ্র. মোঃ নূরুজ্জামান, চিরায়ত সমাজচিন্তা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০)

[৩৬৮] মোঃ নূরুজ্জামান, চিরায়ত সমাজচিন্তা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

[৩৬৯] Vilfredo Pareto, The Mind and Society: A Treatise on General Sociology, Translated by Andrew Bongiorno and Arthur Livingston, Dover ublications Inc., New York, 1935), p. 511.

ও গতানুগতিকতার প্রবৃত্তি'।[৩৭০] তিনি এলিটদের ক্ষমতা হাতবদলের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, রেসিডিউসের প্রবলতার তারতম্যের জন্যই এই পরিবর্তন ঘটে। শাসনকারী এলিটদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির রেসিডিউস প্রবলভাবে বিরাজমান থাকে। কিন্তু শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণির রেসিডিউসও আবশ্যক। অশাসনকারী এলিটদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির রেসিডিউস প্রবলভাবে বিরাজমান থাকে। ফলে কখনো বল প্রয়োগের মাধ্যমে আবার কখনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় শাসনকারী এলিটদের হটিয়ে তারা ক্ষমতায় আসীন হয়। প্যারেটোর শাসনকারীদের এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যার সাথে ইবনে খালদুনের রাজবংশের উত্থান, বিকাশ ও পতনের ব্যাখ্যার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তিনি আসাবিয়াকে রাজবংশের উত্থান, বিকাশ ও পতনের মূল কারণ হিসেবে অভিহিত করেন। এই শক্তির গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্যই নির্ধারণ করে কোনো গোত্রের বা রাজবংশের উত্থান ও পতন। প্যারেটোর মতানুসারে রেসিডিউসের গুণগত পরিবর্তন এলিটদের মধ্যে পরিবর্তন বয়ে আনে, শাসনকারী এলিট অশাসনকারী এলিটে পরিণত হয়। আবার অশাসনকারী এলিট শাসনকারী এলিটে পরিণত হয়। মানুষের যৌথ আর এই আসাবিয়া ইবনে খালদুনের সমাজ দর্শনের মূল্য প্রত্যয়। তেমনই প্যারেটো মানুষের ক্রিয়াকলাপের যে বর্ণনা প্রদান করেছেন সেখানে রয়েছে রেসিডিউস। এরই প্রভাবে মানুষের বিভিন্ন কার্যাবলি সংঘটিত হয়, পালাবদল হয় সামাজিক শক্তির, পরিবর্তন হয় শাসকগোষ্ঠীর। ক্ষমতায় পালাবদলের কার্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ খালদুনের এ ব্যাখ্যা গণিতের সূত্রের মতো সত্য বলে প্রমাণিত না হলেও সমাজ, রাজবংশ, রাষ্ট্র ইত্যাদির উত্থান, বিকাশ ও পতনের যে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেছেন সমকালীন সমাজদার্শনিকদের অবদানের প্রেক্ষাপটে বিচার করলেও তা অনেক মূল্যবান।[৩৭১]

ইবনে খালদুন ও ম্যাকিয়াভেলি

ইবনে খালদুনের মৃত্যুর এক শতাব্দীরও বেশ কিছু পরে ইতালীয় এক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও রাজনীতিজ্ঞ নিকোলাই ম্যাকিয়াভেলি 'The Prince' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইসলামী চিন্তাধারায় ইবনে খালদুনের 'মুকাদ্দিমা' যে স্থান দখল করে আছে ম্যাকিয়াভেলির এই গ্রন্থখানিও পাশ্চাত্য ভাবধারায় ঠিক অনুরূপ উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত। ইবনে খালদুনের রচনার ন্যায় এটিও বিপুল তথ্য ও মৌলিকত্বের পরিপূর্ণ একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক গবেষণাগ্রন্থ।

---

৩৭০ Ibid, p. 516-17.

৩৭১ মোঃ নূরুজ্জামান, চিরায়ত সমাজচিন্তা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ততটা সাদৃশ্য না থাকলেও 'মুকাদ্দিমা' 'দি প্রিন্স'-এর মধ্যে নীতিগত সাদৃশ্য অনেক। বিশেষত যে অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে এ দুই পুস্তকের সৃষ্টি, তা বাদেও ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে উভয় লেখকের গভীর অনুভূতির মিল রয়েছে এবং সর্বোপরি ব্যাখ্যা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলির প্রমাণ সরবরাহে উভয়ের ক্ষমতার বিরাট সাদৃশ্যও বিদ্যমান।

উভয় গ্রন্থের পর্যালোচনায় বিশিষ্ট সাংবাদিক আখ্‌তার-উল্‌-আলম বলেন, "ইবনে খালদুন মালমসলা, তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহে এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে ইতালীয় দার্শনিকদের চেয়ে ছিলেন অধিকতর সমৃদ্ধশালী ও ভাগ্যবান। সমাজকে তিনি সাধারণ পটভূমিতেই বিচার করতেন। সমাজের সকল বৈশিষ্ট্যকে তিনি পর্যবেক্ষণের উপাদান হিসেবেও বিবেচনা করতেন। ইতিহাসের আলোকে তিনি সমাজের বৈশিষ্ট্য ও ঘটনাবলি অনুধাবন ও বিশ্লেষণের চিন্তা করতেন। এভাবেই প্রতিক্রিয়ার সামঞ্জস্য ও ফলাফলের সাদৃশ্য পর্যবেক্ষণ করে তিনি সমাজ সংক্রান্ত নিজস্ব নীতি ও মতবাদ গড়ে তুলতে ও প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে ম্যাকিয়াভেলির পর্যবেক্ষণ ছিল– শুধুমাত্র রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র প্রাচীন গ্রিস ও রোমান ইতিহাসে উল্লেখিত রাষ্ট্র এবং তাঁর সমসাময়িক যুগের ইতালীয় রাষ্ট্রের উপর পর্যবেক্ষণ নিবন্ধ রেখেছিলেন। পক্ষান্তরে ম্যাকিয়াভেলির পর্যবেক্ষণ ছিল শুধুমাত্র রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে তিনি শুধু প্রাচীন গ্রিস ও রোমান ইতিহাসে উল্লিখিত রাষ্ট্র এবং তাঁর সমসাময়িক যুগের ইতালীয় রাষ্ট্রের উপর পর্যবেক্ষণ নিবন্ধ রেখেছিলেন। এছাড়া তিনি কোনো রাজপুত্র বা বিজয়ী কোনো শাসকের, কোনো ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্বের ভালো-মন্দ গুণাবলি এবং সেই গুণাবলির মাধ্যমে গড়ে ওঠা সরকারের অবস্থা পর্যালোচনা করেছিলেন। ইবনে খালদুনের বিস্তৃত পর্যবেক্ষণের তুলনায় ম্যাকিয়াভেলির এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত সংকীর্ণ। অন্যথায় ম্যাকিয়াভেলির গোটা পর্যবেক্ষণ ইবনে খালদুনের বিস্তৃত পর্যবেক্ষণের অংশবিশেষ মাত্র। 'মুকাদ্দিমা'র প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইবনে খালদুন রাষ্ট্রের সাধারণ অবস্থা, রাজ্য শাসন, রাজকীয় কার্যক্রম সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তাই ম্যাকিয়াভেলির গোটা আলোচনা জুড়ে রয়েছে। তাছাড়া এতদসংক্রান্ত আলোচনার পরিধি অল্প হওয়া সত্ত্বেও ইবনে খালদুন ম্যাকিভেলিকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছেন। স্বল্প আলোচনাতেই ইবনে খালদুন 'রাষ্ট্রের শক্তি' ও 'রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব' তথা আসাবিয়্যাহ মতবাদ আবিষ্কার করতে এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে সক্ষম হন। পক্ষান্তরে যুক্তি ও ব্যাখ্যার চাতুর্য ও

কৌশলে, প্রতিপাদ্য প্রমাণে এবং আঙ্গিকে সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলীকে ইবনে খালদুন ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন।”[৩৭২]

ম্যাকিয়াভেলির ‘দি প্রিন্স’ রচিত হয় ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে।[৩৭৩] ফ্লোরেন্সের যুবরাজ লোরেন্স দ্য মেডিকির নামে এটি উৎর্গ করা হয়। যুবরাজের উদ্দেশ্যেই এ পুস্তক লিখা হয়। ম্যাকিয়াভেলি এতে সমসাময়িক যুগের যুবরাজদেরকে জ্ঞান দান করা ছাড়াও সর্বোত্তম সরকারের গঠন-পদ্ধতি ও প্রজাসাধারণকে সর্বোত্তমভাবে শাসন করার পন্থা বর্ণনা করেছেন। কুটনীতির বলে যুবরাজ কিভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে, ধর্মীয় পার্থিব রাষ্ট্র, সেনাবাহিনী, ভাড়াটে সৈন্য ও যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে তিনি বর্ণনা দিয়েছেন। এসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র রাজপুত সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলির দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

‘দি প্রিন্স’ গ্রন্থে আলোচিত বিষয়াবলির আলোকে বিচার করলে দেখা যায়, ইবনে খালদুনেরও বহুপূর্বে মুসলিম চিন্তাবিদগণ যে সকল বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন, সেসব বিষয় নিয়েই ম্যাকিয়াভেলি তাঁর ‘দি প্রিন্স’ গ্রন্থে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। অর্থাৎ হিজরির তৃতীয় শতক থেকে ‘রাজতন্ত্রীয় রাজনীতির’ এ বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। মুসলিম চিন্তাবিদদের হাতে রাজনীতি সম্পর্কিত ধারণার ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। বস্তুত ম্যাকিয়াভ্যালি যে বক্তব্য পেশ করেছেন, তাঁর সাথে হিজরি তৃতীয় শতকের শেষভাগের মুসলিম চিন্তাবিদদের রাজনীতি সম্পর্কিত গবেষণা ও আলোচনার তুলনা করা যেতে পারে। ইবনে কুতাইবা (৮২৮-৮৮৯ খ্রি.)[৩৭৪] তাঁর ‘উইয়ুল আল-আখবার’ গ্রন্থে। আল-মাওয়ার্দী তাঁর ‘আল-আহকাম আল-সুলতানিয়্যাহ’ গ্রন্থে, আল-তারতুশী[৩৭৫] তাঁর সিরাজ-আল-মুলক’

---

৩৭২ আখ্তার-উল্-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

৩৭৩ M. Machiavelli: The Prince, Florentine History, p. 2-3.

৩৭৪ আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম ইবনে কুতাইবা কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। কুরআন, হাদিস, ইতিহাস, আরবী সাহিত্য দর্শন, কবিতা ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতিসহ তিনি ঐ যুগের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচনাবলীর উল্লেখযোগ্য হল- কিতাব-আল-মায়ারিফ, কিতাবুল শিরওয়াল শুয়ারা, আদব-আল কাতিব, কিতাব আল-ইমামাহ ও উয়ুনুল আখবার প্রভৃতি। ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর কিতাবুল মায়ারিফ গ্রন্থটি আরব ইতিহাসের অন্যতম উৎকৃষ্ট ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, একে বিশ্ব ইতিহাসের বিশ্বকোষ (Encyclopedia of World History) বলা হয়। (E.J. Brill's, First Encyclopedia of Islam, Vol. III, 1987, p. 399; R.A. Nicholson, Literary History of the Arabs, reprint: Delhi, 1994, p. 346; ড. মো. আখতারুজ্জামান, মুসলিম ইতিহাসতত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৯)

৩৭৫ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালফ আত্-তারতুশী খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের স্পেনীয় ধর্মতত্ত্ববিদ। তিনি মালেকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২০।)

গ্রন্থে ইমাম গাযালী তাঁর 'আল-তিব্ব আল-মাসবুক' গ্রন্থে এবং ইবনে আল-তিকতাকা তাঁর আল-আদাব আল-সুলতানিয়া' পুস্তকে এসব বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের সাধারণ অবস্থা পর্যবেক্ষণের কালেও ইবনে খালদুন একই বিষয়ের অবতারণা করেছেন এবং সার্বভৌমত্ব ও তার প্রকারভেদ, খিলাফত ও ইমামতের অর্থ, শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবিধ মতবাদ এবং সর্বশেষ রাজকীয় কার্যক্রমের ব্যাপারেও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৩৭৬]

ম্যাকিয়াভেলি ইবনে খালদুন কিংবা অন্য কোন মুসলিম চিন্তাবিদদের রাজনীতি বিষয়ক রচনাবলির সাথে পরিচিত ছিলেন কি না, তা জানা যায় না। তবে স্পেনের মুসলমান ও উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের মধ্যে অনেক আগে থেকেই হলেও সাংস্কৃতিক একটা যোগসূত্র বিদ্যমান ছিল এবং ইতালীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের সাথেও ছিল। তাছাড়া মুসলমানদের বহু রচনাই ইতালি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলি মুসলিম লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ধারণা অমূলক নয়।[৩৭৭]

ইবনে খালদুনের সাথে অন্যান্যদের চিন্তাধারার পার্থক্য

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ইবনে খালদুনের চিন্তাধারার বৈপরীত্য হলো তাদের চিন্তাধারায় মানবসমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকের প্রতি তেমন কোন ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু ইবনে খালদুন ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে সেটাকে বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন অর্থাৎ তাঁর চিন্তাধারায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি সমাজের উৎপত্তির মূল কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, সৃষ্টি ও মহান আল্লাহ তায়ালার খিলাফতের (প্রতিনিধিত্বের) দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্যই মূলত সমাজের প্রয়োজন। কেননা সমাজ না থাকলে রবের খিলাফতের দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয় মানব সভ্যতার গতি-প্রকৃতির উপর আবহাওয়া ও ভৌগোলিক আবেষ্টনীর প্রভাবের কথা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের প্রভাবের কথা কেবলমাত্র ইবনে খালদুনের

---

৩৭৬ মুকাদ্দিমা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬-১৬০।

৩৭৭ Cariti's Bibliotneca Arabo Hispana Escurialensis, Vol. I, p. 172.

চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হয়েছে। তদুপরি উন্নতি ও অবনতির মূল স্বাভাবিক শাশ্বত নীতি-নিয়মের অনুধাবনেও তিনি অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।[৩৭৮]

ইবনে খালদুনের মতে, গোত্রীয় বা নাগরিক জীবন উভয় ক্ষেত্রেই দু'টি প্রভাবশালী শক্তি সদা-ক্রিয়াশীল। আদিম ও মৌলিক শক্তিকে তিনি আসাবিয়া অর্থাৎ বন্ধনের উপাদান হিসেবে মনে করতেন। এটা এমন একটা অনুভূতি যা পরিবারের, গোত্রের, জাতির বা সাম্রাজ্যের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে। আধুনিক অর্থে যাকে বলা হয় স্বদেশপ্রেম। আসাবিয়াকে রাষ্ট্রের মৌলশক্তি বলা যায়, যার অবর্তমানে রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। ইবনে খালদুন ধর্মকে শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে উল্লেক করেছেন। ধর্মের প্রভাব অসীম এবং খালদুন মনে করেন যে, ধর্মের প্রভাব না থাকলে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুন বলেন, ধর্মীয় প্রেরণার উদ্দীপিত না হলে আরবদের পক্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো না।

তৃতীয় ইবনে খালদুনের চিন্তাধারার একটি ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য হল- তিনি ইতিহাসে সমাজবিজ্ঞানের মূলসূত্র প্রয়োগ করে ঘটনাপ্রবাহকে বিচার-বিশ্লেষণ করার সার্থক প্রয়াস পেয়েছেন। M. M Sharif বলেন- "It is ruism to repeat that Ibn Khaldun's contribution in connecting history with sociology has been outstanding."[৩৭৯]

তিনি উল্লেখ করেন যে, ইতিহাস নিরস ঘটনাপঞ্জি নয়। শুধু রাজা-বাদশাহর জয়-পরাজয় ও বিভিন্ন বংশের উত্থান-পতনের কাহিনি নয়; বরং ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহে মানব সমাজের অগ্রগতির ছন্দ ধরা পড়ে এবং সমাজ বিবর্তনের ধারায় ব্যাপারটি ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মাধ্যমে ফুটে ওঠে। এ তত্ত্ব ইবনে খালদুন স্বার্থকভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন যে, ভৌগোলিক ও ভূ-তাত্ত্বিক সার্থক বিশ্লেষণের উপর মানবসভ্যতার এমন অনবদ্য ব্যাখ্যাকার আর দেখা যায় না।

ইবনে খালদুনের মতে, মানুষ স্বরূপতই সামাজিক; কারণ, সে তার প্রয়োজন মেটানোর, তথা অপরের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য অন্যান্য মানুষের ওপর আক্রমণপ্রবণ ব্যক্তিদের বিরত রাখে অপরের অধিকার ও নিরাপত্তার ওপর হস্তক্ষেপ থেকে। এভাবেই

---

[৩৭৮] P.K. Hitti: History of the Arabs, Macmillan, London, Tenth Edition, 1970, (Reprint-1991), P. Lxxxi, footnote.

[৩৭৯] M.M. Sharif, A history of Muslim philosophy (Germany, 1866), p. 1258.

আবির্ভাব ঘটে রাজতন্ত্রের (আল-মুলক)। রাজতন্ত্র যথার্থই একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বটে। তবে প্রতিষ্ঠা হিসেবে তা সর্ব্বোচ্চ কিংবা সর্বোত্তম নয়। কারণ, নবুয়তের স্থান ও মর্যাদা রাজতন্ত্রের চেয়ে অনেক উঁচু। শুধু ধর্মবেত্তারাই নয়, দার্শনিকদের অনেকেও নবুয়তের বাস্তবতা স্বীকার করেছেন। তবে অধিকাংশ স্কলস্টিক ধর্মতাত্ত্বিকের ন্যায় ইবনে খালদুনও নবুযতের বৈধতা ও উপযোগিতাকে যুক্তি প্রমাণের আওতাবহির্ভূত বলে মনে করেন। আর তা করেন বলেই তিনি বলেছেন যে, নবুয়তের বৈধতা অনুসন্ধানের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হবে ধর্মীয় আইনের ওপর।[৩৮০]

ইবনে খালদুন আল-ফরাবি ও ইবনে সিনার নবুয়ত বা ধর্মতন্ত্র বিষয়ক মতের ভ্রান্তিসমূহ আলোচনা করেন। প্রথমত, এমত রাজনৈতিক ক্ষমতার ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেছে এবং আরও উপেক্ষা করেছে এ সত্যকে যে, রাজার কর্তৃত্ব প্রায়শই বলবৎ করা হয় শক্তিবলে, কিংবা এ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত গোত্রীয় ঐক্যের ভিত্তির ওপর। এজন্যই এ থেকে অধিকাংশ সময় যেসব সরকারের উদ্ভব ঘটেছে, সেগুলো স্রেফ প্রাকৃতিক বা বুদ্ধিপ্রসূত। এই প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক রাজতন্ত্রের ভিত যেসব আইনের ওপর রচিত সেগুলো মানুষের গড়া বৌদ্ধিক আইন। পক্ষান্তরে ধর্মীয় বা ধর্মতাত্ত্বিক সরকার পরিচালিত হয় ঐশ্বরিক আইন দ্বারা, এমন ধরনের আইন যেগুলো বলবৎ হয় নবী কিংবা তাঁর উত্তরসূরি খলিফা দ্বারা।

তাছাড়া প্রাকৃতিক রাজতন্ত্র মানুষের শুধু প্রাকৃতিক বা পার্থিব প্রয়োজনই মেটাতে পারে। কিন্তু মানবজীবনের রয়েছে ইহলৌকিক জীবনের প্রারম্ভস্বরূপ, যেখানে অর্জিত হবে তার দীর্ঘস্থায়ী সুখ ও পরম শান্তি। এ থেকে বোঝা যায়, একমাত্র ধর্মতান্ত্রিক সরকারের কল্যাণেই নিশ্চিত হতে পারে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ। সুতরাং ধর্মতান্ত্রিক সরকার যে প্রাকৃতিক রাজতন্ত্রের চেয়ে উৎকৃষ্ট তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

মানবিক সঙ্ঘের বিভিন্ন রূপ, জনসংখ্যার বণ্টন, রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, এমনকি ব্যক্তিগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়ে থাকে জলবায়ু, ভূগোল, অর্থনীতি প্রভৃতি বিবিধ কারণ দ্বারা। উষ্ণতা ও শীতলতা, খাদের প্রাচুর্য বা অভাব প্রভৃতি জলবায়ুগত ও অর্থনৈতিক কারণ গোটা জনগোষ্ঠীর দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে থাকে। এজন্যই দেখা যায়, উষ্ণমণ্ডলের অধিবাসীরা অধিকতর আবেগপ্রবণ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে অপেক্ষাকৃত কম উদ্বিগ্ন থাকে। অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চলের অধিবাসীরা ভাবগম্ভীর ও শান্ত প্রকৃতির হয়ে

---

[৩৮০] ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

থাকে। যেসব অঞ্চলে খাদ্যের প্রাচুর্য বিদ্যমান, সেখানকার জনগণ সাধারণত কোমলমনা, আরামপ্রিয় ও আমোদী স্বভাবের হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যেসব অঞ্চলে খাদ্যের অভাব লেগে থাকে সেখানকার মানুষ মিতব্যয়ী, কর্মঠ ও ধর্মপ্রাণ হয়ে থাকে।

অধ্যাপক স্মিথ বলেন, ধার্মিক মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ইবনে খালদুন অগাস্ট কোঁতে, টমাস বাকল[৩৮১] বা হার্বার্ট স্পেনসারের[৩৮২] মতোই দার্শনিক ছিলেন। তাঁর ইতিহাস-দর্শন হেগেলের[৩৮৩] রচনার মত নিছক ধর্মতত্ত্ব ছিল না। যদিও ইবনে খালদুনের ইতিহাসে বহুবার কুরআনের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তথাপি সে উদ্ধৃতি হয়েছে যথার্থ। যুক্তির প্রাখর্য বা অতিরিক্ত কোনো যুক্তি প্রদর্শনের জন্য এসব উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়নি। এসব বিষয়বস্তু যে পবিত্র কুরআনের দ্বারা সমর্থিত, কেবলমাত্র তাই দেখানো হয়েছে।[৩৮৪]

ইবনে খালদুনের চিন্তাধারার সঙ্গে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও যুক্তির নিরিখে সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর চিন্তাধারা অনাগতকালেও প্রযোজ্য। ইবনে খালদুন পবিত্র-কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাঁর মত আলোচনার চেষ্টা করেছেন। এজন্য তাঁর চিন্তাধারা বর্তমান সময়েও প্রযোজ্য।[৩৮৫]

---

[৩৮১] টমাস বাকল, ইংরেজ ঐতিহাসিক। ইংরেজ সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ সুপরিচিত (১৮২১-৬২)।

[৩৮২] স্পেনসার, ইংরেজ দার্শনিক। বিবর্তনবাদের প্রতিষ্ঠাতা (১৮২০-১৯০৩)।

[৩৮৩] হেগেল, জার্মান দার্শনিক। তিনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিক দর্শনের উপর গবেষণা করেছেন (১৭৭০-১৮৩১)

[৩৮৪] N. Smid: Ibn Khaldun, Historian, Socialisth and Philosopher (New York, 1930), p. 26.

[৩৮৫] মো: শরিফুল ইসলাম, সমাজ বিজ্ঞান ও ইবনে খালদুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর-১৯৯৮, পৃ. ৯২-৯৩।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
ইবনে খালদুন সম্পর্কে আধুনিক দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের অভিমত

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীগণ বহু দিক দিয়েই ইবনে খালদুনের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। সেজন্যই ঊনবিংশ শতকের শুরুতেই ইবনে খালদুন ও তাঁর সামাজিক আদর্শের প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিশেষ আগ্রহ ও বিভিন্নমুখী অনুরাগ দেখা যায়। অবশেষে তাঁরা সবাই মিলে উদঘাটন করতে সক্ষম হন যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিকালো ম্যাকিয়াভেলি (Machiavell), মনতেসকিউ (Montesquieu), অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ মনীষীর রচনা ও চিন্তাধারায় ইবনে খালদুনেরই ভাব প্রতি ধ্বনিত হয়েছে। ঐতিহাসিক আলোচনার অপরিহার্য অঙ্গ এই সমাজ বিজ্ঞান ও দর্শন যে পাশ্চাত্য লেখকের মৌলিক অবদান নয়, তা তাঁরা ইবনে খালদুনের রচনা পড়ে বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন।

ইবনে খালদুনের রচনাবলি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য গবেষক, মনীষী, চিন্তাবিদ লেখক ও সমালোচকগণ যেসব মতামত লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ ইবনে খালদুনের পূর্বেকার বহু মুসলিম চিন্তাবিদ সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। তবে তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের কেউই ইবনে খালদুনের স্তরের লোক ছিলেন না। ইউরোপীয়দের জন্য আগ্রহ ও কৌতূহলের বস্তু ঐসব ঐতিহাসিকদের বিষয় বিভিন্ন পুস্তকে আলোচিত হয়েছিল বলেই পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ ইবনে খালদুনের পূর্ববর্তী অনেক ঐতিহাসিকদের নানা গ্রন্থ পর্যালোচনা করেছিলেন। কিন্তু ইবনে খালদুন এক যুগে আত্মপ্রকাশ করেন, যখন ইসলামের শক্তি ও আধিপত্য ভাঙ্গন শুরু হয়েছিল। সে যুগের বিষয়াবলিতেও জানার খুব বেশি কিছু ছিল না। তাই ইবনে খালদুনের গ্রন্থাবলি কয়েক শতাব্দী ধরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে দৃষ্টির আড়ালে পড়ে থাকে।

পাশ্চাত্যে ইবনে খালদুন পরিচিত হন ১৬৯৭ সালে। এ সময় ইবনে খালদুনের জীবনী সর্বপ্রথম ইউরোপে দ্য হারবেল্টের 'বিবলিগ্রাফি: অরিয়েন্টিলি'তে প্রকাশিত হয়।[৩৮৬] এর প্রায় শতাব্দী পরে ১৮০৬ সালে ফরাসি প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ স্যাল ভেল্টার দ্য সাকি তাঁর 'ক্রেস্টোমেস্টি আরবী' নামক পুস্তকে ইবনে খালদুনের 'মুকাদ্দামা'র কয়েকটি পরিচ্ছেদ অনুবাদসহ তাঁর জীবনী প্রকাশ করেন। কয়েক বৎসর পর আবার তিনিই মুকাদ্দামার আরও কয়েকটি অংশ

[৩৮৬] আখ্‌তা-উল-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

প্রকাশ করেন। ১৮১৬ সালে তিনি তাঁর 'বায়োগ্রাফি য়ুনিভার্সিলিতে' ইবনে খালদুনের দীর্ঘতর জীবনী প্রকাশ করেন।

একই সময়ে একজন অস্ট্রীয় প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ ভন হ্যামার পার্গস্টল (Von Hammer Purgstall: Thar Hunderten der Hidschort) ইসলামী শক্তির পতন সম্পর্কে ১৮১২ সালে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। এ পুস্তকে লেখক ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রের পতন সম্পর্কীয় মতবাদ উল্লেখ করে তাকে 'আরবীয় মন্টেস্কু (ফরাসি দার্শনিক)' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি 'মুকাদ্দিমা' পুস্তকের কয়েকটি অংশও জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮২২ সনে 'জার্নাল এশিয়াটিক"-এ 'মুকাদ্দিমা' পুস্তকের বিভিন্ন অংশের বিবরণী প্রকাশ হয়। ফলে ইবনে খালদুনের রচনার মৌলিকত্ব ও চিন্তাধারার প্রাচুর্য পাশ্চাত্য মহলের অধিকতর দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। অবেশেষে কোয়ারর্টার মেরির উদ্যোগে মূল 'মুকাদ্দিমার' পূর্ণাঙ্গ আরবী টেক্সট প্রকাশিত হয়। কয়েক বছর পর দ্যা সাকি-এর ফরাসি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন। এভাবে ইবনে খালদুনের অবহেলিত এ মূল্যবান গ্রন্থ্ সমাদার লাভ করতে থাকে।[৩৮৭]

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে তার সমাজ সংক্রান্ত মতবাদ অধ্যয়ন করতে থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে পাশ্চাত্যমহল তাঁর রচনাবলি পড়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। কেননা ইবনে খালদুনের ইতিহাস গ্রন্থে এমন সব দার্শনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ ছিল, যা পাশ্চাত্য মহল কয়েক শতাব্দী পর জানতে পেরেছিল।

এতদিন ধরে মনে করা হত যে, পাশ্চাত্য গবেষকগণই সর্বপ্রথম ইতিহাস, দর্শন ও সমাজতত্ত্বের নীতি এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, সেই আবিষ্কর্তাদের বহু বহু বৎসর পূর্বে পাশ্চাত্যের আধুনিক চিন্তাধারাকে অতিক্রম করে গিয়ে ইবনে খালদুন এ বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। এসব বিষয় তাঁর পুস্তকে শুধু আলোচিতই হয় নাই, বরং বিষয়াবলিকে তত্ত্বও মতবাদ হিসেবেও যথাযথ যুক্তিতর্ক উপস্থাপনার মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তাই পাশ্চাত্য গবেষক মহল ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা ও রচনাবলী পাঠ করে বিশেষত তাঁর মুকাদ্দিমা পুস্তক পুস্তকে অমিত ধী-শক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পেয়ে তাঁকে দার্শনিক, মানবসভ্যতার বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক,

---

[৩৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

সমাজতত্ত্বের জনক এবং রাজনীতি ও অর্থনীতির অন্যতম দ্রষ্টা ও দিশারী হিসেবে মেনে নেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপরে সর্বপ্রথম যুক্তিভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার অবতারণা করার কৃতিত্ব একমাত্র ইবনে খালদুনের।[৩৮৮]

ডি বোয়েরের মতে, "ইবনে খালদুন নতুন দার্শনিক পথ নিয়ে উপস্থিত হন, যে-সম্বন্ধে এরিস্টটলেরও কোনো ধারণা ছিল না।" আর মার্গোরিলয়থের বিবেচনায় ইবনে খালদুন এরিস্টটলের ন্যায় আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেননি। তাঁর মতে, "ইবনে খালদুনের মাধ্যমে মানব বিষয়াবলি প্রাকৃতিক গতি অনুসরণ করে এবং পর্যায়ক্রমে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি ঘটে।"[৩৮৯]

জার্মান পর্যবেক্ষক ভন ওয়েসেন ডঙ্ক ইবনে খালদুনকে উচ্চতর ও মৌলিক ধী-শক্তির অধিকারী আরবীয় চিন্তাধারার আদর্শ এবং উদারনৈতিক মুসলিম চিন্তাধারার দিগন্তের শেষ নক্ষত্র বলেছেন।[৩৯০]

ফরাসি পণ্ডিত N. Nassar উল্লেখ করেছেন: "ইবনে খালদুন যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা একান্তভাবেই বা সর্বাংশে আর্থ-সামাজিক নয়; বরং মনস্তাত্ত্বিকও বটে। 'মুকাদ্দিমা'য় কেবলমাত্র সাধারণ সমাজতত্ত্বই নয়; একটি অত্যন্ত বিশদ ও প্রচ্ছন্ন সামাজিক মনস্তত্ত্ব রয়েছে। এমন স্তরকে রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব, আর্থিক মনস্তত্ত্ব, নীতিগত মনস্তত্ত্ব ও সাধারণ মনস্তত্ত্ব–এভাবে ভাগ করা যায়। এ সামাজিক মনস্তত্ত্ব ও সাধারণ সমাজতত্ত্বের মিশ্রিত বা নিবিড় সম্পর্কিত উপাদানগুলো এমন এক জটিল সামগ্রিকতা গড়ে তোলে, যা বিচ্ছিন্ন করা কঠিন।"[৩৯১]

ইবনে খালদুন সম্পর্কে সাম্প্রতিক সমালোচনামূলক পর্যালোচনাটি করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নোথালিয়েল স্মিড। তিনি তাঁর আলোচনায় ইবনে খালদুনকে ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অধ্যাপক

---

[৩৮৮] আখ্‌তার-উল্‌-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১১।

[৩৮৯] De Bore, The History of Philosophy in Islam (1903), p. 203; D.S. Margoliouth, Lectures On Arabic Historians, Calcutta, 1930, p.157.

[৩৯০] R. Maunir, Les Ideas socilogique dun philosophy arabe au xiv, sieele (L Egypt contemporaine, 1917), p. 568.

[৩৯১] N. Nassar, Lapensee Realiste d'Ibn Khaldun (Paris, 1967), p. 174..

স্মিথের মতে, ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনকে বিশ্ব-বিশ্রুত ঐতিহাসিক সিসিলির ডিওডোয়াস, দামেশকের নিকোলাস বা প্রাচীন খ্রিস্টীয় যুগের ট্রোনাস পম্পিয়াস বা অষ্টাদশ শতকের গ্যাটারার বা স্কলোজা প্রমুখের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, তথ্য প্রদান ও মৌলিক অবদান সৃষ্টিতে ইবনে খালদুন তাঁর পূর্বসূরিদের চাইতে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছিলেন। ইবনে খালদুন তাঁর রাজনৈতিক ইতিহাস ছাড়া আর কিছু অবদান রেখে গেছেন কিনা, তা বিবেচনা করার জন্য একদিকে যেমন গভীর অভিনিবেশের প্রয়োজন, তেমনি অপরদিকে প্রয়োজন উদার দৃষ্টিভঙ্গির। বস্তুত তাঁর রাজনৈতিক ইতিহাস একটি বিশেষ ঐতিহাসিক যুগের মূল্যবান তথ্যের উৎস হিসেবে পরিচিত হবেই। তবে ইতিহাসের বিস্তৃত ও পর্যাপ্ত বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা সত্ত্বেও ইবনে খালদুন বোখারী, মাসুদী, তাবারী ও ইবনেুল আসীরের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেন নাই; তেমনি যশোলাভও করেনি। পক্ষান্তরে মূল ইতিহাস গ্রন্থের মূখবন্ধ বা 'মুকাদ্দিমা' পুস্তকটিই তাঁকে চূড়ান্ত যশ ও খ্যাতির অধিকারী করেছেন। এই 'মুকাদ্দিমা' পুস্তকেই তাঁর প্রতিভার সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটেছে। এতে তিনি মানব ইতিহাসের ধারা ও প্রবাহ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ তুলে ধরেছেন।[৩৯২]

এন. স্মিথর আরও বলেন: "মানুষের সামাজিক অগ্রগতি, প্রাকৃতিক কারণের উপর নির্ভরতা, পরিবেশের প্রভাব এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উপর এসবের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও ইবনে খালদুন আলোকপাত করেছেন। এস আলোচনায় তিনি যথাযথ যুক্তি পেশ করেছেন বলেই তাঁর গ্রন্থের মর্যাদা আজও অক্ষুণ্ন রয়েছে। যেসব সভ্যতা অনতিকাল পরেই বিলুপ্ত হয়েছে সেসব সভ্যতার আলোচনা ইবনে খালদুনের রচনায় নেই বললেই চলে।[৩৯৩]

গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লুড উইগ ওমপ্লায়িজ ইবনে খালদুনের মতবাদ পর্যালোচনা করেছেন এবং আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদের সঙ্গে তাঁর মতবাদের তুলনা করেছেন। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদের সঙ্গে ইবনে খালদুনের মতবাদের সামঞ্জস্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

---

[৩৯২] N. Smid: Ibn Khaldun, ibid, p. 14.

[৩৯৩] ibid, p. 15-16

অধ্যাপক লুডউইগ গুমপ্লায়িজ বলেন, "ইবনে খালদুন কোন পরিবারের উত্থান-পতন সম্পর্কে "তিন বংশ স্তরের" যে ধারণা দেন তা এখন অটোকার লরেঞ্জের কৃতিত্বের ভান্ডারে। অথচ লরেঞ্জের অনেক আগেই আরব-দার্শনিক এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। বিস্ময়কর ব্যাপার ইবনে খালদুন সমরবিজ্ঞানের যেসব রীতি পদ্ধতি আলোচনা করেছিলেন ইউরোপীয়দের উত্থানের পুরো যুগে তাদের সেনাপতিরা সেসব রণকৌশল প্রয়োগ করেছেন। এছাড়া ম্যাকিয়াভেলি শাসকদের যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন শতবর্ষ আগে ইবনে খালদুনও তা-ই লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। অথচ তা কেউ জানত না।"

উপসংহারে বলেন- 'শুধু অগাস্ট কোঁতেরই বহু বছর আগে নয় বরং ইতালীয়গণ যে ভিকোকে জোরজবরদস্তি করে প্রথম সমাজতত্ত্ববিদদের আসনে বসাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন, তারও বহু বছর আগে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান সাফল্যের সাথে সমাজতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং এ বিষয়ে নিজের মতবাদ প্রকাশ করে গেছেন। তিনি যা লিখে গেছেন আজ সেটাই আমরা সমাজতত্ত্ব বলে মনে করি।'[৩৯৪]

ওমপ্লায়িজ যখন এ সকল মতামত প্রকাশ করেন, ঠিক সে সময় জনৈক ইতালীয় সমাজতত্ত্ববিদ ফেরিরোও ইবনে খালদুনের মতবাদ অধ্যয়ন করেছিলেন। ইবনে খালদুনকে সমাজতত্ত্ববিদ আখ্যায়িত করে তিনি খালদুনের মৌলিকত্ব ও প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়নের আহ্বান জানান।[৩৯৫]

ফরাসি সুপণ্ডিত এম. মউনিয়ার অর্থনেতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি সুদীর্ঘ নিবনেধ ইবনে খালদুনের মতামত পর্যালোচনা করেন। প্রথম প্রবন্ধটি ইবনে খালদুনের অর্থনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে ও দ্বিতীয়টি তাঁর সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে। তিনি ইবনে খালদুনকে দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা ও 'মুকাদ্দিমা' সম্পর্কে বলেন, এই পুস্তকে সার্বজনীন আইনের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর অবদান এবং সে যুগের সকল বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য বিশ্বকোষ। সমাজতত্ত্বের পূর্ণ গবেষণা ও পর্যালোচনার সাথে সাথে এতে অন্য সমস্ত বিষয়ও সন্নিবেশিত হয়েছে। পুস্তক রচনার আঙ্গিক অতীব সুন্দর, এতে নির্ভুল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ইবনে খালদুনের

---

[৩৯৪] Gumplowiex, Un Sociologiste asbe an xiveme Siecle (dans Apercus Sociologistiques) pp. 201-226.

[৩৯৫] A. Ferreiro, Un Sociologo asbe del secolo xiv. (da Rifoma sociale, 1896); আখ্তার-উল্-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

দার্শনিক ভাবধারা নিজের যুগের সীমা অতিক্রম করে ভবিষ্যতের জন্যও সকলের অগ্রগামী হয়ে রয়েছেন।[৩৯৬]

জার্মানির স্টুটগার্ট শহর থেকে ১৯০১ সালে T.J de Boer একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন যার নাম `Gesehicher Der philosophie in Islam` বইটিতে ইবনে খালদুন সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করে দ্য বোয়ের উপসংহারে বলেছেন, গবেষণার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পরবর্তীকালে অন্য কেউ গবেষণা শুরু করুক, ইবনে খালদুনের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, তবে মুসলমানদের দ্বারা তা সম্ভব হয়নি। কোন পূর্ববর্তী মনীষীকে অনুসরণ না করেই যে প্রতিভাটির আবির্ভাব ঘটেছিল, সে প্রতিভাকে অনুসরণ করতে মুসলিম সমাজে কেউ এগিয়ে আসে নি।[৩৯৭]

অর্থনেতিক দিক থেকে ইবনে খালদুনের রচনাবলি পর্যালোচনা করেছেন টিটকানো ক্লসিও। তিনি বলেন, "ইবনে খালদুন নবতর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠায় বা ইতিহাসের নিরীক্ষামূলক পর্যালোচনায় নিঃসন্দেহে ম্যাকিয়াভেলি, মন্টেস্কো ও ভিকোকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।"

ক্লসিও ইবনে খালদুন সম্বন্ধে তাঁর আলোচনায় ইতালীয় প্রাচ্যবিদ ও ঐতিহাসিক আমরীর মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, "ইবনে খালদুনই বিশ্বের প্রথম লেখক, যিনি সর্বপ্রথম ইতিহাসের-দর্শন উদ্ভাবন করেছেন।" ক্লসিও সামাজিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত ইবনে খালদুনের মতবাদটিও পর্যালোচনা করেন। এই সিদ্ধান্তটি সামনে রেখেই ইবনে খালদুনের বেদুইন ও সভ্যসমাজ সম্বন্ধে তাঁর আলোচনার সূত্রপাত করে গেছেন। বলেছেন: জীবন ধারণের প্রণালিগত পার্থক্যই বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে গড়ে তোলে।[৩৯৮]

---

[৩৯৬] R. Maunier, Les Idees economique d'un philosophe arabe au XIV, Siecle (Revue d'histoire economique et sociate, 1912); আখ্‌তার-উল্‌-আলম, ইবনে খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

[৩৯৭] T.J de Boer, Gesehicher Der philosophie in Islam, (1901), o. 177-84.

[৩৯৮] মুকাদ্দিমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

ক্লসিও বলেন, "ইবনে খালদুন একজন 'স্বভাব-অর্থনীতিবিদ' এবং তিনিই প্রথম রাজনৈতিক-অর্থনীতির মূলধারা অনুধাবন করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সাথে তার প্রয়োগ দেখিয়েছেন। পশ্চিমা গবেষকদের বহুপূর্বেই তিনি এ সকল মতবাদ আবিষ্কার করেন।"[৩৯৯]

আরলন্ড জোসেফ টয়েনবি বলেন: "Thucydides, Machiavelli and Clarendon are brilliant representatives of brilliant times and places, Ibn Khalduns is the sole point of light in his quarter of the firmament."[৪০০]

ইবনে খালদুনের সময় প্রয়োজনীয় তথ্যের অনেক অভাব ও অসুবিধা ভোগ করতে হয়, তা সত্ত্বেও সমাজ বিজ্ঞানের উপর তিনি যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছেন, তা তাঁকে সমাজ বিজ্ঞানীদের শীর্ষে স্থান দানে সক্ষম হয়েছে।

---

৩৯৯ Colosio: Contribution a Ieluded Ibn Khaldun (Revue du Monde Musulman XXVI, 1914).

৪০০ Arnold Joseph Toynbee, A Study of History, Vol. 3(London, Oxford University Press, 1935), Second Edition, p. 321.

উপসংহার

ইবনে খালদুন বর্তমান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের নিকট সমাজবিজ্ঞানের জনক এবং ইতিহাসের দর্শনের নিয়মতান্ত্রিক প্রবর্তক বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিশেষ করে তাঁর বিখ্যাত মুকাদ্দিমায় তিনি মানুষ, মানুষের সামাজিক সংগঠন, সমাজ পরিবর্তন, রাষ্ট্রগঠন, রাষ্ট্র শাসন, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পটভূমি প্রভৃতি সম্পর্কে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন এবং এগুলো তাঁর একক মৌলিক চিন্তা-ভাবনার ফসল। তিনি ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহকে সমাজ বিবর্তনের অপরিহার্য পরিণতি মনে করতেন। এগুলোর যথাযথ বর্ণনা এবং ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয় করে উপস্থাপনের মধ্যেই ঐতিহাসিক সত্য ফুটে ওঠে এবং এর মাধ্যমে মানুষ শিক্ষা লাভ করতে পারে। ইতিহাস যখন এর বৈশিষ্ট্যে সত্য ধারণ করে তখন তা জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখায় পরিণত হয়। বর্তমানে আমরা যাকে সমাজতত্ত্ব বলি তা ইবনে খালদুনের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

ইবনে খালদুনের চিন্তাজগতের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে 'মানুষ'। তিনি মধ্যযুগের একজন মানবতাবাদী দার্শনিক। তাঁর ধ্যান-ধারণা ইবনে সিনার রচনাবলির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। একজন ব্যক্তি অপরের সহযোগিতা ছাড়া এককভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না-এ ধারণায় তিনি ছিলেন গভীরভাবে বিশ্বাসী। মানুষের চিন্তাশক্তিই একে অপরকে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে মানুষ সমাজ জীবনে সাফল্য লাভ করে।

সমাজ বিবর্তনের নতুন বিশ্লেষণ প্রবর্তনের জন্য তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। ড. বুদ্ধ প্রকাশ বলেন:

"He is the inventor of the scientific method of human studies, he is the father of sociology and the originator of the philosohpy of history."[৪০১]

অর্থাৎ "তিনি একাধারে ছিলেন সমাজতত্ত্ববিদ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির স্রষ্টা, ইতিহাস দর্শনের উদ্‌গাতা।"

---

[৪০১] Kuddha Baksh, Ibn Khaldun's philosophy of history (Islamic culture, Vol xxx iii, No. 1, 1954.

ইবনে খালদুন সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের ক্ষেত্রে যে তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন তা পরিবর্তন করার মত এখনো কোন জ্ঞানগর্ভ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়নি। একজন অধ্যাপক, প্রশাসক ও বিচারক হিসেবে ইবনে খালদুন বহুমাত্রিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া শতধাবিভক্ত মুসলিম সাম্রাজ্যের অবস্থা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে মহাদার্শনিক তত্ত্ব রপ্ত করেন। যে কারণে তার দেয়া রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক প্রর্ভতি তত্ত্বগুলো একেবারে বাস্তব সম্মত এবং তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে।

ইবনে খালদুন জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে মহামূল্যবান অবদান রেখে গেছেন আজও তা শ্রদ্ধার সাথে পঠিত ও আলোচিত হচ্ছে। ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা ও জ্ঞান সাধনাকে মুসলিম বিশ্ব কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে অমুসলিমরা ঠিকই তাকে চিনতে পেরেছে। সেজন্য ইবনে খালদুনের মহান আবিষ্কারকে তারা অভিনব ও অসাধারণ বলে মনে করে। ইবনে খালদুনের প্রতিভা এবং পণ্ডিত মহল তার সৃষ্টিকর্মের প্রশংসা করতে গিয়ে অধ্যাপক রবার্ট ক্লিন্ট যথার্থই বলেছেনঃ "Aristotle, Augustine were not his peers and all others were. unworthy of being even mentioned along. with his name"

অর্থাৎ প্লেটো, এরিস্টোটল, আগাস্টাইন তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না; আর অন্যেরা তাঁর নামের সঙ্গে উল্লিখিত হওয়ার যোগ্য নন।

একথা অনস্বীকার্য যে, মধ্যযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ঐহিত্য ও সংস্কৃতির সেতুবন্ধনের কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুসম্পন্ন করেছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে মুসলমান বিজ্ঞানীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরলস প্রচেষ্টার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দ্বার উন্মোচন এবং অগ্রগতি সাধিত সাধিত হয়েছিল। জ্ঞানের যাবতীয় সকল শাখায় রয়েছে মুসলিম বিজ্ঞানীদের নিজস্ব ও মৌলিক অবদান। মুসলমান বিজ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনা, তত্ত্ব ও তথ্যগুলো ইউরোপের পুনর্জাগরণে মূল নিয়ামত শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। তাই আমাদের উচিৎ, বর্তমান ও ভবিষৎ প্রজন্মের নিকট আমাদের পূর্বপুরুষদের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরা, যেন তাঁরাও ভবিষ্যতে আরেকটি সোনালী অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিম জাতি এক ধরণের শূন্যতায় ভুগছে। এমতাবস্থায় প্রয়োজন এমন একদল চিন্তাবিদের যারা মুসলমানদের চিন্তাশীল করে তুলবে। মুসলমানদের বড় সংকটের জায়গা হচ্ছে, তারা তাদের পুর্বসূরিদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও

বুদ্ধিবৃদ্ধিক বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়। আর এই সংকট উত্তরণের উপায় হচ্ছে মুসলিম বিজ্ঞানীদের রেখে যাওয়া কাজের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-চর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করা।

পরিশেষে বলা যায় যে, জ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্রের উপর তাঁর অসমান্য অবদান ইবনে খালদুনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের আসন দান করেছে। তিনি সমাজবদ্ধ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। এই গবেষণার ফল অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে আসবে যা বর্তমান বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতিও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কাজে লাগবে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনের অবদান যুগ যুগ ধরে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

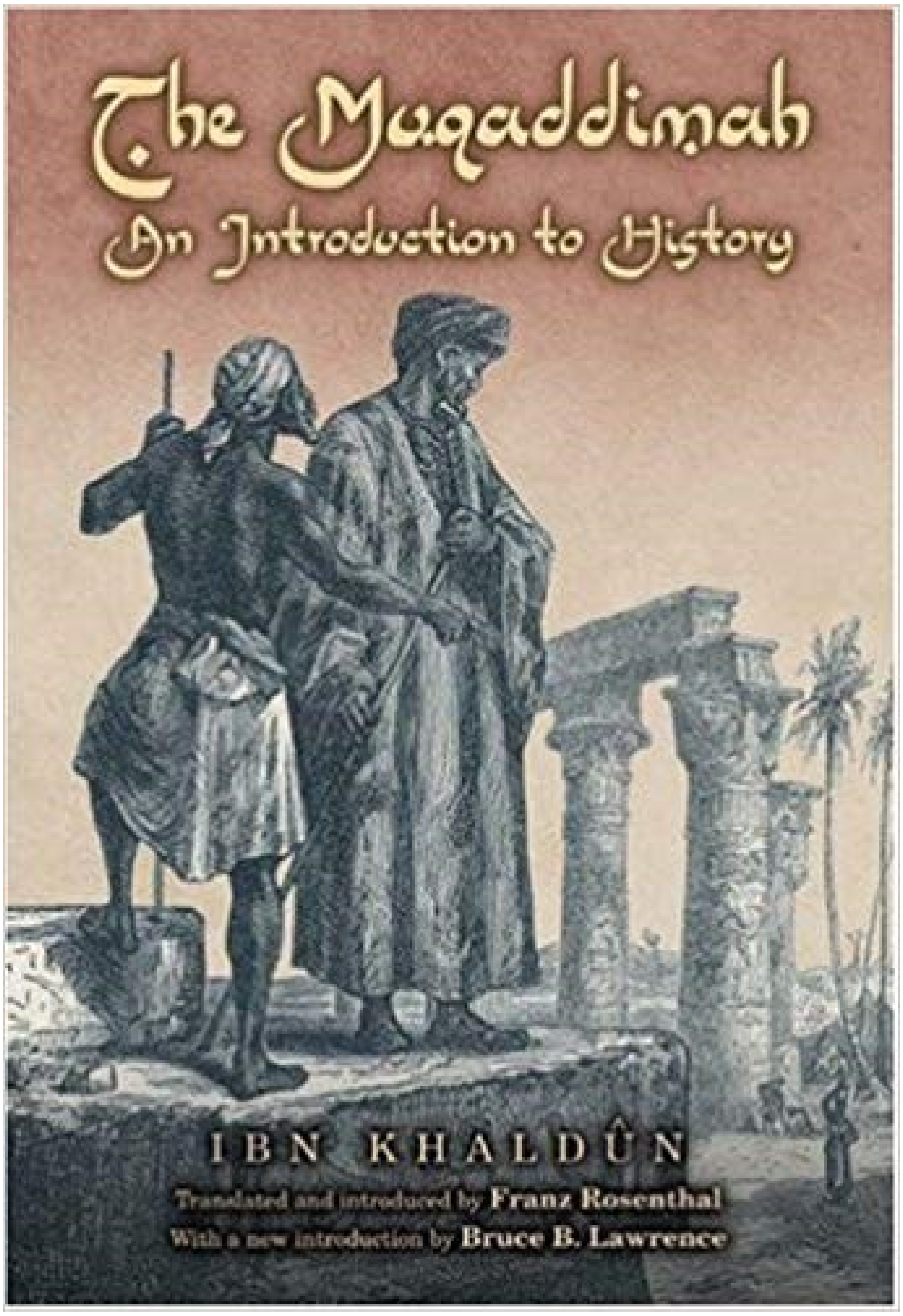

ইবনে খালদুনের ‘মুকাদ্দিমা’র ইংরেজি প্রচ্ছদ

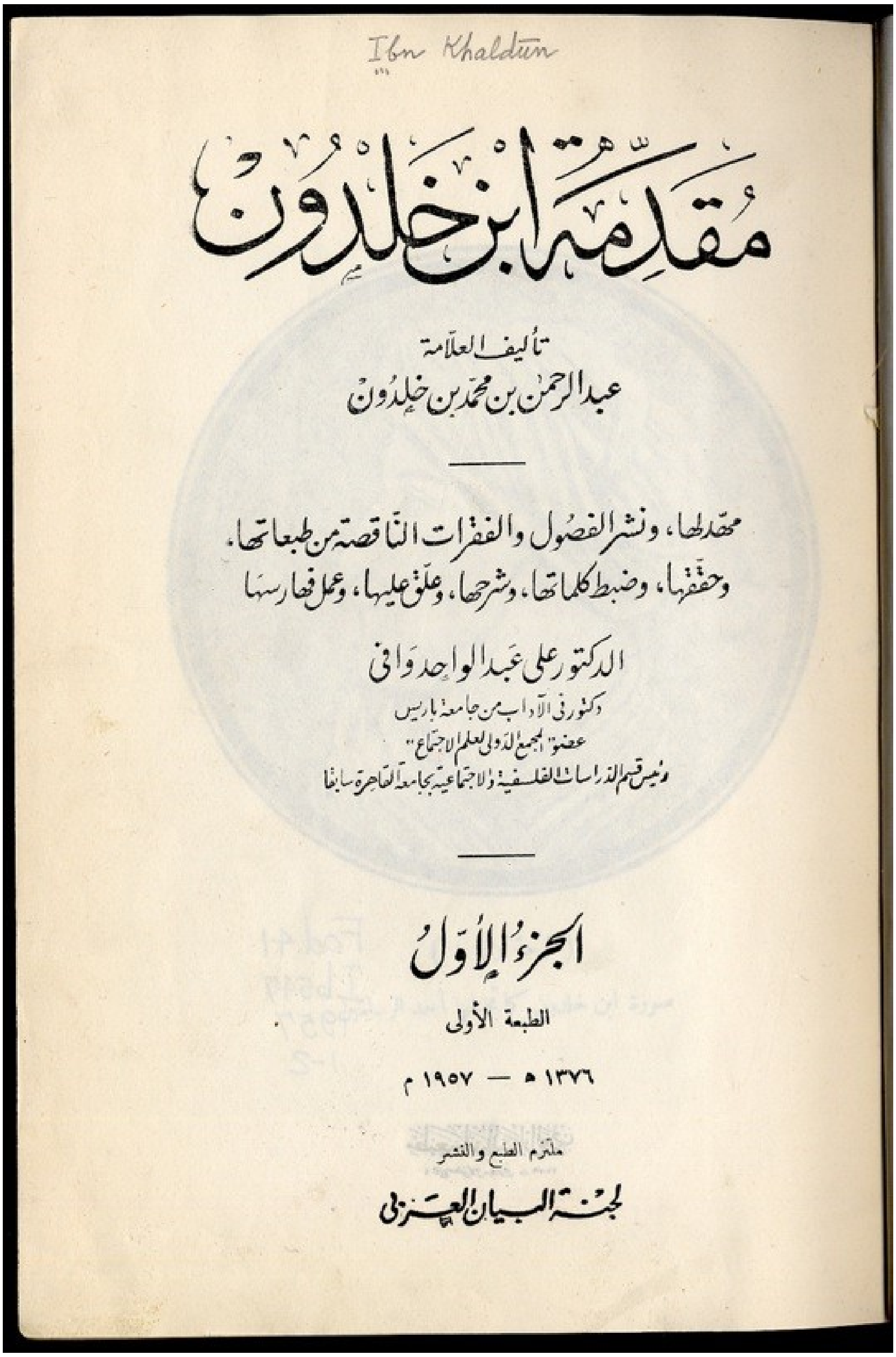

Ibn Khaldūn

مقدمة ابن خلدون

تأليف العلامة

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون

مهدلها، ونشر الفصول والفقرات الناقصة من طبعاتها،
وحققها، وضبط كلماتها، وشرحها، وعلق عليها، وعمل فهارسها

الدكتور علي عبد الواحد وافي

دكتور في الآداب من جامعة باريس
عضو "المجمع الدولي لعلم الاجتماع"
ورئيس قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية بجامعة القاهرة سابقا

الجزء الأول

الطبعة الأولى

١٣٧٦ هـ — ١٩٥٧ م

ملتزم الطبع والنشر

لجنة البيان العربي

‘মুকাদ্দিমা’র আরবী সংস্করণ

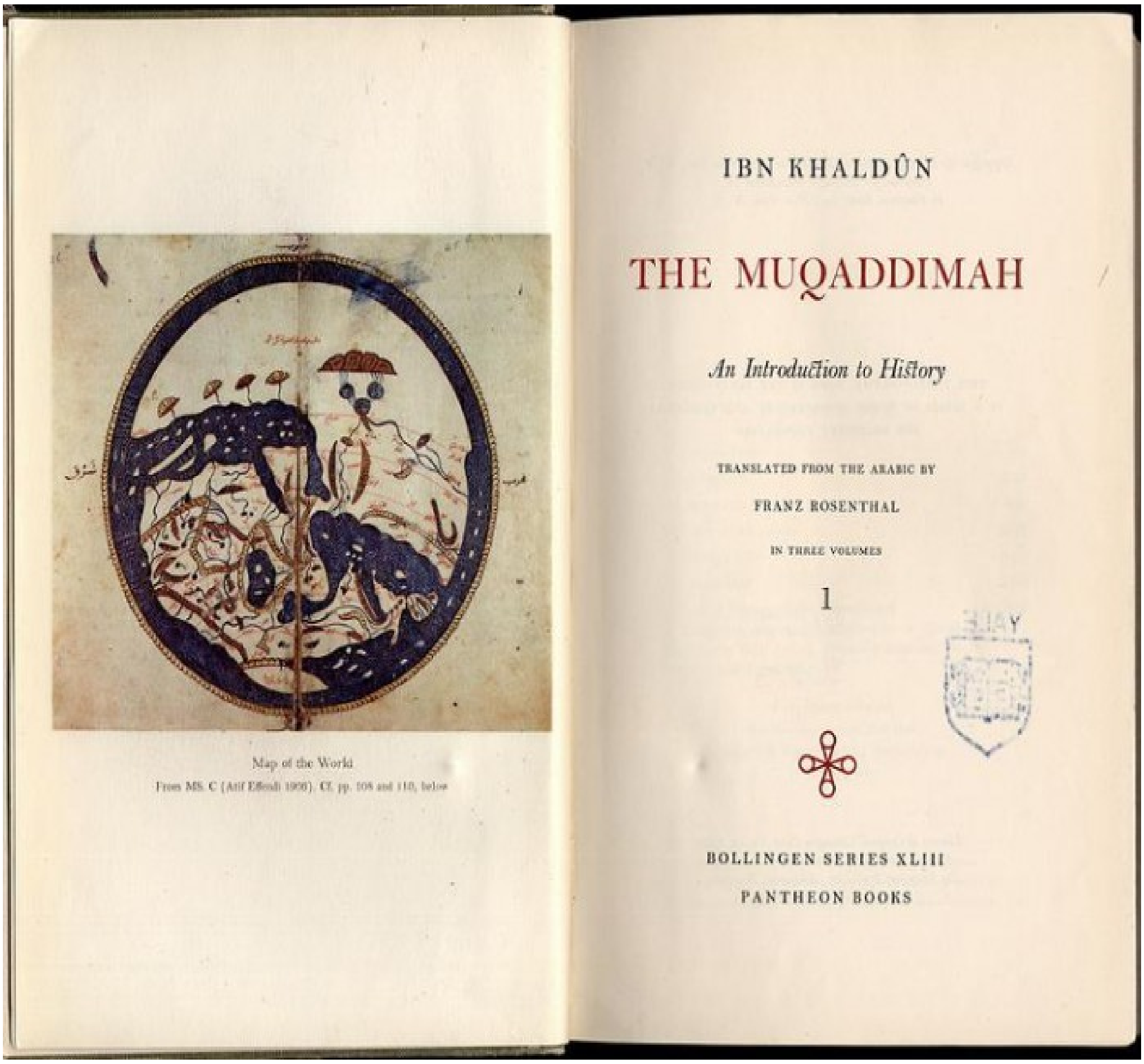

‘মুকাদ্দিমা’র ইংরেজি অনুবাদ
source: muslimheritage.com

হস্তলিখিত 'মুকাদ্দিমা'র একটি পাণ্ডুলিপি

source: muslimheritage.com

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআনুল কারীম	:	
আর্নেস্ট কুহনেল	:	ইসলামী শিল্পকলা ও স্থাপত্য, বাংলা অনুবাদ, মোসলেম আলী বিশ্বাস (চট্টগ্রাম: ১৯৭৮খ্রি.)।
আব্দুল হালিম	:	মুসলিম দর্শন চেতনা ও প্রবাহ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮খ্রি.), ১ম সংস্করণ।
আবদুল মওদুদ	:	মুসলিম মনীষা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৪খ্রি.)।
অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার	:	ইতিহাসের দর্শন (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮১খ্রি.)।
অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত ও অন্যান্য	:	সমাজদর্শন (কলকাতা: ২০০১খ্রি.), চতুর্দশ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ।
অনুপম সেন	:	ব্যক্তি ও রাষ্ট্র: সমাজ বিন্যাস ও সমাজ-দর্শনের আলোকে (ঢাকা: অবসর প্রকাশনী, ২০০৮খ্রি.)।
ই.আই.জে.	:	রোযানথাল ইবনে খালদুনস্ এ্যাটিচোড টু দি ফালাসোফা' আল আন্দালুস, ১৯৫৫খ্রি., খ. ২০, নং-১।
ইয়াহইয়া আরমাজানী	:	মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, অনুবাদ, মুহাম্মদ এনামুল হক (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮খ্রি.)।
ইব্রাহীম খাঁ	:	আরবজাতির ইতিকথা (ঢাকা : বুক ভিলা, ১৯৭০ খ্রি.)।
ইবনে খালদুন	:	মুকাদ্দিমা (কায়রো: দার আত্-তাওফিকিয়্যাহ, ২০১০খ্রি.)।
”	:	আল-মুকাদ্দিমা, অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২ খ্রি.), খ.১।
”		মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, অনুবাদ, এডভোকেট মো: মোস্তফা জামাল ভূঞা (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন, ২০১২খ্রি.)।
কে.আলী	:	মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস (ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮ খ্রি.)।
গোলাম কিবরিয়া	:	ইতিহাস তত্ত্ব (ঢাকা: সানডে পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯খ্রি.)।
ড. আহমদ আমীন		দুহাল ইসলাম (অনুবাদ), (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯৪ খ্রী.), খ. ১।

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান	:	স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম শাসনের ইতিহাস, ১ম সং, (ঢাকা: উত্তরণ প্রকাশনী, ২০০৫খ্রি.)।
ড. মোহাম্মদ গোলাম রসূল	:	মুসলিম ইতিহাস চর্চা, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, রাজশাহী, মার্চ-১৯১৪।
ড. মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান	:	মুসলিম ইতিহাসতত্ত্ব (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ খ্রি.), ১ম সংস্করণ।
ড. সেলিনা আহমেদ ও ড. খ ম রেজাউল করিম	:	সমাজবিজ্ঞান (ঢাকা: অক্ষরপত্র প্রকাশনী, ২০১৩), ১ম সংস্করণ।
ড. আমিনুল ইসলাম	:	মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন (ঢাকা: মাওলানা ব্রাদার্স, ২০১৬খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ।
ড. মঈনুদ্দীন খান ও জনাব শামসুদ্দীন	:	আল-মাওয়ার্দীর আহকাম আল-সুলতানিয়ার দৃষ্টিতে খিলাফতের রাজনীতি, ১৯৮৯।
ড. এম দেলোয়ার হোসেন	:	ইতিহাসতত্ত্ব (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুন-১৯৯৩খ্রি.)।
নাজমুল করিম	:	সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৯)।
ফজলুর রশীদ খান	:	সমাজবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব (ঢাকা: শিরীন পাবলিকেশন্স, ১৯৭৩খ্রি.), ১ম সংস্করণ।
বাল্টিমোর	:	ইনট্রোডাকশন টু হিস্ট্রি অব সায়েন্স, ১৯৪৭, খ. ৩, পার্ট-২।
মোঃ মোঃ নূরুজ্জামান	:	চিরায়ত সমাজচিন্তা (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩খ্রি.), ১ম সংস্করণ।
মোঃ আয়েশ উদ্দিন	:	রাষ্ট্র চিন্তা পরিচিতি (ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৯০খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ।
মোঃ রমজান আলী	:	ইতিহাস ও ঐতিহাসিক (ঢাকা: প্রগতি পাবলিশার্স, ২০১০খ্রি.), তৃতীয় প্রকাশ।
মাওলানা আকবর শাহ খান নজিরাবাদী	:	ইসলামের ইতিহাস, অনুবাদক মণ্ডলী কর্তৃক অনুদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২০০৩খ্রি.), ১ম সংস্করণ, খ. ২।
মুসা আনসারী	:	ইসলামী সমাজ কাঠামোর রূপান্তর ধারা; ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৯২)।
মুহাম্মদ আহ্সান উল্লাহ	:	খিলাফতের ইতিহাস, অনুবাদক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার সিদ্দিকী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০খ্রি.), ১ম সংস্করণ।
মুহাম্মদ মিনাজউদ্দিন	:	সমাজবিজ্ঞান: প্রত্যয় ও পদ্ধতি (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯১খ্রি.)।

মুহাম্মদ নূরুল আমীন	:	বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী (ঢাকা: র‍্যাকস পাবলিকেশন্স, ২০১৩খ্রি.)।
সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)	:	মাযহাব ও তামাদ্দুন (ইন্ডিয়া, জামিয়া মিল্লিয়া, ১৯৪৩খ্রি.); ইসলাম ও অন্যান্য সংস্কৃতি, লিয়াকত আলী অনূদিত (ঢাকা: ২০১১ খ্রি.)।
সৈয়দ আমীর আলী	:	আরব জাতির ইতিহাস, অনুবাদ শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯১খ্রি.), ২য় সংস্করণ।
সৈয়দ মাহমুদুল হাসান	:	স্পেনে মুসলিম সভ্যতা (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১০খ্রি.), ১ম সংস্করণ।
সেলিনা আহমেদ ও খ.ম. রেজাউল করিম	:	সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব: ধ্রুপদী ও আধুনিক (ঢাকা: মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ২০০৬খ্রি.)।
সুশোভন সরকার	:	প্রসঙ্গ ইতিহাস (কলকাতা: ১৯৮৬খ্রি.)।
শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	:	ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ (রাজশাহী, ২০০৫খ্রি.), ৪র্থ সংস্করণ।
লুই হেনরি মর্গান	:	আদিম সমাজ, বুলবন ওসমান (অনুবাদ) (ঢাকা: অবসর প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি.।
A. Bel	:	Catalogue des livres Arab es de la Bibliotheque de la Moiquee de El-Quaraviyin a Fez.
A. Ferreiro	:	Un Sociologo asbe del secolo xiv. (da Rifoma sociale, 1896).
A.J. Toynbee	:	A Study of History, (London: Oxford University press, 1962), Reprint, Voll III.
”	:	A Study of History, Vol. 3(London, Oxford University Press, 1935), Second Edition.
Abdur Rahman al-Sakawi	:	al-Ilam bit-tawbik li-man dijamma ahl at tawrik (i.e. the open denunciation of the adverse critics of the historians) eng. tr. F. Rosental, A History of Muslim Historiography, Lieden, 1952.

Arnold W. Green : Sociology: An Analysis of life in Modern Society (New York, St. Louis, 1968), Fifth Edition

Alfred Gierer : æIbn Khaldun on Solidarity (Asagbiyah)-Modern Science on Cooperativeness and Empathy: a Comparison," Philosophia Naturalis, Vol. 38.

Al-Kafij : Mukhtasar fi ilm al-tarikh, text and english translation in F. rosenthal, A History of Muslim Historigraphy, Leiden 1952.

Abdul Latif al-Bagdadi : Kitab al-lfidah Wa'IItibar (Kamal Hafuth Zand & others, Trans. Eastern Key, George Allen & Unwin, 1965).

Allen J. Fromherz : Ibn Khaldun, Life and Times (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010).

Aziz Al-Azmeh : Ibn Khaldun: An Essay in Reinterpretation (London: Frank Cass & Company Ltd., 1982).

Charles Issawi : An Arab Philosophy of History, John Murry (London: 1963).

Colosio : Contribution a Ieluded Ibn Khaldun (Revue du Monde Musulman XXVI.

D.S. Margoliouth : Lectures On Arabic Historians, Calcutta, 1930.

De Bore : The History of Philosophy in Islam (1903)

Durant Will : The Age of Faity (Simon & Schuster, 1950).

Doyle Paul Johnson (1981) : Sociological Theory: Classical Founders and Contemporary Perspectives, John Wiley Press.

Dieter Weiss : æIbn Khaldun on Economic Transformation”, Int. J. Middle East Stud. 27., 1995.

E. I. J. Rosenthal : Political Thoght in Medieval Islam (U.S.A.: Cambridge University press, 1958).

” : Political Thoght in Medieval Islam: An Tntroductory Outline (U.S.A.: Cambridge University press, 1962).

Earnest Barker : The Politics of Aristotle (London: Oxford, 1961)

Emile Durkheim : Suicide: A Study in Sociology, Translated by John, A Spauding and George Simpson, Routledge & Kegan Paul, Ltd., 1952.

” : The Division of Labour in Society (New York: Free Press, 1839/1964).

Al-Farabi : Kitab al-Siyasah al-Madaniyyah.

” : Kitab are’ahl al-Madinah al-Fadilah, 3rd ed. Bir Nasir Nadir, (Beirut, 1973)

F. H. Giddings : Principles of Sociology (India: Cosmo Publications, 2004)

Franz Rosenthal : Polilitical Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline (Cambridge: At the University Press, 1968).

” : The Muqaddimah, Translation from the Arabic (London: 1958).

Fromherz, J. Allen : Ibn Khaldun, Life and Times (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010).

George Sarton : Introduction to the History of Science, Vol. III (baltimore: The Williams and Wilkins Company, 1948).

Gumplowiex : Un Sociologiste asbe an xiveme Siecle (dans Apercus Sociologistiques).

H Elmar Bames : Social Institutions (New York: Prentice Hall, 1946).

H.K. Sherwani Studies in Muslim Political Thought and Administration, (Lahore, Review, 1963).

” Studies in Muslim Political Thought and Administration, (Lahore, Review, 1965).

Hellmut Ritter : æIrrational Solidarity Groups: A Sociophyshological Study in connection with Ibn Khaldun”, Oriens, Vol. 1, 1948.

R.A. Nicholson : Literary History of the Arabs, reprint: Delhi, 1994.

Ibn Khaldun : The Muqaddimah An Introduction to History, trans. Frans Rosenthal, Vol. I, II, III, Bollingen Series XLII (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980).

” : Ibn Khaldun, The Muquaddimah: An Introduction to History, Translated fro the Arabic by Franz rosenthal, Vol. 1, Routledge & Kegan Paul, London, 1967.

James Krizeck ed.	:	Anthology of Islamic Literature, 1964.
Jean David C. Boulakia	:	Ibn Khaldun: Last Greek and the First Annaliste Historian, Int. J. Middle East Stud, No. 38.
M. Saeed Shiekh	:	Studies in Muslim Philosophy (Lahore: Pakistan Philosorphica Congress, 1962)
Kimball Young and Raymond W. Mack	:	Principles of Sociology, Eurasia Publishing house (Ned Delhi).
Kingsley Davis	:	Human Society (New York: Macmillan).
Linda T. Darling	:	Social Cohesion (Asabiyya) and Justice in the Late Medieval Middle East", Coimparative Studies in Society and History, Vol. 49, No. 2, 2007.
M.M. Sharif	:	A history of Muslim philosophy (Germany, 1866).
Mackensen, Ruth Stellhorn	:	Background of the History of Muslim Libraries (American Journal of Semitic Languages, II, 1937).
Margart Wilson Vine	:	An Introduction to Sociological Therory, 1959.
Max Weber	:	Economy and Society, Totowa, N.J. Bedminister Press, 1968.
Mohammad Abdullah Enan	:	Ibn Khaldun: His Life and Works (New Delhi: Kitab Bhaban, 1997).

Mohsin Mahdi : Ibn Khaldun's Philosophy of History, University of Chittagong Press (U.S.A. Phoenix edition, 1964).

" : Ibn Khaldun's Philosophy of History (USA: University of Chicago Press, 1964).

" : Ibn Khaldun's Philosophy of History: A Study in the Philosophic Foundation of the Science of Culture (London: George Allen and Unwin, 1957).

Moris Ginsberg : Sociology, Home University Library, (Oxford, 1965).

Murtada Mutahari : Society and History, English Translation Mahliqa Qarai (Tehran: Islamic Propagation Organization, 1985).

N. Nassar : Lapensee Realiste d'Ibn Khaldun (Paris, 1967).

N. Schmidt : Ibn Khaldun: Historian, Sociology and Philosoher (New Yourk Pantheon, 1930).

Oweiss Ibrahim : æIbn Khaldun, The Father of Economics," Georgetown University.

P. Gisbert : Fundamentals of Sociology (India: Orient Blackswan Pvt Ltd. 2010),

P.K. Hitti : *History of the Arabs*, (London 1951).

: History of the Arabs (London: Macmillan Education Limited, 1962).

Percy S. Cohen : Modern Social Theory (London: Heinemann Educational Books, Ltd., 1975).

R. Maunier : Les Idees economique d'un philosophe arabe au XIV, Siecle (Revue d'histoire economique et sociate, 1912.

R.G. Collingwood : The Idea of History (Oxford: 1946).

R.M Mcive and Page : Society (USA: The Macmillan Company, 1967).

Robert Flint : History the Philosophy of History (London: Gohn Murray, 1969); Issawi, 1969.

S. Nicholas Hopkins : Engels and Ibn Khaldun", Journal of Comparative Poetics, No. 10.

Satish Chandra : *Medieval India*, Past Two : (Moghal Empire), (1526-1748), Delhi, 1999.

Sayed Ameer Ali : The Spirit of Islam (Chistophers, 1955).

Sherwani, H.K. : Studies in Muslim Political Thought and Administration (Lahore, Sh. Muhammad Ashraf Publication).

Stephen Dale : Ibn Khaldun: The Last Greek and the First Annaliste Historian, Int. J. Middle East Stud, No. 38, 2006.

T.J de Boer : Gesehicher Der philosophie in Islam, (1901).

Vilfredo Pareto : The Mind and Society: A Treatise on General Sociology, Translated by Andrew Bongiorno and Arthur Livingston, Dover ublications Inc., New York, 1935.

Yves Lacoste : Ibn Khaldun: The Birth of History and the Past of the Third World (London: Verso, 1984).

পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, প্রবন্ধ ও সাময়িকীঃ

The Middle East Journal	:	Akbar Ahmed, Ibn Khaldun's Understanding of Civilization and the Dilemmas of Islam and the West Today", 2002, Vol. 56, No. 1.
Journal of Asiatic Society	:	Juillet-September.
IAIS Journal of Civilisation Studies		Elmira Akhmetova, æDefining Civilisation and Religion,", vol.1, no.1 (October 2008).
Journal of Political Economy	:	Jean David Boulakia, Ibn Khaldun: A Furteenth Century Economist, Vol. 79 No. 5, September-October 1971.
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা	:	রংগলাল সেন, ইবনে খালদুনঃ সমাজবিজ্ঞানের অনানুষ্ঠানিক জনক, যুক্তসংখ্যা ৮৫-৮৬, জুন-অক্টোবর ২০০৬/জৈষ্ঠ-কার্তিক ১৪১৩।
জার্নাল অব ইসলামিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন	:	ড. মঈনউদ্দিন আহমদ খান, ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রদর্শন, ইসলামিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্টাডি সেন্টার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ৪-৫।
বাংলা একাডেমি পত্রিকা	:	সামসুল ইসলাম খান, "মার্কস-ভেবারীয় প্রেক্ষিত থেকে ক্ষমতা, সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও আইনানুগ বৈধতার সজ্ঞা নিরূপণ: একটি ধারণাগত রূপরেখা", ১৯৮৬ খ্রি.।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা	:	মো: শরিফুল ইসলাম, সমাজ বিজ্ঞান ও ইবনে খালদুন ৩৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮খ্রি.। ২৭ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানু-মার্চ ১৯৮৮ খ্রি.।
"	:	৪১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০২ খ্রি.।
মাসিক পৃথিবী	:	জুন-১৯৯২ খৃ. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা
দৈনিক ইনকিলাব	:	ঢাকা, ৮ এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রি.

অভিধান, বিশ্বকোষ ও অন্যান্যঃ

ইবনে মান্‌যুর আল ইফ্‌রীকী	:	লিসানুল 'আরব, খণ্ড ১৪, (বৈরূত : দারুল বৈরূত লিত তাবাআতি ওয়ান নাশরি ১৯৫৬ খ্রি.)
Oxford Advanced Learners Dictionary	:	Oxford University Press, 7th Edition, 2006, p-1452.
ড. ইবরাহীম আনীস	:	আল-মুজামুল ওয়াসীত, খ.২, তা.বি.
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত	:	ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৪১৩ বাং)।
The Hans wehr	:	Dictionary of Modern Written Arabic, (Neweyork : J.M. Cown, 1976)
The Hanswehr	:	Dictionary of Modern Written Arabic, ed, JM. Cowan, (Newyork, 1976)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত	:	(ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খ্রি.), ২য় সং, খ. ১।
”	:	ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৪ খ্রি.), খ. ১২শ।
”	:	(ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭ খ্রি.), খ.৩।
	:	ঢাকাঃ ই.ফা.বা., নভেম্বর, ১৯৯০খৃ., খ-৯।
”	:	দাইরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ্‌, (উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ), লাহোরঃ ১৯৭১ খ্রি., ৭ম খন্ড।
সীরাত বিশ্বকোষ	:	সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, ১ম খণ্ড।
CF. Encyclopedia of Islam	:	Vol-I, (Leiden: e-j Brill, 1960)
The New Encyclopedia Britanica	:	Aristotle:, Chicago, 1973.

Web-side

<http://www9.georgetown.edu/faculty/imo3/ibn.htm> (accessed 13 August 2013).

www. muslimheritage.com

www.wikepedia.com

www.jstor.org/stable/1762738